প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত ।

সম্পাদনা বিষয়ে

শক্তি চট্টোপাধ্যায় নিজের শ্রেষ্ঠ কবিতার সম্পাদকীয় ভূমিকায় লিখেছিলেন—

"কবিতা ভালোমন্দেই মিশে থাকে, হয়তো। লিখেছি, প্রকাশিত করেছি—কেউ উপযুক্ত ভাবে নিয়েছেন, কারো কাছে আবার তা অনর্থ। আমার নিজের কাছে, একাকীর কাছে, কবিতা অবলম্বন। নিজেকে নিজের মত করে দেখার জলজদর্পণ এক।" "স্বগত সংলাপ" (পদ্যবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত)

"আমি গত রাত্রে যে পদ্য লিখি পরদিন সকালে তা আর পড়ি না। কারণ আমি সবসময় চাই এগিয়ে যেতে। ওই জন্যেই আমার পরবর্তী মুহূর্তটি চাই। অন্যরকমের অভিজ্ঞতা চাই।.... অনেকদিন বাদে পুরোন কোন পদ্য পড়তে গিয়ে দেখি, তাতে হয়তো কোথাও ত্রুটি থেকে গেছে, কিন্তু আমি সংশোধন করি না। কারণ যে সময়ে ঐ পদ্যটি লিখেছিলাম সেই সময়ের অনুভূতিতে তা সত্য ছিলো। হয়তো ভুলশুদ্ধই সত্য—তবুও সংস্কার করি না। পদ্য লেখার ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে বাগান পরিষ্কারে আমার বিশ্বাস নেই।"

কবিতা এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে শক্তির মানসিকতা পাঠকের কাছে কিছুটা তুলে ধরার জন্যই তাঁর জবানী দিয়ে সম্পাদকীয় বক্তব্য শুরু করেছি। কবিতা বোঝার জন্য কবির জীবনচরিত হয়তো অপ্রয়োজনীয় কিন্তু কবিতা সম্বন্ধে কবির ভাবনাটি জানা পাঠকের পক্ষে জরুরী। কবিতার হেরফের বা বর্ণমালার হেরফেরও যে তাঁর পছন্দ ছিল না সে বিষয়েও তাঁর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছি।

এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলির সময় বিশেষত নাম কবিতার রচনাকাল প্রকাশিত হবার সময় খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছি—সবক্ষেত্রে সফলতা আসেনি। কবিতা সম্পর্কে শক্তির বক্তব্য বিভিন্ন ছোট পত্রিকা থেকে খুঁজে বার করে বিভিন্ন কবিতার সঙ্গে তার সাযুজ্য খুঁজে পেলে বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছি। একটি গল্প লেখার পনেরো বছর বাদে সেই একই চিন্তাধারার অনুকূলে লেখা কবিতা পাশাপাশি রেখে কবির মানসিকতা কিছুটা অথবা একটি কবিতার অনুষঙ্গে একই সুরে অন্য কবিতাগুলির পংক্তি মনে পড়ে তাকে কতখানি অর্থবহ করে তোলে সেটুকুই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র।

যে নাট্যকবিতাগুলি নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—উদ্ধৃতির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে তাকেই দীর্ঘ বারো চোদ্দ বছর আগে কবি কোন্ যুক্তিতে অস্বীকার করেছিলেন ! উৎসাহী পাঠকের কাছে কবির মানসিকতা এবং তার বদল সম্বন্ধে কিছুটা তথ্যের একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে বলেই মনে হয় ।

অন্যান্য খণ্ডের মত পঞ্চম খণ্ডেও পুনর্মুদ্রণ বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কারণে কয়েকটি কবিতা বর্জিত হয়নি। বিভিন্ন গ্রন্থে একই কবিতা পুনর্মুদ্রণের বিষয়ে নতুন করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা নেই তবে এ সম্পর্কে তাঁর অমনোযোগ ছাড়াও আর একটি কারণ ছিল। তিনি সচেতনভাবেই গ্রন্থনামের মূল সুরের সঙ্গে একগোত্রের পছন্দসই কবিতা একত্রে গ্রন্থিত করতে পছন্দ করতেন। কবিতা লিখে তিনি সত্যিই সেকথা ভুলে যেতেন ; 'কোথাকার তরবারি' গ্রন্থের কবিতা পরিচয় এবং 'আমাকে জাগাও', 'যেতে পারি...' ইত্যাদি গ্রন্থে সন্নিবেশিত কবিতার প্রথম প্রকাশকাল এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে।

কবিতার ব্যাখ্যা নয়—কবিতার ধারাবাহিক পাঠক হিসাবে এবং দীর্ঘদিন কাছাকাছি থাকার সুবাদে কিছু কিছু কবিতা রচনার নেপথ্য তথ্য এখানে তুলে ধরেছি মাত্র।

কবির পাণ্ডুলিপি প্রকাশকাল উদ্ধার করতে ব্যবহৃত হয়েছে। কয়েকটি গ্রন্থাগার থেকে ছোট পত্রিকার বিভিন্ন কবিতার মূল অনুসন্ধানের কাজে তিতি চট্টোপাধ্যায় সাহায্য করেছে। বিভিন্ন পত্রিকার প্রকাশকেরা ব্যক্তিগত অনুরোধের উত্তরে রচনার সময় জানিয়েছেন তাঁদের সৌজন্যে আমি অভিভূত। তৎসত্ত্বেও এই সংকলনের যে ত্রুটি ধরা পড়বে তার জন্য আগাম মার্জনা চেয়ে রাখছি পাঠকের কাছে।

গ্রন্থসূচি

যুগলবন্দী



যুগলবন্দী

সূচিপত্র

এই সব পদ্য

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কশ্চিৎ গণ্ডগ্রাম এই বহড়ু, ডাকনাম বড়ু। লোকে শুধুলে বলি, জয়নগর-মজিলপুরের নাম জানেন? ঐ যে, যেখানে মোয়া। কলকাতার লোক সঙ্গে সঙ্গে মাথা কাৎ করে। তৎক্ষণাৎ তার আগের ইস্টিশানের গল্প বলি অর্থাৎ ঐ বড়ুর গল্প।

দাদামশাই-এর পুরনো বাড়ি ছিলো ভুজবাবুদের বড়োবাড়ির গায়ে। তাঁদের দুর্গামণ্ডপ ছিলো। তাঁদের বিরোৎ বিরোৎ বাগান আর পুকুর ছিলো। তাঁদের গেটের মধ্যে কাছারিবাড়ির লাগোয়া বাগানে ফুলগাছ ছিলো বিস্তর। আমরা সেখানে বাতাবিলেবুর বল খেলতে যেতুম। গেটের সামনে আমলকিতলা ছিলো, তার পেছনে ছিলো ইটখোলা। মনে পড়ে, কোন্ একটা পুকুরের মাছ, মাথাসার—গায়ে কোনো গস্তি থাকতো না। গাঁয়ের মানুষ সে-মাছ দেখে ভয় পেতো। ভূত-লাগা সেই পুকুরের মাছ, জালে উঠলে, আমরা ছোটরা সব হুমড়ি খেয়ে পড়তুম।

ওটা ছিলো দাদামশাইদের শরিকি বাড়ি। আমার জন্ম ঐ বাড়িরই সার্বজনীন আঁতুড়ঘরে কোনো। একদিন দেখলুম, ওঁরা রাতারাতি এ-টিবি ও-টিবির দখল নিলেন—ছাঁচতলা দিয়ে মাটি ভাগ হতে থাকলো, দুঘরা মাটির বাড়ির মাঝখানে বেড়া উঠলো বাঁশকাঠির, তার তল চেপে এক বিঘৎ করে রাঙচিতা আর মেন্দি ঝোপ। একান্নবর্তী পরিবার ফেটে চৌচির হয়ে গেলে, আমার নিজস্ব দাদামশাই একদিন বড়ুর ইস্টিশানের কোলের কাছের বাড়িতে উঠে এলেন। মন-মন কাজে এ-বাড়ি তিনি যে কবে তৈরি করতে শুরু করেছিলেন, কেউ জানতো না! ধানী জমি, মাটি ফেলে উঁচু আর বাসযোগ্য করে তাঁর বাড়ি উঠলো। রেল কোম্পানির জমির ঠিক গায়েই। হলুদে-শাদায় মেশা 'মৃণালিনী কুটির'—দিদিমার নামে। যতদূর মনে পড়ে দাদামশাই-এর হাতে এর নামকরণ হয়নি, হয়েছে পরবর্তী কালে কোনো, তাঁর পুত্রদের হাতে— মাতৃস্মৃতি জাগ্রত রাখার জন্য। দিদিমা কলেরায় মরেছিলেন কলকাতার বাসাবাড়িতে—মামাদের তিনতলার ঘরে। আমাদের চোখের ওপর সাপটে পেরেক পোঁতা হলো। আমরা কেউ একা তিনতলায় উঠতাম না—বিশেষত ঠিক দুক্কুরবেলায়!

গাঁয়ের ছেলে হলেও মনে ভয় ছিল পুরোদস্তুর। চোর ছ্যাঁচোড় ডাকাত আর ভূতের ভয়। আর একটা ভয় পুকুরের ঠিক মাঝখানটায় ডুবে থাকতো— সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে গেলেই ডোবাবে— যদি পা লাগে ডুবো মন্দিরের চুড়োয়। সব প্রতিষ্ঠিত পুকুরের মাঝখান বরাবর একটা পাতালপুরীর মন্দিরের কথা বিশ্বাস করতে কে বা কারা যেন আমাদের ছোটবেলায় শিখিয়েছিল।

বাবা মারা গেলেন যখন আমার নামমাত্র বয়েস, তারপর থেকেই মামাবাড়ির গলগ্রহ—মা আর ছোটভাই মামার সংসারে...কলকাতায়। আর আমাকে দাদু রেখে দিলেন তাঁর কাছে একাকী, মানুষ করবার জন্যে। সে-বাড়িতে মানুষ ছিলো তিনজনই। দাদু আমি আর আমার এক বালবিধবা মাসি। বিশাল বাড়ি, দু দুটো অন্ধকার বাগান, দুটো পুকুর, আটটা পুকুরপাড়, পাড় ভর্তি মাছরাঙার গর্ত, গোয়াল ভর্তি গাই-বাছুর—এই সব। গোয়াল আর বাগানের কাজ দেখতো ওতোরপাড়ার হৈদরদা। দাদু করতেন হোমিও

ডাক্তারি, আমি অ্যাপ্রেনটিস কম্পাউণ্ডার। বিনি পয়সার ডাক্তার, তবে একডাকে দশটা গাঁয়ের লোক চিনতো। পেন্নাম জানাতো। অমন সদাশয় মানুষ, যেমন মন তেমন দেহ, অমন রূপবান বৃদ্ধ আমি জীবনে খুবই অল্প দেখেছি। ইস্কুল মাস্টারি ? হ্যাঁ, তাও করেছেন— আসলে ইস্কুল গড়তেই হাত লাগিয়েছেন বেশি করে। কাছা খুলে দান করেছেন— যতটুকু ছিলো, তাঁর মৃত্যুর পরে শুনেছি, ধার করেও দান করেছেন অনেক অনেককে।

দাদুর গায়ে এক ধরনের চন্দনের গন্ধ ছিল— ভোরবেলাকার পুজো থেকেই লেগে থাকতো তা। দিনরাত্তির সব সময়েই এই সৌরভ তাঁকে ঘিরে থাকতো সুসংবাদের মতন। স্ত্রী গেলেন, একটি দুটি মেয়ের বর বাদে চার চারটি মেয়ের কপাল পুড়লো। তখনো তিনি সেই চিরন্তন সন্ন্যাসী, অপরকে নিয়ে ব্যস্ত, অসুখী— অসুস্থকে নিয়ে উন্মাদ—সন্ন্যাসীর মতন স্বার্থ নিয়েও নয়।

তিনি আমাকে স্বাভাবিক ভাবে মানুষ করে তুলবার জন্যে তাঁর কাছে রেখেছিলেন, আর আমি যাচ্ছিলাম ক্রমাগতই বেঁকে চুরে। আমার হওয়া হয়নি, তাঁর কাছ থেকে পাওয়া হয়নি কিছুই। এক ঐ উদাসীনতা ছাড়া।

সারাজীবনটাই মনে হয়, খুব একা ছিলেন তিনি। আমিও অজ্ঞাতে ঐ একা থাকার দীক্ষা নিয়ে থাকতে পারি। বাবার কথা তেমন বিশেষ মনে পড়ে না—শুধু যেখানে ঐ বড়ুর বিশ্বজাঙ্গালে তাঁকে পুড়িয়ে এসেছিল এক শিশু— সেখানে গেলে তার পাশের রাস্তা দিয়ে হেঁটে পার হতে পারিনি কোনদিন। চোখকান বুজে ঐ আধ মাইল রাস্তা আমাকে দৌড়ে যেতে হতো। কী জানি কেন ? প্রিয়জনে তো ভয় থাকার কথা না, তবু ভয় হতো। মনে হতো, তিনি আমায় খপ্ করে ধরে ফেলবেন। ধরেই কিছু নাছোড়বান্দা কথা— তাহলে ? আমি মরে যাবো।

আজো মনে হয়, তাঁকে আমি চিনতে না পারলেও তিনি আমাকে ঠিক চিনেছেন। সঙ্গে আছেন। আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করছেন। তাঁকে ভালোবাসি না, ভালোবাসার সময়ই পাইনি। তাঁকে ভয় করি। আজো বিপদে পড়লে তাঁকে ডাকি। মনে হয়, তিনি তাঁর দুর্দান্ত কালো মুখচোখ নিয়ে আমার রাহুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছেন। স্পষ্ট দেখতে পাই, তিনি আমায় বাঁচিয়ে রাখছেন। নয়তো কবেই আমার মরে ভূত হয়ে যাবার কথা।

ছোটবেলায় ঐ ইস্টিশান, দোলমঞ্চ, গাঁয়ের চাষাভূষোর সঙ্গে গাছপালা, পানাপুকুর—পরিপ্রেক্ষিতসুদ্ধ এক পাড়া-গাঁ আমার মধ্যে চেপে বসেছে। তার থেকে পরিত্রাণ কখনো পাই নি।

ছোটবেলায় একদিন রেললাইন ধরে ঝুলন্ত চাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়েছি—যেদিকে পেরেছি গেছি। সেই চাঁদ আর ছাদের ওপর সপ্ বিছিয়ে রবিঠাকুরের গান শোনাতো পরবর্তীকালে মাসির মেয়েরা— তখন দাদু নেই, অথচ আমি তাঁর বাড়িতে আছি, সঙ্গে দাঙ্গালাগা এলাকা থেকে পালিয়ে এসেছে কলকাতার মাসি, তাঁর ছেলেমেয়েরা— তখন ধীরে ধীরে যেন সামাজিক রান্নাবান্নার ভেতর থেকে মানুষের মতন এক সম্পর্ক দানা বাঁধছে। ঐ প্রথম কলকাতার স্পর্শ পাচ্ছি। আমার গ্রাম থেকে তখনো অনেক রেলগাড়ি

কলকাতা শহর ছুঁয়ে চু কিৎ কিৎ খেলছে। কচিৎ কখনো সেখানে গেছি দাদুর হাত ধরে। শিয়ালদা থেকে সটান ঘোড়ার গাড়ি। সেখানে ঘোড়ার গুয়ের গন্ধে আমার শহরের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। এখনো ফিটন দেখলে পা থমকে যায়। সহিসের সঙ্গে দু-চারটে বাক্যালাপ করি। সহসা তাকিয়ে দেখি, সেদিনের মতন একটা রাস্তা যেন জলপ্রপাত, তার গা থেকে গাড়িঘোড়া সব হুড়মুড় করে ধারাবাহিক গড়িয়ে পড়ছে। নিচে গভীর খাদ। হাঁ করে আছে কলকাতা শহর। তার খিদে সাংঘাতিক।

এই কলকাতা যখন আমাকে খেলো তখন আমি ইস্কুলে পড়ি। বাগবাজারের কাশিমবাজার পলিটেকনিক। মামার বাড়ি থেকে কাছে। ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ায় সমূহ টান। মাস্টারেরাও মন্দ বলেন না। মামা আশা রাখেন, ছেলে বড়ো হবে, মাতব্বর হবে, বাড়ির নাম রাখবে।

বাড়ি কোথায় ? বাড়ির আবার নাম কী ? রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঐ বয়েসেই জড়িয়ে গেলাম। একা থাকার অপরূপ কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যেই মনে হয় আজ। কিছু বুঝি না, কিচ্ছু জানি না। বোঝানো হলো, রাতারাতি স্বাধীন দেশ স্বাধীনতর হবে ইত্যাদি ইত্যাদি— ধনী দরিদ্র থাকবে না, সম্পদের সমবণ্টন হবে। স্বর্গের একটা গোলকধাম-মার্কা ছবি আমাদের, বালকদের স্বপ্নের দোরগোড়ায় লটকে দেওয়া হলো। বলছি না, গুরুদেবরা ইচ্ছে করেই দিয়েছিলেন। ভুল বুঝে এমনটা বুঝিয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের দোষ নেই। মনে হয় কিছুকাল স্বর্গ খুঁজতেই কাটলো— সেই সঙ্গে সামাজিক মানুষের গা ক্ষতবিক্ষত। ফেরার পথ থাকে না, তবু ফিরতে হলো। আবার সেই হলুদ পাকা কুঁচো-করা ঘাড় মুখ গুঁজে স্বার্থ গোছানো। ইস্কুল ডিঙিয়ে কলেজে। প্রেসিডেন্সি কলেজের দিনগুলো স্মৃতি থেকে সরানো যায় না, কিছুতেই।

পড়াকালীন সময়ে সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেরই খেলার বাতিক ছিল। জনাকয়েক তো রীতিমতো বিখ্যাত। অলোকরঞ্জন দু ক্লাশ উঁচুতে পড়তেন, শঙ্খ ঘোষ তাঁরও এক ক্লাশ, শিশির দাশ আমার সহপাঠী। এখন দিল্লির বিখ্যাত ডাক্তার অধ্যাপক সে। দেশ-এ তার কবিতা বেরুলে অধ্যাপকগণ আলোচনা করতেন আর আমাদের মধ্যে তাড়াহুড়ো পড়ে যেত কে কীভাবে তার নেকনজর কাড়তে পারে। আমি তার পাশে বসতে পেলে উজ্জ্বল হয়ে উঠতাম। ঘুণাক্ষরে ভাবিনি, একদিন পদ্য লিখতে পারবো। তারপর একদিন দীপেনের (দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) মাধ্যমে দীপক মজুমদার, তার মাধ্যমে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ। সুনীলের তখন বৃন্দাবন পাল লেনে বাসা। আমার মামাবাড়ি থেকে কাছেই, প্রায় রোজ সেখানে আড্ডা মারতে যাই। সেখানে একে একে আনন্দ, ফণিভূষণ, মোহিত, শিবশম্ভুর সঙ্গে আলাপ। সন্দীপনের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কবে যেন আলাপ হয়ে গেছে। তন্ময়ের সঙ্গে। আমরা কোনো কোনো দিন দেশবন্ধু পার্কের জলের ধারে কোনোদিন বা গাছতলায় বসে গল্প কবিতা শুনি। মতি তার প্রথম দিককার অনেকগুলো গল্প আমাদের ঐ ধরনের আড্ডায় পড়ে। কবিতা পড়ে সবাই—আমি ছাড়া, তন্ময় ছাড়া। স্মরজিৎ অনেক পরে একদিন একটি গল্প পড়ে শুনিয়ে গেলো হঠাৎ। ফণীর বই বেরুচ্ছে, আমরা মদৎ দিচ্ছি। ও যাকে পারছে তাকে কবিতা উৎসর্গ করে চলেছে। আমাকেও একটা দিয়েছিল বলে মনে পড়ছে। তখন তো আর লিখি না,

অনেক কাকুতি মিনতির পর ও দিতে পেরেছিল। এখন ভাবলে হাসিই পায়। তখন গাঁয়ের লোক হিসেবে ব্যাপারটা চলে গিয়েছিল বলতে হবে। লুকিয়ে গল্প লিখে ফেললুম একটা ভাইজাগের ডলফিনস্ নোজের উপর। আনন্দবাজার রবিবাসরীতে ছাপা হলো। উত্তেজিত হয়ে আরেকটা লিখে পাঠালাম, সঙ্গে সঙ্গে ফেরত। ছদ্মনামেই গল্পটা লিখেছিলাম। এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ আমার পাড়াগাঁর স্মৃতি নিয়ে এক দু পাতা করে একটা আখ্যান লেখা শুরু করে দিই। দু দশ পাতা—যেদিন যেমন হয় পড়ে শোনাই। কেউ ভালো বলে কেউ চুপ করে থাকে। আমি দমি না—একদিন শেষও হয়। নাম দিই 'কুয়োতলা'। বছর দেড়েক প্রকাশকের ঘরে ধাক্কা খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত বেরোয়। একটু অদ্ভুত ধরনের বই হিসেবে অল্পসল্প নামও করে। ঐ পর্যন্ত।

ঐ ধরনের আড্ডাতেই বোধ করি উত্তেজিত হয়ে, পদ্য লিখবো মনে-মনে এক রকম স্থির করে ফেলি। তখন তরুণ রচনার অগ্নি, মানেই কৃত্তিবাস। অন্যদিকে শ্রীবুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকা। সঞ্জয়বাবুর পূর্বাশা টিম টিম করে জ্বলছে। রাত্তিরবেলা বাড়ি ফিরে হিসেব মিলিয়ে একটা সনেট খাড়া করি। পরের দিন সুনীলের বাসায় যাই। লেখাটা অতি সাধারণ 'যম', ওর কাছ থেকে কবিতার ঠিকানা নিয়ে বুদ্ধদেবকে পাঠাই। উনি চিঠি দেন, সামান্য সংশোধন করে ছাপবেন। হাতে স্বর্গ পাই— কিংবা মনের মধ্যে কী যেন এক অবাস্তব হাওয়া বাড়তে থাকে। প্রায় দৌড়ে সুনীলের কাছে গিয়ে চিঠিটা দেখাই এবং দু-তিনটি টানা গদ্যে লেখা 'সুবর্ণরেখার জন্ম' আর 'জরাসন্ধ'। সুবর্ণরেখা কৃত্তিবাসের জন্যে রেখে দিলে পরের ডাকেই জরাসন্ধ বুদ্ধদেবের কাছে পাঠাই। পদ্য লেখার আকস্মিক জন্ম, প্রকৃতপক্ষে সেদিনই। কোনো প্রেরণা না, কোনো সনির্বন্ধ ভালোবাসায় না—শুধুমাত্র চ্যালেঞ্জ-এর মুখোমুখি এসে এইসব পদ্য লেখা।

কবিতা কলকাতা খেলাঘরে ॥

কবিতার মধ্যে খুবই উপদ্রব সম্প্রতি বেড়েছে।
কোনো গুপ্তচর শব্দ মুহূর্তে ভণ্ডুল করে দেয়,
উজ্জ্বলে মলিন করে ক্ষয়া ও খর্বুটে বর্ণমালা
পাইকার এবং করে সমস্তরকম নাশকতা
সজ্জা, সিঁড়ি, প্লীহা ফাটে, চোরাজল নিশ্চিত নষ্টের
মূলে টেনে আনে আর ধ্বংস করে, কাটাকুটি করে।

আমার কলকাতা আজ নিষ্প্রদীপ, কবিতারই মতো
মহড়ায় প্রাণপণ, অসতর্ক নিষ্ফল বাস্তবে
কবিতারই মতো তার ডালপালা সর্বস্ব রয়েছে...
নেই, যাকে বলে অগ্নি, বলে প্রাণ, হরিৎ উদ্গার!

তবুও খড়ের স্তম্ভে-স্তূপে ফোটে একাকী জীবিত
কোঁড়ক, স্বপ্নের মধ্যে আকাশেরও বিবৃতি সঠিক ;
সেই পুরাতন চাঁদ সাক্ষী রেখে হৃদয়স্থাপন
করে হুলুস্থূল প্রেম, কবিতা কলকাতা খেলাঘরে ॥

সামনে মানুষ

পিছন ফিরলেই দেখি কুশ্রী কুশ্রী কুশ্রী একতাল
প্রকৃতি-পাগল মেঘে লেগে আছে বিদ্যুতের ছটা
যেন গুঁড়ো চুল কোনো উড়ন্ত বিধবা
চাঁদের পিছল স্নেহ
কিংবা নৃত্যে বেসামাল জল
হাওয়ার পাটের ফেঁসো
অবিশ্রান্ত ওড়াউড়ি করে
পিছন ফিরলেই দেখি এইসব
সামনে মানুষ ॥

কলকাতা কবির মৃত্যু সমর্থন করে

মৃত মুখ, তাকে আমি কুয়োর জলের মতো স্তব্ধ মনে করি
পাতালের তাপ যদি কিছু থাকে, তাকেও স্থিরতা
কঠিন আঙুল তুলে ঘুম পাড়ায়, ধ্যানমগ্ন করে
আমি ভয় পাই, আমি মুখ ঢাকি, বাস্তবে তবুও
কবির গণনা বলে, ও মুখ-পাষাণই প্রিয়তম
রূঢ় সুষমার পংক্তি, ওই শব্দ, স্মৃতির জননী...
কিন্তু সে কবিও যান হাতে-গড়া শস্যক্ষেত্র ছেড়ে একদিন
পাকা ও প্রসন্ন ফল ঝরে পড়ে তপোক্লিষ্ট ভুঁয়ে
শীতের বাদাম করে ওড়াউড়ি, ময়দানের ঘাস
গভীর আগুনে যায় উড়ে-পুড়ে...দেখে মনে হয়,
কলকাতা কবির মৃত্যু সমর্থন করে ॥

দক্ষিণে তাকালে অন্ধ

দক্ষিণে তাকালে অন্ধ, অন্যদিকে এখনো বন্ধুতা—
এভাবে কি বাঁচা যাবে ? যা নিষিদ্ধ তাকে দেখতে প্রাণ
বালকেরও ছুটে যায়, আমি তো প্রৌঢ় ও পারঙ্গম !
দক্ষিণে তাকালে অন্ধ, অন্যদিকে তবুও, বন্ধুতা...

মানুষের কাছে আজ, যেতে হলে, দুটি দিক আছে—
স্থায়ী ও রহস্যময় একটি দিক বদ্ধ ও জটিল ।
দিক দুটি, ভালো-মন্দ, পাপ ও পুণ্যের—দূরে কাছে
মানুষমাত্রেরই আজ, যেতে হলে, দুটি দিক আছে ।

একটি, যে জন্মেছে পাপে, তাকে করা পুণ্যে সমুজ্জ্বল
পূজার মতন খাঁটি, পরিপাটি, অতসী চন্দনে ।
অন্য, যে জন্মেছে পুণ্যে তাকে করা পাপে নিমজ্জিত
কিন্তু যে অর্ধেক পাপে অর্ধ পুণ্যে তাকে কোন্ ছুতা .

ধরতে হবে বাঁচতে গেলে ? প্রেমে-কামে সন্ন্যাসে পীড়িত,
দক্ষিণে তাকালে অন্ধ, অন্যদিকে এখনো বন্ধুতা ॥

নীলিমার সোনালি আপেল

সোনালি আপেল থেকে আপেলের বুকের গভীরে
ঢুকে যেতে চাই বলে, শুয়ে থাকতে চাই বলে আর
মানুষের মধ্যেকার সমূল উদ্দাম ভালোবাসা
আমাকে টানে না কাছে, ছেড়ে দেয়, যেন ধূলাবালি
হাওয়ায় ঘূর্ণিতে ওড়ে, চলে যায় না-দেখার মতো
প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দিয়ে, মানুষের সখ্য ছেড়ে দিয়ে
দূরে গুণমুগ্ধ মেঘে গা ভাসিয়ে নীলিমার দিকে—
যেন নীলিমাকে ভালোবাসে সে-ও গভীর গভীর
যেন নীলিমার কাছে যাবে বলে পথে বেরিয়েছে
যেন নীলিমারই লোক, আপেলের নয় অধিগত
চেনা নয়, নিরাত্মীয়, সোনালি আপেল—সে তো ভুলই ॥

বস্তুর গ্রন্থনা থেকে এইভাবে

বস্তুর গ্রন্থনা থেকেই মুক্তি পেতে হবে
মুক্তি তো দেবার নয়, নিতে হবে প্রত্যক্ষে ছিনিয়ে
অথবা গোপনে কোনো মুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্য তার
অবিসংবাদী প্রেম, উপঢৌকনের মতো মেঘ
যারা ভেসে আসে কোনো খোলা মাঠে, অব্যর্থ হাওয়ায়
বস্তুর গ্রন্থনা থেকে বস্তুকেই মুক্তি পেতে হবে—
একদিন।
তা না হলে সবই ব্যর্থ—উদ্যোগ, উদ্যম, অভ্যর্থনা
জীবনধারণ ব্যর্থ, ব্যর্থ সব কৃত্রিম প্রকৃতি
কায়ক্লেশ, দুঃখসুখ, মনেপড়া, স্বপ্ন ঘুমেঘোরে
বালকের দোলমঞ্চ, ভাঁটফুল, মর্নিং-স্কুল
ব্যর্থ ক্ষয়রোগ আর রক্তের ভিতরে তার খেলা
অমরতা নাম্নী নারীটির ভ্রূমধ্যে আমার
চুম্বন দেবার কথা—দেবো না, দেবো কোনদিনও
—এইভাবে
বস্তুর গ্রন্থনা থেকে বস্তুকেই মুক্তি পেতে হবে ॥

সমস্ত নক্ষত্র আজ নক্ষত্রের

সমস্ত নক্ষত্র আজ নক্ষত্রের ভিতরের ক্রোধ
বোঝাতে না পেরে যেন আরো দূরে চলে যেতে থাকে
অভিমানই এরকম অঘটন ঘটাতে সক্ষম—
এই ভেবে, মানুষেরও বুক অভিমানে ভরে যায়
মানুষ নক্ষত্র নয়, নক্ষত্রের মতো দূরে নয়
মানুষের মধ্যে তবু নক্ষত্রপুঞ্জেরা খেলা করে।

সেরকম খেলা থেকে প্রাপনীয় সমস্ত বোধের
জন্ম হয়, মৃত্যু হয়—মানুষেরই মধ্যে যেতে থাকে
মিশে তা মাটিতে যেন, শস্যে আর শ্যাওলার ভিতরে
ক্ষিপ্র ছুঁচ ? কিন্তু সে তো মেশে না মাটিতে-রক্তে-হাড়ে
তাহলে ও ছুঁচ নয়, গভীর, ব্যাপক ম্লান প্রেম !
কিশোরজীবনে শুধু একবারই ছুঁয়ে যেতে আসে—
অকারণে...
সমস্ত নক্ষত্র আজ নক্ষত্রের ভিতরের ক্রোধ
বোঝাতে না পেরে যেন আরো দূরে চলে যেতে থাকে ॥

উদাসীন, পড়েই রয়েছে

শব্দের নিজস্ব অনুতাপ তাকে পুড়িয়েছে জ্বরে
সে শুয়ে রয়েছে তার চতুর্দিকে কমলার খোসা
যেন সে নক্ষত্রহারা তরুণের মতো লাল চুল
কাঁধের উপরে ফেলে, উদাসীন, পড়েই রয়েছে...

এই পড়ে থাকা, এই পর্যটন-বিমুখ আত্মার
এই শুয়ে-বসে শুধু জব্দ হওয়া, এই মর্চে-ধরা
আকাশের নিচে থেকে, বাতাসের ছোঁয়া লেগে এই
মনপ্রাণ-সুদ্ধ ডুবে যেতে চাওয়া মৃত্যুর গভীরে !

বাগানে তার ফুল ফুটেছে

ওইখানে ওই বাগানে তার ফুল ফুটেছে কতো
জানতে পারি, ওর মাঝে কি একটি দেবার মতো ?
একটি কিম্বা দুটির ইচ্ছে আসতে আমার কাছে
তাহার পদলেহন করতে সমস্ত ফুল আছে।
সব ফুলই কি গোষ্ঠীগত, সব ফুলই কি চাঁদের
একটি দুটি আমায় চিনুক, বাদবাকি সব তাঁদের
গাছ তো তাঁহার বাগানভর্তি, আমার রোপণ ছায়া—
প্রবীণ তাঁদের ভালোবাসা, আমার বাসতে চাওয়াই ॥

আমি সুখী

ভুলে ভুলে ভুলে যাই, কোনোদিন মধ্যদুপুরের রৌদ্র পিঠে বয়ে
তোমার উদ্দেশে, শুধু একঝলক বিমূঢ় চোখের পক্ষপাত পাবো বলে
একচাল সবুজ পাতার গায়ে রক্তচক্ষু ফুলের চমক
দিতে পারবো বলে ঐ আপার চাইবাসা...চলে যাই
আজ ভুলে ভুলে যাই বিকেলের সুঁড়িপথ হাস্যকরোজ্বল ছেলেবেলা
অন্ধকার ঘর জুড়ে ডাক-ছাড়া গান
ছাঁচতলায় পদশব্দ, সজিনার পাতার ফিসফাস
আর রাঙা পা দুখানি করতলে— মন্দির প্রতিষ্ঠা যেন
বিশ্বাসের, উলুর, শাঁখের
ভালোবাসা থেকে দূরে শ্রেষ্ঠতার মহান পূজার
মন্ত্র যেন তোমার অস্পষ্ট কথা
চোখ চাওয়া, পাংশু হিম ঘুম...এইসব

আজ মৃত, শান্ত, দূর—আয়ত্তের মধ্যে তুমি নও, নওলকিশোরী
তুমি নিঃসঙ্গের সত্য সঙ্গ দিতে
স্বপ্নে মেলে দিতে তুমি গৃহগন্ধ, বাগান, পুকুর
বস্তুত বস্তুর খোঁজ দিতে তুমি মনীষা মিশিয়ে
কিন্তু আজ মৃত, শান্ত, বহুদূর—বাহ্যের আড়ালে...

আমি সুখী ! তুমি জানো সুখ কাকে বলে ?
ভুলে ভুলে ভুলে গিয়ে সুখী আমি, স্বতন্ত্র, স্বাধীন—
সুখী আমি ! তুমি জানো সুখ কাকে বলে ?

জানিনা কোথায় শব্দ

এ জলে নেভানো শব্দ, কার মতো—আমূল, অংশের
প্রসঙ্গে মেলাবে মুখ ?
কালো কয়লা টুকরো যে অগ্নিকে
ধরে রাখে, তার মতো ? নাকি তাম্রকূট নীল বিষ
নিশ্চিন্ত শিশিরে পড়ে মুছে যায় চোখের আড়ালে—
মানুষের মৃত মুখ জানি পাবো দুই পা বাড়ালে
যদি পা বাড়াই, যদি নেমে পড়ি ছাউনির পাড়ায়
টুপির পাহাড় যদি অলম্বুশ গাছপালা নাড়ায়
তখন শব্দকে কিছু খুঁজে পাবো, যা বাংলার ইঁট,
বানাবো মন্থর বাড়ি পারম্পর্যে ঘাড় ধরে, গেঁথে
তখন সনেট লিখবো কিংবা গায়ে পড়া চতুর্দশী
লোকে বলবে মিস্ত্রি বটে, ঘটে-পটে চূড়ান্ত স্বদেশী !
ঘুরে মরি গো-শকটে কিংবা যতো চাঁদ-খেকো গলির
নিশ্চিত সুড়ঙ্গে, পড়ে গুমোট গরম ইলেকট্রিক
গায়ে, বুকে হেঁটে যেতে শামুকের মতন করুণা
এবং যা লাগে, ছায়া, পিছু ফিরি— ছায়া পিছু ফেরে ।

ওখানে কি শব্দ ছিলো ? কলকাতা ধনসম্পদের
মতন স্বচ্ছন্দ শব্দ কিংবা মধ্যবিত্ত ও মর্কুটে
ছেঁড়াকাঁথা শব্দ ছিলো ? লটারির স্বপ্নের গোলাপি
শব্দ ছিলো ঘামে ভিজে, ছাতা পড়ে নরম নৈরাশে ?
জানিনা, কোথায় শব্দ জলজ্যান্ত মোহের ভিতরে,
গর্তে যেন সর্পশেষ, লেজ ; কিংবা গন্ধের মতন
উষ্ণ ও প্রগল্‌ভ টান, গান যেন মৃদঙ্গ ভঙ্গুর ।

মিষ্টিগুড়ের ইষ্টিশানে

এক পাড়াগাঁ থেকে আরেক পাড়াগাঁয়ে উঠে এলুম
রেলগাড়ি থামলো এসে মিষ্টিগুড়ের ইস্টিশানে
হাতে রইলো টোপর-ঝোপর, বড়ি-বেগুন, দাদুর লাঠি
লটবহর বলতে আরশুলা আর পোকায় কাটা প্রচ্ছদ ছেঁড়া
নোংরা বই

মনে রইলো টে-টুই শঙ্খচিল বাগানভর্তি নারকেল গাছের
মাথায় ঝড়
উশিখুশি বাদলের দিন, বাদাবনে হাঁ-করা আলেয়া...এইসব

কলকাতায় চলে এলুম, প্রাণপণ ফাঁকা থেকে একটা ঝাঁকার

মধ্যে যেন
ঐ আলু-পটল মটরশাকের মনের সঙ্গে মন মেলাতে
চলে এলুম কলকাতায়
মাত্র ওটুকুই আজ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক, গা ঘষাঘষি
বাকিটা নাক-বরাবর দেয়াল গুমে-ভেজা জবড়জং বাড়িঘর
আর মাটি বিক্কিরি করে যায় ঠিক দুক্কুরের ফিরিঅলা
বুড়ির মাথাব পাকা চুল, দোরগোড়ায় ঘণ্টা নাড়ে পাটনাই ছাগল
কোথায় এলম হে-এ, এ কোথাকে এলম্
হর-ঘরকে ঝি-ঝিউড়ি গলি ভেজায় ঝেলম্
অর্থাৎ কিনা, মা-গঙ্গার জল রাস্তার দুপাশে নামছে ঝোরায়

পাথরের খোরায় দম্বল
মা রাঁধতেন অম্বল
চপাৎ-সপাৎ টানতুম।
টানতে-টানতে আঙুলগুলো বাধতো টাগরায়
একবার আগ্রায় গেলুম পুজোয়
পেতেনের ওপর কুঁজোয় থাকতো ফটিক জল
মা বলতেন, খোকা জানিস, ঐ জলের নাম জীবন
ঢোক্-ঢোক্ জল খা, খাবার-দাবার সময়ে খাবি
যখন যা পাবি, এখানে কেউ চায় না
আরশিকে বলে আয়না—
খোকা, ভদ্রতা বজায় রাখবি...

এক পাড়াগাঁ থেকে আরেক পাড়াগাঁয় উঠে এলুম
রেলগাড়ি থামলো এসে মিষ্টিগুড়ের ইস্টিশানে ॥

মৃত্যুর মহান জাতিস্মর

সমস্ত সময় থেকে সময়ের বাহিরে দেখেছি
তোমার উজ্জ্বল রূপ, হে নিষাদ, হে মর্মঘাতক
একদিন ; আজ তার ব্যাপকতা বিস্ময়বহতা
হিংসা, প্রতিশোধ নয়, শুধু এক একাগ্র হিংসার
রূপ দেখে, কান্তি দেখে আমরা ভিতরে বহ্নিমান—
এ কী অরাজক দিন বাংলাদেশে মুহূর্তে এসেছে ?
একদিন অন্ধকারে কেঁদেছিলো আলোকের কবি
আজ জনপদে হয় বহ্ন্যুৎসব আলোর চিৎকার
ক্রমাগত কবি সুখী দেখে কেন আলোর সুস্থতা
এবং ঋষির মতো নিস্পৃহতা, পাথরের মতো ।
এরই মধ্যে ভালোবাসা দৈনিক আপ্লুত হয় রসে
প্রকৃত তাত্ত্বিক ঘরে বসে পড়ে মার্কসীয় দর্শন
ভিতরে-বাহিরে দুই কোলাহল দু-মহাল গড়ে
প্রতিটি নিঃশ্বাস থেকে তৈরি হয় শব্দ রাতারাতি
বিমূঢ়তা থেকে ওঠে মৃত্যুর মহান জাতিস্মর ॥

মৃত্যুর দাক্ষিণ্যহীন যেন দীর্ঘ দেবদারুবীথি

কে জানে বা কার ভুলে অতো বড়ো সুঠাম মহাল
ভেঙে ভেঙে টুকরো হলো, মণ্ডপে একাকী পায়রা জাগে
অভিশপ্ত দেবদারু টলোমলো ঐশ্বর্যে শিখর
দোলায় এবং সে-আলোছায়া দ্যাখে এক নগণ্য পথিক
বারবার, পথ ভুলে, ঐ পথে ফিরে ফিরে আসে—
মনে হয় ভেঙে-পড়া, টুকরো হাওয়া তার লাগে ভালো
কে জানে বা কার ভুলে অতো বড়ো সুঠাম মহাল
ভেঙে ভেঙে টুকরো হলো, মণ্ডপে একাকী পায়রা জাগে
অন্যেরা ঘুমায় আজ ক্লান্ত শুধুমাত্র বেঁচে থেকে
মৃত্যুর দাক্ষিণ্যহীন যেন দীর্ঘ দেবদারুবীথি
পথিকের কেউ নয়, মহালেরও কেউ নয় আর ॥

প্রত্যেকেই পৃথক বিপ্লবী

মানুষের মধ্যে আলো, মানুষের মধ্যে অন্ধকার
প্রত্যক্ষ করেছি কাল মধ্যরাতে হিংসার আড়ালে
যেন ইতিবৃত্ত ঠেলে আসা কোনো মর্মন্তুদ ছবি—
আক্রমণ, তরবারি, রক্তময় ভীষণ হিংস্রতা
তেমনি দেখেছি কাল মধ্যরাতে শিশুর সহিত
জেগে থেকে, কথা বলে গভীর, পুরনো, সাংকেতিক
ভাষায়, না শব্দ হয়, যাতে না দুজনে ধরা পড়ি।
দোষ নেই, তবু নষ্ট হতে হবে যেহেতু মানুষই !

মানুষের মধ্যে আলো, মানুষের মধ্যে অন্ধকার—
কেউ কেউ বেঁচে আছে, কেউ কেউ মৃত্যুর স্পষ্টতা
নিয়ে স্বাভাবিকভাবে স্তন্য দেয় নিজস্ব শিশুকে
গভীর, ব্যঞ্জনাময়, বিপ্লবের ধোঁয়া এই দেশে
মানুষের বুদ্ধি, মায়া, কায়ক্লেশ প্রাণ নিয়ে খেলে
অধিকন্তু, নিজ শর্তে প্রত্যেকেই পৃথক বিপ্লবী ॥

সুন্দরের বিকল্প

সুন্দরের কাছে থাকতো সুন্দরের বিকল্প একদিন !
আজ সব ভেঙে-চুরে পৃথিবীর গেরস্তের বাড়িঘরদুয়োরের মতো
নোনা ইট-তক্তা-কাঠ-ঝামা হয়ে গিয়েছে ছড়িয়ে...
সে আর বিকল্প নয় সুন্দরের ; কিছু নয় আজ ।

কিন্তু সে-স্তূপের পরে একদিন যদি গাছ ওঠে,
বৃষ্টির পীড়ায় ফুটে ওঠে ভাঁট করতালি দিয়ে
তখনি সুন্দর—তার সাজগোজ, বনের গম্ভীর
গন্ধ ও বাতাস বয় ! অন্যপারে নতুন বাড়ির
বেড়াল কারণে ঘোরে তবু জনশূন্য ভাঙা মাঠে ।
সে-ই কি সুন্দর তবে ? সুন্দরের বিকল্প সুন্দরী ?

দশমী

আগুনে তার মুখ পুড়েছে হঠাৎ যখন সন্ধ্যে
বাতাস খুঁটে গা খেয়েছে, ফাঁক ভরাতে মন দে
নয়তো পাঁচিল পড়বে টলে শেষরাতে তার সময় হলে
বাতাস বাঁধে ঝড়ের মাথা ধুলো-বালির গন্ধে
আগুনে তার মুখ পুড়েছে হঠাৎ যখন সন্ধ্যে ।

জলের মধ্যে দেহটি তার মাছের দাঁতে কাটছে
উলুক ঝুলুক শালুক ফুলের পাতায় দেহ চাটছে
ভালোবাসায় হুলুস্থুলুস এই ভাবে তুই দুঃখ ভুলুস
পোড়া চাঁদের আকাশে মেঘ ঘুমের ভেতর ফাটছে
জলের মধ্যে দেহটি তার মাছের দাঁতে কাটছে ॥

এই মেঘ থেকে বৃষ্টি

মনে হয়েছিলো এই মেঘ থেকে বৃষ্টি হবে ঠিকই
মুখপোড়া বারান্দায় ভেসে যাবে সমস্ত নির্ভীক
স্বায়ত্তশাসন রক্ত, তার দাগ, মাত্র বলিদানে...
কলকাতায় আজ কে না জানে
মানুষের মধ্যে এক অবিমিশ্র খেলাধুলা হয়
রাত্রিদিন, সমস্ত সময়
প্রাণপণ ।

ফুটপাতে বারুদ আব চাঁপার হলুদ মুখোমুখি
কে জানে কে জেতে হারে, কেবা দুঃখে সুখী
নির্জনতা ভালো, কিন্তু কতটুকু ভালো ?
সন্ধ্যার চৌরঙ্গী যেন রাস্তায় স্থগিত ভুল মেয়েটিব কালো
মুখশ্রী, নৈরাশা
চমৎকার রসে ভেজে পাকে-পাতা পাশা
উড়েদের
কলকাতায় ঢের
আলুথালু বৃষ্টি হয়েছিলো গত শান্তির বছরে—
ফুটপাতে বারুদ আর চাঁপার হলুদ মুখোমুখি
তবু, এবছর বৃষ্টি, বৃষ্টি হবে ঠিকই ।

অলিভ কামিজ আর কার্তুজ রাঙিয়ে যায় চোখ
হোক, ক্রমাগত মৃত্যু হোক—
একদিন বাঁচাবো নিভৃতে
সেদিন দূরত্বে নয় বড়ো
মানুষে-মানুষে মাপে কোষমুক্ত ফিতে
কার দোষ ? কে করে বিচারও ?
বশবর্তী স্নেহে আর সূত্রে আজই লেগেছে আগুন
সহসা কীভাবে।

দিন যাচ্ছে, যাবে
নতুন ইশকুলে আজ অস্ত্রশিক্ষা হয়
কী সহিংস কিশোর-হৃদয়
পাটের ফেঁসোর বাধ্য আঁটুলবাঁটুল টুকরো লোহা
যা দিয়ে বেঁধেছে বোমা তা সবই তারুণ্য-প্রাণঘাতী
সাংঘাতিক মন্ত্র এই অকস্মাৎ বিংশশতাব্দীর
কয়েকটি বছরে...
ঘরে ঘরে

মানুষ সর্বত্র শান্তিহীন
পথ চলে পিছনে তাকায়
কে যেন তান্ত্রিক ছুরি নিয়ে চলে সবারই পশ্চাতে
সামনে-পিছনে ভয়, ভয় ঊর্ধ্বে নিচে
হাতে মাথা কেটে রাখে আবশ্যক পাগল পিরিচে
কেন ? তা প্রকৃতপক্ষে জেনে রাখা প্রয়োজনই নয়
নতুন ইশকুলে আজ অস্ত্রশিক্ষা হয়
পোড়ে বই, ওড়ে চৈত্রে-শুকনো পাতাগুলো
এবং প্রাচীন বৃদ্ধ কাটামুণ্ড ধুলোয় লুটোয়
বিপ্লব এভাবে শুরু, জানি না কী অঙ্কে যবনিকা ?

অথচ আমার ঘর থেকে ও-ই বাইরে এসেছে
স্বপ্ন ও সমৃদ্ধ ওকে গড়েছিলো বড় সাধ করে
একদিনে পালটে গেলো, ফুলে উঠলো রগের শিকড়
ঠাণ্ডা স্পর্ধাভরা এক তাচ্ছিল্যে আমায় ঠেলে দিয়ে—
ও আমার প্রিয়তম সহোদর, মিশে গেলো ভিড়ে
এবং মিশলো না—একা পড়ে থাকলো পাথরের মতো
নীরব, করিতকর্মা, সমুদ্রের মৌন ও গভীর।

কেন করে ? ওরা কেন করে ?
স্তম্ভিত বিমূঢ় হয়ে বসে থাকি যেন এই ঝড়ে
দাঁড়াতে পারবো না আর,
টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাবো, ধ্বংস হবে মাথা
মেলাতে পারবো না দুই সহোদর প্রাণের প্রণেতা
আমি ও আমার ভাই
দুজনের স্বাতন্ত্র্যও চাই, দুজনের দুই রাজনীতি
দুটি পথ—দুজনেই যাবো
ও পথে করবে না দেরি, আমি দ্রুত যাবো
যদি পারি ।

দিন যাচ্ছে, যাবে
প্রকৃত কি যাচ্ছে দিন ? থেমে নেই ? স্থবিরতা নেই ?
মৃত্যুর মহান আসে জীবনের তুচ্ছতার কাছে ॥



যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো

সূচিপত্র

যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো ?

ভাবছি, ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো ।

এতো কালো মেখেছি দু হাতে
এতো কাল ধরে !
কখনো তোমার ক'রে, তোমাকে ভাবিনি ।

এখন খাদের পাশে রাত্তিরে দাঁড়ালে
চাঁদ ডাকে : আয় আয় আয়
এখন গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে
চিতাকাঠ ডাকে : আয় আয়

যেতে পারি
যে-কোনো দিকেই আমি চলে যেতে পারি
কিন্তু, কেন যাবো ?

সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো

যাবো
কিন্তু, এখনি যাবো না
তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবো
একাকী যাবো না অসময়ে ॥

পথে যেতে কষ্ট হয়

পথে যেতে কষ্ট হয়, পথের একপাশে বসে থাকি ।
গভীর গাছের নিচে বসে থাকি যেন শুকনো পাতা—
পাতার মতন থাকি, কষ্ট পাই, বাতাসের হাতে,
উড়ে যেতে পারি ব'লে ভয় পাই, পুড়ে যেতে পারি ।

পথে যেতে কষ্ট হয়, তাই একপাশে বসে থাকি

পড়ে থাকি ঢিবি কিংবা পুরাতন পাথরের মতো—
অবচীন নয়, নয় গৃহসাজ, নিশ্চিন্ত পাথর।
কাজের পাথর নয়, কাজ ছেড়ে পড়ে আছে পথে,
পথের উপরে নয়, কিন্তু সরে, পথের একপাশে—
গভীর গাছের নিচে পড়ে আছে পাথরের মতো।

পথে যেতে কষ্ট হয়, তাই পথপাশে বসে থাকি।

মৃত্যু

পুড়ছিলো ঐ শ্মশান ভরে কাঠের রাশি
পুড়তে আমি ভালোবাসি, ভালোই বাসি।
পুড়তে আমি চাচ্ছি কোনো নদীর ধারে।

কারণ, একটা সময় আসে, আসতে পারে
যখন আগুন অসহ্য হয় নদীর ধারে।
এবং মড়া চাইতে পারে এক-কুষি জল!
মৃত্যু তখন হয় না সফল, হয় না সফল!

এই কি সময়?

কেন ক্রুদ্ধ নখ বেঁধে কাঁধের উপরে?

টিলাখানি চিৎ, কাঁধে গাছ তার শিকড় গেড়েছে
খর, হিংস্র নখ নয়, সম্ভোগ-সংক্রান্ত নখগুলি
বিঁধে, হল্লাগুল্লা করে, সানুদেশে আনন্দও করে।

কেন ক্রুদ্ধ নখ বেঁধে কাঁধের উপরে?

এই কি সময় ঐ দুজনের পর্যুদস্ত হওয়া

প্রেম ও পাথরে ? আছে চতুর্দিকে বনবর্গী হাওয়া
ঝর্নার নিকটে কিছু চাওয়া আছে গ্রামবাসীদেরও !
এই কি সময় ঐ দুজনের পর্যুদস্ত হওয়া
প্রেমে ও পাথরে ?

বিড়াল

সুখের অত্যন্ত কাছে বসে আছে অসুস্থ বিড়াল
পশমের অন্তর্গত হয়ে আছে অসুস্থ বিড়াল
খুব কাছে বসে আছে হিতব্রতী অসুস্থ বিড়াল
কাছে বসে আছে কিছু পাবে বলে, অমরতা পাবে ।
কাছে পেয়ে রাখা শক্ত, ঢাকা শক্ত চাদরে কাঁথায়
ঢাকা শক্ত ঘরে বাইরে, ঢাকা শক্ত অসুখে-সম্মোহে
সুখের অত্যন্ত কাছে বসে আছে অসুখী বিড়াল ॥

অসহ্য আমার

যদি তুমি সন্তানের দুটো চোখ পোড়াও কাজলে
—আমার অসহ্য হবে ।
আমি কোনদিন এই কলংকের শোভা
দেখতেও পারি না ।
স্বাভাবিকতাই কোনো শিশুকে মানায়
ক্ষয়িষ্ণু মানুষে তুমি রং-বর্ণ দিও,
পরিপূরকতার জন্যে দিও তাকে কবচকুণ্ডল ।
শিশুদের ক্ষয় নেই,
আলো-বাতাসের দয়া ওরা আজো সমগ্রে মাখেনি ।

হাত পেতে দাঁড়িয়ে

হলুদ শস্যের মধ্যে হাত পেতে রয়েছে দাঁড়িয়ে
একা লোকটি. হাত পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে,
হলুদ শস্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে
সারাদিন ।
অন্নপূর্ণা, অন্ন দাও—ব'লে সেই যোজন বিস্তৃত
মাঠে, একা দাঁড়িয়ে রয়েছে ;
পূর্ণ হয়ে যায় তার শূন্য করতল —

নিচে থেকে আমি ঐ রূপবান

পর্দাগুলো হার মানছে বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিতে ।
বাহিরে বাতাস বেশি, খর হয়ে উঠছে রোদে নুনে,
চটচটে চামড়ায় টিপ দিতে উঠে আসছে ধুলোবালি—
পরিচ্ছন্ন থাকা বড় কষ্টকর সমুদ্রের পাশে ।

সমুদ্র জীবিত আছে, মৌনের উপরে আছে মেঘ,
মেঘের মতন এলোমেলো ঢেউ আছড়ে পড়ে তীরে,
আবার গুটিয়ে যায়, কেন্নোর মতন, ছোঁয়া লেগে ।
ফুঁসে ফিরে আসে ফের, ঘা-খাওয়া জন্তুর মতো, তীরে ।

এইভাবে কিছুদিন সমুদ্রের পাশে থেকে উঠে—
জঙ্গলের দিকে সরে যেতে পরিণত লোভ হলো ।
সেখানে, শালের বনে, ক্ষেপে ওঠে হাওয়ার সংস্রব,
শান্ত হাওয়া দোল খায়, শালের শিখর ধরে একা—
আকাশ তাকিয়ে থাকে, বাল্যকাল বাতাসের দিকে ।

নিচে থেকে আমি ঐ রূপবান আন্দোলন দেখি ॥

তুমি একা থেকো

দেবদারু বীথি শুধু তোমাকেই টানে
গভীর শিকড়ে তার, তুমি স্তনাপায়ী !
ওখানে দুধের রং, রসবর্ণ পছন্দ তোমার
একথা পোস্টারে লিখে এঁটে দিয়ে গেছো—
কোনোদিন, মধ্যরাতে, জ্যোৎস্নার ভিতরে ?
সত্যি কথা বলো, আমি চেষ্টা করে দেখি ।

কোলের কাঙাল আমি, পিপাসার্ত আমি,
কেবলি চন্দন-চিতা আমন্ত্রণ করে :
চলে এসো, অন্যথা করো না ।
বাসা খালি আছে, বালি সরানো হয়েছে
চলে এসো, অন্যথা করো না ।

এভাবে যাবার আগে, দেবদারু, শিকড়ে মুখ রাখি
অন্তত একবার যাই, তারপর যথা ইচ্ছা যাই—
তুমি একা থেকো ॥

শুধু বাঁচতে চাই

পাড় খসে পড়ছে নদীর, নদী
চওড়া হচ্ছে, দুদিকেই তার বাড়বাড়ন্ত
ফুলে-ফেঁপে জল কামড়ে ধরছে মানুষের
ঘরবাড়ি, গেরস্থালি তছনছ
জল যাচ্ছে গড়িয়ে—তেড়ে, বাদা ভেঙে
মাঠ গুঁড়িয়ে, কাৎ হয়ে পড়ছে গাছপালা
ডাঙা থেকে তালকানা পাখি মারছে
আকাশের দিকে লাফ, পরিত্রাণ
চাই, বাঁচতে চাই, বেঁচে থাকতে চাই
শুধু বাঁচা, অহরহ মৃত্যুর ওলোটপালোটের
মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই, শুধু বাঁচতে চাই

শেষদিনে

হৃদয়ের মধ্যে ক্ষুধা, এতোদিন পর—
এতোদিন বাসযোগ্য ছিলো না কি ঘর ?
হৃদয়ের মধ্যে ক্ষুধা, এতোদিন পর !

দিনের দ্যোতনা শুরু, সংক্রান্তির শেষ—
ভিতরে-বাহিরে ছিলে তুমি অনিমেষ।
দিনের দ্যোতনা শুরু, সংক্রান্তির শেষ !

শেষের দিনেও ওড়ে প্রীতিপ্রদ ছাই—
হারিয়ে-ছড়িয়ে তাকে কেন কাছে পাই ?
শেষের দিনেও ওড়ে প্রীতিপদ ছাই !

বলো, ভালোবাসো

এই হাসপাতালে এসে দেখি শুধু আমার অসুখ।
আর সবাই সুস্থ, প্রাণবন্ত, শুধু করিডোরে হাঁটে—
এদিক-ওদিক যায়, জানলায় দাঁড়ায়, পাখি দ্যাখে,
পাখিদের সঙ্গে কিছু কথা বলে, খবরকাগজ
এখানে আসে না।
কে আর তোয়াক্কা করে খবরের, তেলের দরের ?
এখানে সোনার চেয়ে দামি কিছু নীরোগ মানুষ !
আমার অসুখ, একা আমিই অসুখী, তাই আছি
বিছানায় শুয়ে আছি, বসে আছি, দাঁড়িয়ে রয়েছি
আয়নার সম্মুখে, তুমি আমার ভিতরে কথা বলো
ভূতপ্রেত যাই হও আমার ভিতরে কথা বলো
ভালোবাসা কথা বলো, হোক না সে ছুঁচের মতন
নিষ্ঠুর, নাঞর্থ কথা, কথা বলো আমার ভিতরে
বৃষ্টির মতন কথা, বিদ্যুতের, শিকড়ের কথা—
বলো, ভালো আছো আর তোমার অসুখ সেরে গেছে
বলো, ভালোবাসো তাই তোমার অসুখ সেরে গেছে ॥

গাছের শিকড়গুলি দাঁড়িয়ে আছে

গাছের শিকড়গুলি মাটি ধরে কী তীব্র ক্ষুধায়
প্রতিষ্ঠিত হবে বলে দাঁড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘদিন
মানুষের মতো তার প্রতিষ্ঠাও চাই, মনে ক'রে—
দাঁড়িয়ে রয়েছে একা-একা, ঐ জঙ্গলের মাঝে।
জঙ্গল মিলিত-বৃক্ষে, পাতায় সংবদ্ধ হয়ে আছে,
ভিড়ের মতন আছে, হয়ে নেই গাছের মতন
একক, নিঃসঙ্গ হয়ে, আছে ভিড়ে সমুদ্রের মতো
নীলকণ্ঠ ঢেউ, জল, বালি আছে, জলের নিকটে।
গাছের শিকড়গুলি মাটি ধরে কী তীব্র ক্ষুধায়
প্রতিষ্ঠিত হবে বলে দাঁড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘদিন ॥

পুরনো নতুন দুঃখ

যে-দুঃখ পুরনো, তাকে কাছে এসে বসতে বলি আজ
আমি বসে আছি, আছে ছায়া, তার পাশে যদি দুঃখ এসে বসে
বেশ লাগে, মনে হয়, নতুন দুঃখকে বলি, যাও
কিছুদিন ঘুরে এসো অন্য কোনো সুখের বাগানে
নষ্ট করো কিছু ফুল, জ্বালাও সবুজ পাতা, তছনছ করো
কিছুদিন ঘুরে দুঃখ ক্লান্ত হও, এসো তারপর
পাশে বসো।
এখন পুরনো এই দুঃখকে বসার জায়গা দাও
অনেক বাগান ঘুরে, মানুষের বাড়ি ঘুরে, উড়িয়ে-পুড়িয়ে
এ আমার কাছে এসে বসতে চায়। কিছুদিন থাক।
শান্তি পাক, সঙ্গ পাক। এসো তারপর।

ও নতুন দুঃখ তুমি এসো তারপর ॥

ফিরে আসে

কুলিক নদীর জল বাঁধা পড়ে আলস্যে মাটির

গাছের ছায়াটি গাছে ডুবে আছে দুপুর রোদ্দুরে
বৃষ্টি নেই, পাতাগুলি পুড়ে গিয়ে হয়েছে পাথর
গুলমোহর ফুল আর শুকনো পাতা লুটোচ্ছে গাছের
গোড়ায়,
শিকড় জুড়ে আনন্দ-র পাতা করতল
পূর্ণ করে জল চায়, জল দাও, ক্লান্ত, চণ্ডালিকা

জল দাও শিকড়ে আমার
জল দাও হৃদয় ভাসায়ে
শ্রাবণের বৃষ্টিতে ভাসাও
আমার শিকড় দেহখানি

কুলিক নদীর জলে বৃষ্টির পাখিরা ফিরে আসে
ফিরে আসে সবুজে আমার
ফিরে আসে জলের কিনারে
ফিরে আসে ঘাসে ও পাতায়—

কুলিক নদীর জলে বৃষ্টির পাখিরা ফিরে আসে ॥

দু'জনের জন্যে

দু'জনের জন্যে এই স্বেচ্ছানির্বাসিত বনবাস

গরুমারা বাংলোখানি জঙ্গলের গভীর টিলার
উপরে, ঘোমটা পরে আছে—মুখ দেখবো বলে
সমতল থেকে আমরা উঠে এসে দুয়ারে দাঁড়াই ।

পাটাতন তুলে নাও, পরিখা সজাগ করে দাও
যাতে হাতি প্রভৃতি জন্তুরা
বাংলোর উঠোনে চলে সরাসরি না ভাসাতে পারে

হিংস্র ও নিষ্ঠুর লোভ স্থগিত বাতাসে।

জঙ্গলে বাতাস ভারি, সামান্য ঝিঁঝির শব্দে, মনে হয়, পৃথিবীর ক্ষতি
দারুণ গভীর হয়ে কানে বাজে মানুষের একা
গাছ সবই দ্যাখে আর অধিকন্তু, তারই বেশি দেখা
মানুষের চেয়ে, তার পাতার সহস্রতম চোখ।

দুজনের জন্যে এই স্বেচ্ছানির্বাসিত বনবাস...

উত্তরবঙ্গের রঙ্গভূমে

বাংলোর দোতলা জুড়ে জাল পাতা, ভিতরে দর্শক
কে যে কাকে দ্যাখে? দূর অরণ্যের সমূহ চকের
সম্মুখে মানুষ এসে বসে আছে বারান্দার কোণে—
কিছু দেখবে ব'লে, কোন স্বাধীন জন্তুর চলাফেরা
দেখবে ব'লে, ব'সে আছে, মাথার উপরে আছে চাঁদ
মূর্তির চরের পাশে প'ড়ে আছে লবণের ফাঁদ
যদি কোন জন্তু আসে, খেয়ে যায় মানুষের নুন
মানুষের ছোলা, গুড়, বুট ডাল খেতে যদি আসে
দর্শক সাগ্রহে দেখবে, কিন্তু কেউ আসে না এখানে
আসে কিছু পাখি, করে ডাকাডাকি, রাতে চলে যায়
রাতভর পড়ে থাকে কুয়াশার চাদর জড়ানো
বনভূমি, কিছু নেই, শুধু আছে রাতজাগা চাঁদ
গরুমারা ডাকবাংলো ধ'রে এক গার্হস্থ্যের ফাঁদ
মানুষ যেখানে বন্দী, মানুষ সেখানে এসে পড়ে
গভীর অরণ্য থেকে তাকে দ্যাখে শ্বাপদের চোখ
বিপরীত খেলা হয় উত্তরবঙ্গের রঙ্গভূমে!

ডোঙ্গরপুরের বাংলোয় সন্ধ্যা

এ-অঞ্চলে কখনো আসিনি

শীতের সকাল ফুঁড়ে, কাঁটা বাবলা বন জুড়ে
কালো পথ এখানে এনেছে।
দুদিকেই ধুলোমাখা জমি
দূরে, বহুদূরে খোড়ো গ্রাম,
মানুষেরা দীর্ঘ, পেশীময়,
পাতালে ডাঙ্গশ মেরে জল টেনে আনে—
পরিশ্রম করে দুটি হাত ভরে ভুট্টার দানায়,
বাঁচা কষ্টকর,
তবু বাঁচে।

পাহাড় পেঁচিয়ে পথ ওঠে,
পথ নামে ন্যাভির গুহায়,
সেখানে সানুর শান্তি মেখে উট চরে।
রঙের ছটায় জ্বলে রাজপুতানীর গূঢ় চোখ,
আলস্যের ছায়া নেই আরাবল্লী পাহাড়শ্রেণীতে।

ডোঙ্গরপুরের বাংলো থেকে দেখা যায় রাজবাড়ি
ভাঙ্গা দুর্গ, অসীম সৌষ্ঠব
হ্রদের, সেখানে আধো-উড়ে পাখি পড়ে
হাজার হাজার হাঁস,

আমরাও উড়েই এসেছি—
অজানা অচেনা এই সীমান্ত-শহরে
ডোঙ্গরপুরের এই হিম-বাংলোঘরে আমরা একরাত কাটাবো।
তারপর উড়ে যাবো,
হাঁসের মতন নয়, জীবনে কখনো, জানি, এখানে আসবো না।
একদা ভীলের এই রাজধানী একবার গ্রহণ
করেছে আমাকে, তাই, মনে থেকে যাবে—
রাজপুতানীর আলগা দুরস্থিত হাসির মতন,
সরল সুন্দর ভীল-ডোঙ্গরপুর, কোলে রেখেছিলে—
একদিন, একরাত বাংলোঘরে, শীতের সন্ধ্যায় ॥

কিছুতে মেলেনি

এরকম হয়েছে দু-দিনই।

মধ্যরাত, জ্যোৎস্না উঠেছিল,
কানাগলি জুড়ে বান ডেকেছিল তা থৈ তা থৈ,
বাতাস মরমী ছিল,
সড়কের বাতি ছিল কিছু মনমরা,
ঔদাসীন্য-মাখা ছিল প্রাসাদ-দরজা।

কিন্তু, বহু ভাবে চেনা নিজের বাড়িটি—
খুঁজে-খুঁজে খুঁজে-খুঁজে কিছুতে মেলেনি
একদিন, পরেও একদা!

কিছু আছে

দুঃখের সমস্ত কিছু আছে, শুধু অলংকার নেই
অলংকার এঁটে আছে রমণীর আলুথাল গায়ে
এবং যা আছে তাকে অনাবশ্যকতা নিয়ে গেছে
শালবন গভীর, তাতে মায়া আছে, মাৎসর্য রয়েছে
দুঃখের সমস্ত কিছু আছে, শুধু অলংকার নেই
অলংকার বসে আছে কবিদের—মাছির মতন
শব্দের মতন তীব্র সাঁওতালের মাটির কুটিরে
কবির সমস্ত কিছু আছে, শুধু একাগ্রতা নেই।

ধ্বংস করো

বৃষ্টিতে কেমন লাগবে, একদিন পুলকে পালক
ভিজিয়ে দেখেছি, ভালো তেমন লাগে না।
বরং বারান্দা থেকে যদি দেখি তুমি ভিজে কাক,

কেমন রোমাঞ্চ লাগে, প্রখর কনট্যুরে
ভাসে বয়া, সুঁড়িপথ, ধারালো কাস্তান,
অহরহ মেঘ করে সজল আকাশে,
কখনো চিকুর দেয়, শিরায় দোপাটি
ফেটে সর্বনাশ করে রক্তের ভিতরে...

ধ্বংসে ধ্বংস করো দেহ মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়ে

শুধু দুদিনের জন্যে

শুধু দু'দিনের জন্যে ঘর ছেড়ে বাহিরে বেরুনো
দুদিনের জন্যে শুধু ঘর ছেড়ে পথের উপরে—
বনের ভিতরে বাংলো, বাংলো থেকে দেখা যায় নিচে
কাকচক্ষু জলস্রোত ভেসে আছে নদীর পিরিচে
দুধার উধাও ঐ জঙ্গলের পাহাড়ের দিকে
দুধার নেমেছে নিচে রমণীর উরুর মতন
সানুদেশে, উপত্যকা জুড়ে এক দৃশ্যের সুষমা
দুদিনের জন্যে টানে, চিরদিন নয় !

চিরদিন ঘরে থাকা, পরে থাকা অন্তরে, গভীরে...

জানলা থেকে মুখ বাড়ালে

জানলা থেকে মুখ বাড়ালে নদী আমার ছোট্ট নদী
গঙ্গা থেকে ছুটে আসছো বাড়ির পাশে থাকবে ব'লে
আকাশ ভেঙে পড়লো হঠাৎ শহরে ময়দানের ঘাসে
জানলা থেকে মুখ বাড়ালে নদী আমার ছোট্ট নদী

হারিয়ে গেছে গলির শহর, বাস ডুবেছে, ডুবেছে ট্রাম
কলকাতা শহরটি দেখায় বানের জলে ভাসন্ত গ্রাম

চেনা যায় না, চেনা যায় না—গলির নদীর নৌকো বুকে
চলছে ছুটে এদিক-ওদিক, ঘাটগুলি ঐ সিঁড়ির প্রান্ত।

মেঘের বিমান যাচ্ছে উড়ে ; আমরা গভীর শব্দ শুনি
শব্দ খুবই রহস্যময়—বরিশালের গাঙের পানি
যেমন ভাবে শব্দ করে, কামান দাগে জলের নিচে
তেমন মেঘে কাটছে আগুন জল পড়ে এই মৃৎ পিরিচে।

আগুন লেগেছে

কম্বলের একপ্রান্তে আগুন লেগেছে।
একপ্রান্ত পুড়ছে, হাওয়া উড়ছে ধুলো পাতা নিয়ে দূরে
এদিকের চেনা গলি, কাছে আসবে বুকে হেঁটে, ঘুরে—
পোড়াবে, ওড়াবে সব কম্বলের ছাই।
দেখা পাই
ভিতরে-বাইরে
কম্বলের মতো পুড়ে গেছে দুটি মুখ
সাগর এবং নদী এবং যে-ভূমিতলে মেশে...
পোড়া রূপ লাগে ভালো
লেগেছে অসহ্য টান বুকে ও পাথরে।
পুড়েছে কম্বল, যার প্রান্ত নেই, শুধু ওড়ে ছাই...

ভালোবাসার শিকড়

ঘরেতে তার একটি দুয়ার, অনেকগুলি জানলা
ঘরের মধ্যে আলমারি খাট পোশাক-বোঝাই আলনা
সে যে মানুষ, শুধুই মানুষ, তাই এ হেন সজ্জা
মনের ভিতর জানলাবিহীন অনেকগুলো দরজা
কপাট খোলা সপাট তাদের মধ্যে দিয়ে আসছে
আকাশ বাতাস নদীর পানি, আমায় ভালোবাসছে
ভালোবাসছে আমায় একা, একলা ভালোবাসছে

কাছে আসছে, দূরে যাচ্ছে, কেবল ভালোবাসছে
ভালোবাসার শিকড় আমায় জড়িয়ে করে গাছটি
মাটির উপর দাঁড় করিয়ে, ছায়ায় কাছে আসছে
গভীর ভালোবাসছে আমায়, দারুণ ভালোবাসছে ॥

কেন আছে

মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বটের ছায়ায় ।
শান্ত কাঠামোয় আছে বাইশটি মৃত্যুর দাগ, জলের ভিতরে
চলে গেছে যন্ত্রপাতি, খোয়া গেছে আনমনা রং
আজ একা নদীতীরে শুয়ে আছে বাতিল তরণী —
প্রকৃত তরণী নয়, ঐ লনচ এখন ভাসে না
জলের ভিতরে ডুবে কোন্ স্বার্থ খুঁজতে গিয়েছিলো ?
বাইশটি জীবন নিয়ে তার খেলা খুবই মারাত্মক
আজ একা নদীতীরে শুয়ে আছে বটের ছায়ায়
বিবেচনা-হারা হয়ে পড়ে আছে ঘাসের উপরে
শান্ত কাঠামোয় আছে বাইশটি মৃত্যুর দাগ সর্বাঙ্গে জড়িয়ে
কেন আছে, নিজেও জানে না ।

আগুনের ফলা টেনে

ডুরেকাটা সিলকপাতা মনস্বী পড়ুয়া দেবদারু
পিছনে তামাম মাঠ বড়োসড়ো সবুজ পাপোশ এই প্রতিষ্ঠানে
সিং-দরজা, মধুবনী গোঁফ, বাঁধানো চাতাল জুড়ে
দেশলাই-বাক্সর মধ্যে দিয়ে চোখ চলে যায় শূন্য করিডোর,
আলো, ভাঙা বরফের রাঙা চাঁই—বিষম ত্রিভুজে, পড়ে আছে
মাড়াবার কেউ নেই, ঠেলে ফেলে দেবে ছাঁচে তেমন লোকের
প্রকৃত অভাব, এই পড়ন্ত বিকেলে, সন্ধ্যার চৌকাঠে ঠেকে
জনশূন্য করিডোর, উত্থানপতনময় সিঁড়ির মারবেল, পড়ে আছে
দরোয়ান-টুপি থেকে ধোঁয়া ওঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে, ঝরে বটফল...

গ্রোন, সকালে সেখানে ব'সে ঘন্টা শোনে ধীমান-ধীমতি
ক্লাসরুম ভরে যায় মৌমাছিতন্ত্রের মন্ত্রপাঠে
মণিপদ্মে হুং ওঁ মণিপদমে..

ঢাকাবারান্দার খোপে চাকা কাদামাটি নিয়ে আসে
বুড়োসুড়ো কাঁচাঘাস ফেলে যায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে
মনান্তরের মতো দাগ, গাড়ি ঝেড়ে দেয় উৎক্ষিপ্ত পেটরোল
স্বাভাবিকতার মাত্রা ঠিক রাখতে প্রাণপণ করে
নিজের সন্ততি এনে সেই পুরাতন ঘরে, বেনচে বসতে
সাধ হয়। যেন বসে, যেন কাটে পেনসিলকাটার
ছুরিতে নিজের নাম হাইবেনচ, দেয়ালে, পাথরে।

সাধ হয়, দেবদারু-ছায়ার ভিতরে, গ্রোনে, বসে কয় বরষাপীড়িত
সেদিন মনের কথা
মেঘের চাঁদোয়া ফুটো, বৃষ্টি পড়ে সবুজ ছাতায়
পিছনে দেবদারু ফল বাঙা মরামের কোণে উজ্জ্বল বীজের
আগুনের কলা টেনে বের করে গাছ হবে ব'লে।
গাছ হয়!

প্রেমের মতন কাছে এসেছিলো

সোনা রূপো তামা থেকে ভয় পাই, ধুলাতে পাই না
প্রাসাদ পরিখা দেখে ভয় পাই, নিকটে যাই না
শুধু পথে পথে ঘুরি, সে কারো নিজস্ব নয় ব'লে
সে তোমার সে আমার, ভিখারির ঝুলিতে কম্বলে
মুখ ঢেকে শুধু থাকে, পড়ে থাকে, উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন।
রাত্রি তো সর্বদা সঙ্গী, তাই, মাঝে মাঝে আসে দিন—
কৃপা করে কাছে আসে বাল্যকাল স্মৃতির মতন
আমলকিতলা নিয়ে কাছে আসে স্মৃতির মতন
আলতামাখা পদচ্ছাপ নিয়ে আসে দূরস্থিত শোকে

প্রেমের মতন কাছে এসেছিলো—বলেছে কুলোকে!

মানুষ কেন ?

এলটে পর্যন্ত পরনের তেনি তোলা
কাদায় মাখামাখি কালো-কোলো ছেলের পাল
ফুর্তির মাছ মারতে লেগেছে, ডোবায়
ডোবার মাঝামাঝি গোড়ালি উঁচু আল।
ওপার সাবাড়
কুচো কাচা জিয়ল মাছে কোঁচড় ভর্তি
কারো বা কঞ্চির খালই
ভরভরন্ত
এপারের পানি ওপারে ছেঁচে
চালান করে
মাছ মুঠ করবে।
বর্ষার আগ ভাগ
ছিষ্টি পুড়ে খাক
ছেলেগুলোর পিঠ পুড়ে আগুন
তুঁষের ধোঁয়ায় তিজেল যেন
সেই আগুন নেবাতে তাল তাল পাঁক তুলে
ঘুঁটে দিচ্ছে দেয়ালে
যতটা হাঁসফাঁস কমে
চেষ্টা এই
পরে তো আছেই
মাখন-পাঁকে গড়াগড়ি
ঘুনি-আটল পাতার দিন নয় এখন
এখন সুদ্দু ছেঁচে তোলা
ছেঁচে তেল বিনে খলসে ঝলশে খাওয়া
আর যদি হয় শোল
পুড়িয়ে জুড়িয়ে মুখে তোল
পান্তার পাশে নুন জুটলেই তোফা
প্রথম বৃষ্টিতেই কান বেয়ে কই
উঠবে।
বাদার জল পুকুরে নামার ঝোরায়
তক্কেতক্কে দাঁড়ানো
উলসে উঠবেই কই
তখন কাপ্‌টে ধরা
কাটা ?

আছে।
কায়দাও আছে
তা নইলে চলে না
পৃথিবীর সর্বত্রই তাই
ঠিকঠাক মতো ধরা চাইই
না হলে ফসকালে
তোমার তেমন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই
এতে ?
না থাক
পেছনের লোকটির চোখে
একটা-আধটা উদাহরণ পাততেই হবে
সাফল্যের, সংঘর্ষের, জয়ের
নাহলে তুমি আর মানুষ কেন ?
লজ্জাবতী লতা হলেও পারতে !

আবার সেই

আবার সেই
গলা তাক্ করে আঁশবঁটি এগিয়ে আসছে
যুদ্ধ একটা বাধবেই

তবে একতরফা।
এভাবে কেন ? এমনভাবে কেন ?

কেন এলোমেলো
অপমানের কাদা মেখে, কেন
কবিতাপাঠ ?
গলায় মালা, হাতে গোলাপকুঁড়ির আলোয়
ডুবতে-ডুবতে
বেঁচে থাকা ?

গুরুদেবের কথা ভাবো
তাঁর

না ছিলো কাবুলের ধার
না ছিলো হাজতের নরক

তাহলে ?

তাহলে আর কী !

ফাঁকি ফাঁকি সবটাই ফাঁকি
সবাই কী আর একভাবে হাঁটে

কথা বলে ?

সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা

যুদ্ধে যেতে হয়নি, তবু গায়ের ক্ষতচিহ্নে
লোকটা মধ্যযুগের যোদ্ধা—সঠিক মনে হবে
তরবারির খর আঘাত কোন্‌খানে পড়েনি ?
একটি চোখ রক্ত-টেড়শ, চলচ্ছক্তিহীনও

লোকটা যদি পাগল হতো, বাতিল করা যেতো
পাগলও নয়, ছাগলও নয়, অভিসন্ধিমূলক
সে দোষে দোষী নয়, বরং পরের উপকারী
স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনচেতা, মদ্যপায়ী, ভেতো ।

অসুখ এক উদাসীনতা, অথচ সামাজিক
লোকটা কিছু রহস্যময়, লোকটা কিছু কালো
নিজের ভালো করেনি, তাই, অন্যে ক'রে ভালো
সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা কিছুটা নির্ভীকই ।

শাক্য

তন্ময়তার মধ্যে একটি গোলা-পায়রার ছানা
মুখ থুবড়ে পড়লো কোলের উপর
ধরবো বলে দুহাত এবং চারহাত বাড়িয়ে দিলাম
বাতাস হাতড়ে ফিরলো দুহাত শূন্য কোলের উপর
বাঁচাতে পারলো না, শাক্য, গোলা-পায়রার ছানা
কপিলবাস্তু ছাড়লো না এই নতুন রাজার ছেলে
শাক্য হয়েই রইলো এবং গোলা-পায়রার ছানা
বেড়াল মুখে কামড়ে নিয়ে চললো অন্ধকারে...

যদি নেয়

সময় সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছি যৌবনে
এখন সায়াহ্ন, সন্ধ্যা, রাত ঠিক নয়।
কিন্তু, খুব যে বাকি আছে এমনও নিশ্চয়
নেই, তাই, যেতে হলে যাবো
দ্বিরুক্তি করবো না, কিছু যেতে হলে যাবো।
কবিসভাটিতে যারা নেবে বলে আসে
না নিয়ে কখনো যায়, এতোই সহজ!
নিলে, যাবো
দ্বিরুক্তি করবো না
যদি নেয়!

দেখে আসি

গোয়ালপাড়ার দিক থেকে আসছি ফিরে
একা একা
সন্ধ্যা হয়ে গেছে
বৃষ্টিতে আমিষ গন্ধ ছড়ায় খোয়াই

কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি
তীব্র হয়ে গেছে
জানি না সাপের মুখ ছিঁড়ে গেছে কিনা
বিষ খসে গেছে কিনা কুশ-কাশবনে
সোনাঝুরি ফুলহীন সোনাঝুরি বন
কানাল গর্জন করে উত্তরবাহিনী
ওদিকেই দামোদর

ঠিক কানালের ধারে শালের ভিতরে
কার কথা ? ফিরে যাও কেন ?
ডরে ?
গিয়ে লাভ হবে ?
সঙ্গে এসো । সুষমা দেখাবো ।
দেখে আসি,
চলো দেখে আসি ।।

কবি ও দেবতা-পীর

মন্দির দরগার মতো দুহাতে, দেহের অংশে বাঁধা
কুটোর ডগায় কতো টুকরো ইঁট, পাথরের ডুমো,
কে কী যে মানত করে, কে যেন মানত করে আছে !
চেয়ে গেছে মনে মনে, উচ্চারণে নয় ।

সোচ্চার প্রার্থনা ভুল ভণ্ডুল হবার ভাবনা করে,
মানুষ ঠেকেও শেখে না, তাই বোকার কষ্ট পায় !
দুহাতে ভরাতে গিয়ে বারবার ফাঁকা করে আসে ।
না, ফেলে-ছড়িয়ে নয় । চেয়ে চিন্তে, কিছুই না পেয়ে !

ওলাবিবি থানে দ্যাখো পটকুরি ভরে ঝুলে আছে—
কুটোর ডগায় ইঁট, কতোশতো, হাজারে হাজারে ;
ঝড়ে ও বাতাসে ছিঁড়ে, অনগ্রহণে পড়ে আছে—
দেবতা নিল না ব'লে কষ্ট ও কাটব্য কিছু নেই ।

অনুযোগ অভিযোগ মানুষ মানুষে শুধু করে।
দেবতা পাথর, জন্মউদাসীন, নির্বাচনপ্রিয়—
সকলের সব কথা শুনতে গেলে মর্যাদা থাকে না।
যেমন, কবিকে, মাঝেমধ্যে বড় নিষ্ঠুরতা টানে ?

ভালো থেকো

বহুযুগ বাদে এই বৃষ্টি ও মেঘের দিনে শান্তিনিকেতনে
আসা, ভালোবাসা দিয়ে পরিপূর্ণ উধাও খোয়াই
এখনো বুকের কোনো গভীর প্রত্যন্তে দেয় টান
রক্তপাত হওয়া ছিল অনেক সহজ।
তার বদলে
যন্ত্রণাকাতর হয় চক্ষুদুটি, মাকড়সার জাল
পাতায় পাতায় বাঁধে, দমকা বাতাসে ছিঁড়ে যেতে।
অভ্যাস এমনই, ভেবে কষ্ট পাওয়া, স্বচ্ছ সুখ নয়...
নিশ্চিত নিভৃত দুঃখে ভেসে যাওয়া, নিরুদ্দেশ ভাসা
গোয়ালপাড়ার দিকে...
মনে পড়ে এখনো উর্মিলা ?

মন কি এখনো আছে ছাই-মাজা বাসনের মতো গভীর উজ্জ্বল ?
পিতল-বাসনে, জানো, কলঙ্কের নীল
তেঁতুলের ছোঁয়া ছাড়া নিষ্ক্রান্ত হবে না।
সমস্ত পুরনো কথা, জানা কথা—পুনরুক্তি তবু,
মাঝেমাঝে করে ফেলি—যদি ভুলে যাও !
মনীষাও ভুল করে, আমরা দুষি একাকী নির্বোধে !

থাক কূটকচাল আর মনে-পড়াপড়ি !
পশ্চাদ্‌ভ্রমণে থাকে ঝুল-মাখা ঘরের বিলাস
এবারের এলোমেলো থেকে ভাবছি দেব উপহার
কিছু কথা, অভিজ্ঞতা, ভালোলাগা কানালের জল
ভালো হবে ?

কিছুদিন ধরে এই রাঢ়মাটি আমাকে ছাড়ছে না
বিকেলে গা ধুয়ে এসে তুলে দেয় স্পষ্ট নিমন্ত্রণ
জঙ্গলের নীলাঞ্জনা...
সে যে কি রক্তের যুদ্ধ ! তার উপর সূর্যের সিঁদুরে
ধুন্ধুমার কাণ্ড দেখে দম বন্ধ হয়ে যেতে থাকে ।
বিশ্বাসের অলিগলি উঠোন আঙিনা
দুহাতে দখল নেয় স্বপ্ন, অবিশ্বাস---
অমোঘ আমিষ গন্ধ ছড়ায় বাতাসে
কষ্ট হয় ।
কষ্টের প্রকৃত শিক্ষা এখনো হলো না !
বিনি নিমন্ত্রণে আসে, কালের ইঙ্গিতে চলে যায় ।

সে যাহোক, ভালো আছো ?
বিবাহের পরে কিছু মুটিয়েছো বরের সংসারে ?
বাতাসের হাতে ঝিলে জল রুলি ছিল এক ঢাল
কোঁকড়া চুল, তাকে রাঙা ক'রে
জঙ্গলমহাল রাঢ় করে তুলেছো কি ?
ইচ্ছে হয় দেখে আসি অন্তত একবার, একঝলক ।
তারপর মনে হয়, বৃষ্টি হবে, সব ধুয়ে যাবে
সর্বনাশা ছবি ভেঙে উঠে আসবে শান্ত পরিস্থিতি---
সোনার সংসার, সুখ, ঘরবর, সার্কাস, সিনেমা !
কিছুদিন ধরে এই রাঢ়মাটি আমাকে ছাড়ছে না ।

পুড়িয়ে পাখির মতো টুকরো টুকরো করে হবে বনভোজন ।
কোনোদিন মনে হয় ।
যা হয় তা হোক
কিন্তু, তুমি ভালো থেকো
তুমি ভালো থেকো ॥

ভালোবাসা পিঁড়ি পেতে রেখেছিলো

ভালোবাসা পিঁড়ি পেতে রেখেছিলো উঠানের কোণে।
ছায়া ছিলো, মায়া ছিলো, মুথা ঘাস ছিলো
ছাঁচতলায় আর ছিলো বৃষ্টি-ক্ষতগুলি...
ভালোবাসা পিঁড়ি পেতে রেখেছিলো উঠোনের কোণে
কিন্তু সে পিঁড়িতে এসে এখনো বসেনি
কেউ, ধীর পায়ে এসে, ত্রস্ত, একা একা

কেউ সে পিঁড়িতে এসে এখনো বসেনি
গভীর গভীরতর রাত হয়ে এলো

কেউ সে-পিঁড়িতে এসে এখনো বসেনি

গভীর গভীরতর রাত শেষ হলো

কেউ সে-পিঁড়িতে এসে এখনো বসেনি।

যদি পারো দুঃখ দাও

যদি পারো দুঃখ দাও, আমি দুঃখ পেতে ভালোবাসি
দাও দুঃখ, দঃখ দাও—আমি দুঃখ পেতে ভালোবাসি।
তুমি সুখ নিয়ে থাকো, সুখে থাকো, দরজা হাট-খোলা।

আকাশের নিচে, ঘরে, শিমুলের সোহাগে স্তম্ভিত
আমি পদপ্রান্ত থেকে সেই স্তম্ভ নিরীক্ষণ করি।
যেভাবে বৃক্ষের নিচে দাঁড়ায় পথিক, সেইভাবে

একা একা দেখি ওই সুন্দরের সংশ্লিষ্ট পতাকা।

ভালো হোক মন্দ হোক যায় মেঘ আকাশে ছড়িয়ে
আমাকে জড়িয়ে ধরে হাওয়া তার বন্ধনে বাহুর।
বুকে রাখে, মুখে রাখে—'না রাখিও সুখে প্রিয়সখি!

যদি পারো দুঃখ দাও, আমি দুঃখ পেতে ভালোবাসি
দাও দুঃখ, দুঃখ দাও—আমি দুঃখ পেতে ভালোবাসি
ভালোবাসি ফুলে কাঁটা, ভালোবাসি ভুলে মনস্তাপ—
ভালোবাসি শুধু কূলে বসে থাকা পাথরের মতো
নদীতে অনেক জল, ভালোবাসা, নম্র নীল জল—
ভয় করে ॥

নিশ্চিন্তপুরে সন্ধ্যা

প্রধান সড়ক থেকে বাঁধ পথ নদী অব্দি গেছে—
সোজা, আঁকাবাঁকা নয়, হাট থেকে পথও বেশি নয়,
অন্ধকার, বৃষ্টি নেই, মাখনের মতো কাদামাখা
পথ গেছে নদী অব্দি, নদী গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে।

এভাবেই যেতে হয় ছোট থেকে বড়-র ভিতরে

কলকাতায় সংকোচন উধাও মাঠে ও নদীজলে।
ছোটখাট কুঁড়েঘর মাঠের বিস্তৃত পরিপাশে
ছোট কিন্তু মর্যাদায় দীর্ঘ দীর্ঘতর হয়ে আছে,
তালখেজুরেরা ছায়া মাথা পেতে নিয়ে ভারি খুশি।

হলদি নদীর জলে সারিবদ্ধ মোষ নৌকা-জোড়া
নৌকারই দুপাশে পাশে ভেসে যায় দূরবর্তী চরে
ঘাস খেতে,
মানুষ খায় না ঘাস, মানুষ কী খায়!
নিজেও জানে না, আছে দুটি হাত পেতে :
ভাত দাও।

দশবছর আগে-পরে

দশ বছর আগে দেখা বল্লভপুরের ঘাট স্মৃতিতে জ্বলছিলো ।
তাই ধুন্ধুমার বৃষ্টি তুচ্ছ করে, ভিজতে-ভিজতে সেখানে পৌঁছুই :
কানালের বাঁধ ধরে সেখানে পৌঁছুনো কষ্টকর, তাই
পথ ধরে গেছি ।

সেবার রোদ্দুর ছিলো । ঠা ঠা রোদ, অসহ্য গরম
কুলকুলানো ঘামে ভিজে, ঐ হাঁড়িয়া-মচ্ছবে পৌঁছে গেছি ।
চাটায়ে শুকোচ্ছে ভাত, তিজেলে শুয়োর
রামকিংকরের গড়া মূর্তি বসে এখানে-সেখানে,
শিল্পশালা মনে করে গোটা একটি দিন আমরা সেখানে ছিলাম,
সন্ধ্যার মাদল বেজে উঠেছিলো দ্রিমিকি দ্রিমিকি
দুটি থেকে দুশো নৃত্যরত পায়ে এগোনো-পেছোনো...
কী যে ভালো লেগেছিলো বল্লভপুরের সেই অসহ্য গরম, গোটা দিন !

এবার সমস্ত গেছে, বদলে গেছে,
উঠোন উধাও আজ ছোটো
নানান দোকানে ফাঁদ পাতা গেছে, মাদল বাজেনি ।
রামকিংকরের মূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত, বস্তুত নকল

মানুষের মুখচোখ মাত্র দশবছরে বদলে গেছে !

ভাঙা গড়ার চেয়েও মূল্যবান

কে জানে কেমন করে ছন্দের বারান্দা ভাঙা হবে ?
মিস্তিরি মজুত, কাছে শাবল গাঁইতি সবই আছে ।
লোকবল আছে, আছে ভাঙনের নিশ্চিত নির্দেশ,
ভাঙার ক্ষমতা আছে, প্রয়োজনও আছে ।

বারান্দা জেনে গেছে ; সবাই ভাঙনে নয় দড় !
ভাঙারও নিজস্ব এক ছন্দ আছে, রীতি-প্রথা আছে,
এবড়োখেবড়োভাবে ভাঙলে, ভাঙার বিজ্ঞান থুতু দেবে

গায়ে আর লোকে বলবে, একেই তছনছ করা বলে।
অশিক্ষাও বলে কেউ, বলে, মূর্খ, ভাঙা শিখতে হয়—
অপরূপভাবে ভাঙা, গড়ার চেয়েও মূল্যবান
কখনো-সখনো!

যাওয়া ভালো

নিজের প্রাসাদ ছেড়ে কেন যে কুটিরে যেতে চাও
তা কি তুমি জানো?
সে কি শুধু অভিজ্ঞতা হবে ব'লে! দারিদ্র্যবিলাস!
না কি একদিন এই প্রাসাদ বাগিচা ছেড়ে নিশ্চিত দাঁড়াবে
গঙ্গাতীরে, এলোমেলো হাওয়ার ভিতরে।

দাঁড়াবে—কথার কথা, শুয়ে থাকতে হবে
বন্ধু ও শত্রুকে ছেড়ে শুয়ে থাকতে হবে
একা একা, কোনরূপ আসক্তিব্যতীত
হিরন্ময় আলো আসবে তোমাকে জানাতে
অভ্যর্থনা।
নিজেও জানো না
নিজের প্রাসাদ ছেড়ে কেন যে কুটিরে যেতে চাও!

যাওয়া ভালো, যেতে পারা ভালো!

পাহাড়িয়া কলকাতা

পাতালরেলের জন্যে কাটা মাটি পাহাড় গড়েছে।

ময়দানের রূপ বদলে হয়ে গেছে সাঁওতাল পরগণা!
পাহাড়চুড়োয় গাছ, কাশবন, নিচের ঝুপড়িতে
করম পরব হয় ফি-বছর, হাঁড়িয়া মজুব

প্রতিসন্ধ্যা লেগে থাকে, মাদলের আওয়াজে কলকাতা
রাত্তির দুপুর তক্ পাহাড়িয়া সুরে মজতে থাকে।

কাছের পারক স্ট্রিট মুগ্ধ, মুছে যায় মাদলে-বাদলে,
অশরীরী আলো দেখে মানুষ উত্ত্যক্ত হয়ে পড়ে।
অন্তর্ভ্রমণ সুখকর, শুধু প্রাত্যহিকতার
বেড়াজাল ছিঁড়েখুঁড়ে, কী নতুন, অসহ্য নতুন—
কলকাতা সবার জন্যে মর্ত্যে এই স্বর্গসুখ গড়ে!

দিগরিয়া, পাহাড়ি দরবেশ

নাপ্‌তে দোকানের মতো ছবি তোর পশ্চিমে টাঙানো
দিগরিয়া, আতিশয্য দিয়ে ঘেরা জানালা কপাট
নকাশি কাঁথার ফ্রেম, ফোঁড় তোলে ভাসমান বকে
ইচিরি কিচিরি করে আলো, আলেয়ার মতো দূরে!
স্বপ্নের আলিসা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছি তোমার মহিমা
অন্তর্গত করবো বলে, সারসের মতো ঠুকরে ঠোঁটে
তোমার রঙের চুমকি সল্‌মাকাজ, অঙ্গে নেবো ব'লে
দাঁড়িয়ে, রয়েছি, এই সত্তর-বয়স্ক বাড়িটার
ছাতে, একা—একা নয়, অনেকেই আছে...
দৃশ্যত, দৃশ্যের বাইরে আছে ভূত, ভুষো ও পাথর—
দিগরিয়া, সূর্য গেলে, তুমি হও পাহাড়ি দরবেশ!
একা একা।

এপিটাফ

কিছুকাল সুখ ভোগ করে হলো মানুষের মতো
মৃত্যু ওর, কবি ছিল, লোকটা কাঙালও ছিল খুব।
মারা গেলে মহোৎসব করেছিল প্রকাশকগণ,
কেননা, লোকটা গেছে, বাঁচা গেছে, বিরক্ত করবে না
সন্ধ্যেবেলা সেজে-গুজে এসে বলবে না, টাকা দাও

নতুবা ভাঙ-চুর হবে, ধ্বংস হবে মহাফেজখানা,
চটজলদি টাকা দাও, নয়তো আগুন দেবো ঘরে

অথচ আগুনে পুড়ে গেল লোকটা—কবি ও কাঙাল



কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে

সূচিপত্র

সমূহে একা রেখা

বর্ণনাতে বিশদ হলেও রহস্য কি ঘোচে ?
পদ্মপাতার উপরে জল, চোখের তল মোছে।
এভাবে তার চিবুক রাঙা, ভাঙা কলসখানি।
একদা ছিল সাদর কাঁখে, সেকথা আমি জানি।

আমার হাতে একদা ছিল কবুতরের স্তব।
অবয়বের বাহিরে ছিল অচেনা অবয়ব,
যামিনী রায়ের আঁকা নয়ান
বুকে আমার দিয়েছে টান
অনুভবের ভিতরে মাখা আরেক অনুভব।
আমার হাতে একদা ছিল কবুতরের স্তব।

ঠোঁটে আমার একদা ছিল জোঁকের পরমায়ু।
বনের আর মনের ম্যাঝে জটিল হলো বায়ু,
দুহাতে দুই করতাল
বাজের স্বরে বেজেছে কাল,
প্রীতশয়ান কেবল আজ শিথিল করে স্নায়ু।
ঠোঁটে আমার একদা ছিল জোঁকের পরমায়ু।

বরং রেখা, সমূহে একা, ফুটিয়ে তোলো তাকে।
বর্ণনার মতো বিশদ বেঁধো না সাতপাকে,
অন্ধকারে করো নিবিড়
একা থেকেও ঘোচে না ভিড়
ফুলমালার মতন বক আকাশে উড়ে থাকে
বরং রেখা, সমূহে একা, ফুটিয়ে তোলো তাকে।

ভালোবাসা তিনশতাব্দীর

দু'চোখে কলমির ফুল
যেন তুমি বৃষ্টির সে বনঘ্রাণ পেয়ে গেছো, সকালে, সুন্দর
বহুকাল বাদে যেন মাছস্পর্শ পাও

দাঁতের মাড়ির মধ্যে, নেবুগাছ গন্ধের মতন
তীব্র ছেলেখেলা আর মিথ্যে
মিথ্যে কথা !

বয়স হয়েছে, তবু বৃদ্ধ, তুমি নিজেকে হারাও !

অদ্ভুত দুঃখের গন্ধ তোমার শরীরে—
বৃদ্ধ, মনঃ ছিলো নাকি তোমার শরীরে !
বড়ো কষ্ট, বৃদ্ধ, আজ তোমার শরীরে

অতিস্বাভাবিকতার হাওয়া আজ ঠিকই আছে
বয়, যাকে মৃদুমন্দ সমীরণও বলে
লোকে, যারে মন্দ কয়, সে-মূর্খ আমি না
বলো বৃদ্ধ ? ভালোবাসা তিনশতাব্দীর
পুরাতন ।

সুখে থেকো, পিতরৌ !

ভিতরে বারান্দা ছিল, বয়েসে ভেঙেছে ।
খসেছে প্লাসটার, হাড় ইটের মতন
ভাঙছে, ভেঙে গেছে নোনা কামঠ-কামড়ে,
বিতিকিচ্ছিরি দাঁত বেরিয়ে পড়েছে,
সুগঠিত মাড়ি গলা-রবারের মতো
রয়েছে কেলিয়ে, জিব ফুটিফাটা, লোল !
মানুষটি সুন্দর ছিল, অন্ধেও কবে না
আজ, এতদিন পর !

ছিল মাল্যবান, সুখী, চন্দনচর্চিত
শুভবিবাহিত ছিল, প্রেমে ছিল আঠা !
আজ বৃষ্টিহীন বাদা পাখিতে ভরেছে,
বেশরম ঢোলকলমি বেড়ায় লটকানো,
রগের উদ্‌গত শিরা তরুলতা, আর

একটি কিশোর-স্পর্শ মেঝের পেরেকে..
সুখে থেকো, পিতরৌ !

প্রিয় রামকিঙ্করদাদাকে

কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে ?

এই হিংসা, এই পাপ মরকতমণির সংহার

কে রেখেছে ?—লুকিয়ে রেখেছে !
ভালোবাসা—অচ্ছোদসরসী !

স্নান গান রূপবান মেঘে

কার অন্ধকার থেকে কে যে চলে স্খলিত আবেগে
আগুপিছু

তার অন্ধকার থেকে সে তো চলে স্খলিত আবেগে
মৃত্তিকার !

কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে ?

রাখা তো উচিত ছিলো—তরবারি সঙ্কোচে মিনারে
রাখা তো উচিত ছিলো—তরবারি হৃদয়কিনারে
রাখা তো উচিত ছিলো।
কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে ?

এখানে উচিত এই তরবারি, যা কোনো হিংসার
অনগম্য, হিংসা থেকে সে গেলো পশ্চিম
সেগুনের কাছে, যার দয়া নেই, মায়া নেই, মনুষ্যত্ব নেই
সেই সেগুনের কাছে—
কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে ?

সেই তরবারি—তার মাথার উপরে ঘরবাড়ি

সে যদি নেভায় কিছু নিভে যায়, নিভে যেতে থাকে
পারম্পর্যহীন মেঘ জল দেয়, জলও না দেয়—
বেঁচে থাকে।
কিছুই দেয় না তাকে বেঁচে থাকে—বেঁচেও কী হয় ?
কাক বেঁচে থাকে—শুধু কাক বেঁচে থাকে !

কিছুদিন স্মরণীয়

কিছুদিন স্মরণীয় করে রাখা অবশ্যই চাই।
গতানুগতিক থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে ব'লে
বাহিরে বেড়াতে যাওয়া, অভ্যন্তরে, যখন যেমন
সুযোগ-সুবিধা আসে, মোটামুটি নিজেকে প্রস্তুত
করে রাখতে হবে, যাতে শুধুমাত্র অঙ্গুলিহেলনে
বিনাবাক্যব্যয় তুমি উঠে আসতে পারো
সুখশয্যা ছেড়ে, তুলে ঘরের নোঙর
জাহাজ ভাসাতে পারো যেদিকে দু' চোখ।
তা না হলে
পাথরের মতো থাকবে ঘাসের দখলে
স্থবির স্থগিত, আদিবাসিনী রীতির
মতন সংকোচভরা, আধমরা হয়ে
জঙ্গলে, ঝর্নার পাশে অবহেলাময়
এই পড়ে থাকা, সে কি মর্যাদা বাড়াবে ?
কিছুদিন স্মরণীয় করে রাখা অবশ্যই চাই।

বিরহে যদি দাঁড়িয়ে ওঠো

আসলে কেউ বড়ো হয় না, বড়োর মতো দেখায়।
নকলে আর আসলে তাকে বড়োর মতো দেখায়,
গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়াও, দেখবে কতো ছোটো,
সোনার তাল তাংড়ে ধরে পেয়েছো ধূলিমুঠো।

ভালবাসার দীঘিতে কতো করেছো অবগাহন,
পেয়েছো সুখ দুঃখ আর ছলে ভোলানো দাহ।
পুড়েছো বনে মালার মতো, যাওনি তবু ছেড়ে,
যতক্ষণ স্মৃতি-আড়াল নিয়েছে তাকে কেড়ে।
আসলে তুমি ক্ষুদ্র ছোট, ফুলের মতো বাগানে ফোটো—
বিরহে যদি দাঁড়িয়ে ওঠো, ভূতের মতো দেখায়!
গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়াও, দেখবে কতো ছোট।

চলো দেখে আসি

শব্দেরা নিজস্ব একটি শহর গড়েছে।
বর্ণমালা ঘরদুয়ার, কিছু কিছু নিয়ে বনভূমি—
বনভূমি ঠিক নয়, ইতস্তত, গাছপালা নিয়ে
মডেল-টাউন যেন, গড়েছে নিঃসঙ্গ তিলোত্তমা!

হিং টিং ছট্ নয়, বালি ও পাথর নয় শুধু,
অবচীন এ-শহরে ক্ষণজন্মা প্রাণ করে ধু ধু।
অমরত্ব চাই বলে অধিকাংশ শব্দ তোলে দাবি,
অঘোষিত শব্দ চোখ মুদে থাকে পাতার আড়ালে!

অক্ষর কোথাও দীঘি, খানাখন্দ, পাঁকের পুকুর।
নদী এ-শহরে নেই, পাহাড়-পর্বত আছে টিলা,
মাছরাঙা, শাদা বক বসে আছে জলের কিনারে,
হেলেঞ্চাবনের ফাঁকে উবুডুবু পানকৌড়ি, ডাক।

শব্দেরা নিজস্ব একটি শহর গড়েছে—
দেখে আসি।

আমি এই সংকল্প নিয়েছি

জ্বরের কম্বল থেকে খুঁটে খুঁটে তুলে ফেলি আঁশ,
যেন জ্বর বসন্তের গুটি
শুকনো-হয়ে-ওঠা চামকুটি !
বাতাসে ছড়াই কিছু মানুষকে আক্রান্ত করবো ব'লে ।

রোগে পঙ্গু করে ভুলবো—আমি এই সংকল্প নিয়েছি ।
শেষ করে দেবো এই বুকে হেঁটে বাঁচার লালসা,
ইঁদুরের মতো এই নিচু হয়ে বাঁচার লালসা !

লাটাই-ঘুড়ির যোগাযোগকারী সুতোও ছিঁড়েছি
জীবনে অসংখ্য বার, তারপর উড়ে গেছে ঘুড়ি ।
বটের শাখার শ্লেষ্মা জড়িয়ে ধরেছে মুখপুড়ি...

এককোণা ফাটা, দুই ঝাঁটা মারি ওড়ার লালচে,
কোনোমতে থাকা, শুধু টিকে থাকা অসহ্য আমার ।
শুধু নয়, দুদু চাই, মুরগমশল্লা এক হাঁড়ি—
সুখ ও সমগ্রভুক আমি । হব বামুনের রাঁড়ি !

মনে-বনে জানি না কিছুই

ভালোবাসা দিয়েছিল বিধিমতো ছাপানো কাপাস
এখন সে রং কেটে গেছে,
কেটেছেঁটে গেছে রাঙা সুতো,
অথিরবিজুরি মাকু পড়ে আছে শামুকের মতো
খোলে ।
কম্বলের কোণা থেকে অদ্ভুত আগুন আজ
বুক জুড়ে বসে আছে আরেক কম্বলে ..
অর্থ হয় ?
অন্তত দুজনে কেউ মনে-বনে জানি না কিছুই ।

সমুদ্রের কাছে এসে

সমুদ্রের কাছে এসে বসে আছো বিড়ালের মতো
থাবায় লুকোচ্ছো মুখ, মাছ যেন সন্দেহ করে না
সন্দেহ করে না জল, ঢেউ ফেনপুচ্ছ—লুকোচুরি
সে-কারণে সমুদ্রের কাছে আছো বিড়ালের মতো !
তুমি না মানুষ ! বেশ কিছুদিন সাঁতার শিখেছো—
সাঁতার শিখেছো জলে, জ্যোৎস্নায়, নৌকোর ভিতরে—
সাঁতার শিখেছো, কিন্তু বসে আছো সমুদ্রের তীরে
ভিতরে নামছো না, বুঝি, জল খুবই গভীর, গভীরে
ভিতরের ভয় তুমি বাহিরে বসেই জেনে গেছো—
জেনে গেছো সমুদ্রের তীরে বসে সমুদ্রের জল
কতো টানে, কোন্‌ভাবে টানে !
তুমি না মানুষ ! বেশ কিছুদিন সাঁতার শিখেছো !

সেই হাত

অভিনব দুটি হাতে দেয়াল দরোজা খুলে দাও ।
ততক্ষণে রোদ্দুর পৌঁচেছে
গোটারাত ঘুরে ঘুরে রোদ্দুর পৌঁচেছে
ঘরে ।
কিছুটা নড়বড়ে
ছিলো ঘর ।
এককোণে পাথর
তেমন সন্তুষ্ট নয়, 'দখল দখল' শব্দ করে ।
দাবি তার ঘরটি ভরাবে
মানুষের মাথায় চড়াবে
তার ভার ।
আর
যদি পারে
গিলে খাবে মানুষের স্বপ্ন নিয়ে বাঁচা
অন্ধকারে !

তা কি হয় ?
রোদ্দুরের ফুল ফোটে ঘরে
যে-হাতে দরোজা খোলো
সেই হাত শানাও পাথরে !

পুরনো প্রেমের অকাল-মৃত স্বামীর প্রতি

একান্ন দুর্দিন তুমি হিমঘুমে বেঁচে থাকবে ব'লে
বেঁচেছিলে, শেষরক্ষা হলো না ।
আমি পরাজিত মূর্তি সইতে পারবো না জেনে
চেষ্টাও করিনি
যেতে, পায়ে পায়ে, দীর্ঘ করিডোর' ভেঙে ।

গিয়ে কোনও লাভ নেই,
নতুন অসুখ দিয়ে কী কীর্তিজড়িত
হতাম ? প্রেমের ক্ষমা প্রেমই ক'রে,
তুমি করেছিলে ।

বলেছিলে, আমি বুঝি ।
যন্ত্রণার হিংস্র দাঁত একদিন নড়বড়ে
হবেই, পড়েও যাবে,
কর্মঠ থাকবে না ।
সুতরাং...

একটি চুম্বনে

অঙ্গুলিসংকেতে টেনে নিয়ে গেলে পঁচিশ বছর...
কপাটের অর্ধখান খুলে ভারি তামাশা সাজাতে,
সে-কিশোরী মুখচ্ছিরি আজ কতো মর্যাদামণ্ডিত !
প্রেমের সমীহটুকু পাপড়ি ও পাতার মতো খোলে ।

সেদিনেরই মতো দুটি চোখ হলে পর্যটনপ্রিয়
মনে হয় বেঁচে আছি, দীর্ঘ বৃষ্টি, নদীও রয়েছে।
সন্তপ্ত শরীরে তার আপ্যায়ন হলো অকুলান,

একটি চুম্বনে তুমি প্রাসাদের ভিত খুঁড়ে ফেলো।

রক্তের ভিতরে দোল দুর্গোচ্ছব

রক্তের ভিতরে দোল-দুর্গোচ্ছব কিছু কি মানায়!
যখন বয়েসে পোকা পরমাত্মীয়ের মতো কোষের কাপড়ে
হাত মোছে, এঁটো হাত!
যখন চোখে ও কানে ঠুলি,
রক্তের ভিতর দোল দুর্গোচ্ছব কিছু কি মানায়
তখন?

কিন্তু, দেখি মানিয়েছে, মানিয়ে গিয়েছে!
দুই সহোদর উরু দুটি মোমবাতির মতন
অবাধ জ্বলন্ত, যেন পরিচয় ছিলো!
গভীর তাৎপর্যে ওরা
একে অপরের
মুখে মুখ দিয়ে কথা কয়।
কী কথা কে জানে?

রক্তের ভিতরে দোল দুর্গোচ্ছব এখনো মানায়!

পাখি ছিলো দীর্ঘদিন একা

শীতের সংসারে পাখি এসে পড়েছিলো
উড়ে।
পথ জুড়ে ছিলো হিম কাঁটা
মেঘ বৃষ্টি ছিলো ধুন্ধুমার

পাখি উড়ে জুড়েছিলো পথ !

প্রতিহিংসা, মানেই প্রহার
একথা তাহারও ছিলো শেখা
লেখাপড়া ছিলো না জানত,
পাখি ছিলো দীর্ঘদিন একা..

ও ফুলে বাঁচলো না

ফুলের এ পরিশ্রম বেঁচে গেলো
বাঁচালো না ফুলও !
এমনকি তোমাকেও—
তোমাকে অরণ্য ব'লে জানি
তোমার ভিতরে আছে বাল্মীকির মহান মৃত্যুর
অভিনয়

অনুভব করি, তাকে জানি—
ফুলের এ-পরিণাম বেঁচে গেলো
ও ফুলে বাঁচলো না ।

রামকিঙ্করের মূর্তি পড়ে আছে

তোমায় যন্ত্রণা দিতে বড়ো বেশি লাগে—
হে তুমি, অবাক তুমি, মনোময় সংসার জগত
কে হে তুমি মনোময় ? তোমায় যন্ত্রণা দিতে লাগে
তোমার হাসিতে ফুল, ফুলে ও এক্ষুনি ঝরে যায়
আগুপিছু, ঝরে যায়, এবং সম্ভ্রম ঝরে থাকে
অহংকার ঝরে যায়—কোথাকার মাতৃমূর্তি ধরে !

কেন অহংকার করো ?—আমার সমস্ত চলে যায়
চলে যায়, কে তাকায় ফিরে ?
রামকিঙ্করের মূর্তি পড়ে আছে জগজ্জুড়িয়ে
আগুপিছু
তোমায় প্রণাম করি, আমার সম্ভ্রম থাকে নিচু ।

ভার করে

অগোছালো থাকা সুখে কী করে সম্ভব
এ-বয়সে !
দরজার পাপোশ থেকে বারান্দার শুরু—
ঘরেও পৌঁচেছে ।

মেঝের কারপেটতলে জমা ধুলো দুঃখের মতন
রয়ে গেছে ।
পরিচ্ছন্নতার কথা দু-এক শতাব্দী পরে মনে পড়ে যায় ।
তখন মিস্তিরি লাগে, ঝাড়পোঁচ চলে
দিনরাত !
ইতিহাস পরিশ্রুত হতে-হতে হয় না তখনো,
বিস্তৃত জঞ্জাল এসে ভার করে স্মৃতি ও সংশ্রব
মানুষের !

এখানে আসে না

পোড়োবাড়ি,
দেয়ালে পরচুলা, ঝুল, সোঁদা গন্ধ একনিষ্ঠভাবে
জানায়, সময় নেই । একদিন ছিল ।

রীতিমতো নাটো ভরে যেতো মঞ্চ, দর্শক-আসন ।
গান হতো প্রাণভরে, অভিনয় হতো ।

এখন সমস্ত চুকে-বুকে গেছে,
শেষ হয়ে গেছে !
মানুষের হাসিমুখ দেখার বিলাসে কেউ
এখানে আসে না ।

ঘুমন্ত কপাট

বন্ধ দরজার মুখ
ফিরে আসে শুধু হাহাকার---
খুলে দাও, অন্তত একবার,
রাতের মতন খোলো, সকালে খুলো না ;
খুলে দাও, অন্তত একবার ।

আমি ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত
উদ্‌ভ্রান্ত বৃষ্টিতে ভিজেছি,
পোশাক বদলাতে দাও
অন্তত একবার !

তারপর, দূরে চলো যাবো,
তোমায় বিরক্ত করতে কখনো আসবো না---

অন্তত কয়েকটি দিন
না হলে, কয়েকটি ঘণ্টা
সন্তানের দিকে চাইতে দাও,
কতোকাল ওদের দেখিনি ।
ওদের ঘুমন্ত মুখ দেখে ফিরে চলে যেতে দাও---
দয়াময়ি, দয়া করো ।
অনেক করেছো !

দয়াময়ি, দয়া তুমি অনেক করেছো !
বড়ো পথশ্রান্ত, ক্লান্ত দরজা খুলে দাও...

ঘুমন্ত কপাট, তবু, বন্ধ হয়ে আছো ?

মুখশ্রী, মন্দির

দু হাতের তালু মেলে ভুবন ধরার মতো
ধরে আছো মুখ।
তুমি কি মন্দির গড়ে তুলতে চাও এই নদীতীরে ?
পিছনে আশ্রম রেখে বনবাসীদের জন্যে গড়ে,

শাল ও সেগুন চারা পুঁতে তার সুষমা বাড়াও,
অপরিতৃপ্তির মেঘ যেন সেই আকাশে থাকে না
সেদিকেও চোখ রেখো,
ভালোবাসা দিয়ে তুমি মুড়ে রেখো মুখশ্রী মন্দির।

রক্ত পড়ে দুর্গাপ্রতিমায়

জননীর কাঠের ভিতরে
রক্ত পড়ে !
উল্লাসের আছে কিছু বেড়া।

হেমন্তের চেনাঘর আছে আধো টেরা।
অন্তরে বাহিরে
রক্ত পড়ে।
রক্ত পড়ে দুর্গাপ্রতিমায় !
এখন সহজে, সবই যায়—
রক্ত পড়ে দুর্গাপ্রতিমায় !

টেনেছে পাতালে

পাতায় রোদ্দুর পড়ে। শিকড়েও যায়
তা থেকে মাটিতে মিশে অনুর্বরতাকে
সময়ে উর্বর করে। পাতা ও মাটিতে

কী দারুণ যোগাযোগ ! কী গভীর টান
শিকড়ের ! অভ্যন্তরে, টেনেছে পাতালে
আকাশ বাতাস রোদ জ্যোৎস্নার অঞ্জলি
অপরূপ !

সমাধিতে শোবে ?

বাঁদিকে এখানে চর, ডানদিকে অবাধ জলধি
জলধির বাঁক থাকে, থাকে মনমতো উচ্চারণ
কমই থাকে মানুষ অবধি
বাঁক থাকে, ঝাঁক থাকে মানুষ অবধি ।

সেখানে মানুষ বুঝি উত্তরণময়
সবই কি সৌরাষ্ট্রে যাবে ? বমন করবে না ?
সবই কি দুঃখিত হবে, বমন করবে না ?
মানুষ কি একা, শুধু পর্যটনপ্রিয় ?
সমাধি দক্ষিণে, সে কি সমাধিতে শোবে ?
বাম ও দক্ষিণময়---সমাধিতে শোবে ?
কাঁচা ও কাঞ্চনময় সমাধিতে শোবে ?
সমাধি দক্ষিণ---সে কি সমাধিতে শোবে ?

বন্যাও দরকার

মাঝে মধ্যে বন্যাও দরকার ।
        কেননা মাটির খাদ্য চাই,
সবুজের পুষ্টি চাই, পলি চাই, বিবর্তন চাই---
মাঝে মধ্যে বন্যাও দরকার ।
    কিন্তু হাহাকার নয়, মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয় কোনো—
শুধু ধীরে ধীরে জল আবাদ ভাসাবে—এই চাই ।

পলির আদর ফেলে দিয়ে যাবে জমির উপরে,
দরজার কাছে এসে ফিরে যাবে জল,
দিয়ে যাবে, নিয়ে যাবে অপুষ্টি বাতিল—
দেবে ভবিষ্যৎ—ভরা খাদ্যের পসরা,
মাঝে মধ্যে বন্যাও দরকার।

সে-বাড়ি ছেড়ে

প্রতিষ্ঠান ভেঙে যায় বহুদিন সুসময় লেগে।
মাত্রাহীন ভালোবাসা দিন দিন প্লাস্টার খসায়—
দেয়ালের, নোনা ধরে অন্তরে-বাহিরে সর্বদিকে...
বসবাসযোগ্য ছিলো যে-প্রাসাদ, আজ তা বাতিলই।
বাদুড় চামচিকে থাকে, পায়রার বিষ্ঠায় ভরপুর
হয়ে ওঠে বাড়িঘর, মানুষ সে-বাড়ি ছেড়ে আসে
বারান্দায়।

শুধু খুশি নয়

বাগানের গাছপালা ছাড়িয়েই ঘাসের উত্থান।
কিছু কাশ মাথা নাড়ে বারণের মতো,
প্রকৃত কি বোঝা যায়, কী বক্তব্য তারও—
প্রকৃত কি চায়, তা তো জানাই গেল না!

মানুষের চেষ্টা বহু পরিশ্রম করে,
আয়াস-যতন করে, তবুও বুদ্ধির
অন্তরালে থেকে যায় কাশের ঘাসের
বক্তব্যের জটিলতা। শুধু খুশি নয়,
গোপন বিষাদ থাকে ওতপ্রোতভাবে।

জানলার কাঠামো ভেঙে পড়ে

জানলার কাঠামো ফাঁকা,
দূর থেকে দেখা যায় বাড়ি।
নিতান্ত আনাড়ি লোকটা
ওদিকে কী ভেবে চেয়ে থাকে!
কিছুই দেখার নেই,
কিছুই শোনার নেই আজ।
জানলার কাঠামো ফাঁকা,
দূর থেকে দেখা যায় বাড়ি।
কি ভাবে পূরণ হতে পারে?
চুপিসারে,
কে এসে দাঁড়াল...
জানলার কাঠামো ভেঙে পড়ে।

এ-সময়ে

বেগুনী জারুল ফুল, হলুদ শিরিষ পাশাপাশি...
দূর থেকে মনে হয়, এ-সময় কলকাতায় আসি।
কলকাতা রূপসী হয়ে ওঠে!
বাগানবিলাস ফুল, বাগান জ্বালিয়ে ততো ফোটে,
ফুটে ঝরে থাকে কিছু ঘাসের উপরে।
বাতাসের হাতে খেলা করে!
বেগুনী জারুল ফুল, হলুদ শিরিষ পাশাপাশি...
দূর থেকে মনে হয়, এ-সময় কলকাতায় আসি।

এখনো নিঃসঙ্গ কেন ?

এখনো নিঃসঙ্গ কেন ভিড়ের মাঝখানে ?
ভিড় তো তোমাকে চায়, অরণ্যও চায়।
সেখানে কি একটি গাছ একা থাকে, অবসন্ন থাকে ?
বোঝো এ-থাকার মানে ভিড়ের ভিতরে ?
বোঝো কিছু—এরই নাম অসুস্থতা, হলুদ অসুখ,
এর থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে ভিড়ে যেতে হবে,
গিয়ে থাকতে হবে মিলেমিশে সেই ভিড়েরই মতন—
যাবে নাকি ?
এখনো নিঃসঙ্গ থাকবে ভিড়ের মাঝখানে !
ভিড় তো তোমাকে চায়, অরণ্যও চায়—
যাবে নাকি ?

কবি ছিলেন

কবি ছিলেন পুজোর থালায় কবি ছিলেন গলার মালায়
কবি ছিলেন ছুঁয়ে
একটি বৃক্ষ গুল্মলতা, জল যেন এক পদ্মপাতায়
নেভেন একটি ফুঁয়ে।
দমকা হাওয়ায় এমনটি হয়, এই পরাজয় যাবার তো নয়—
পাতা পড়ছে ভুঁয়ে,
কবি ছিলেন পুজোর থালায়, কবি ছিলেন গলার মালায়
কবি ছিলেন ছুঁয়ে
ভালোবাসার কলমিলতা, টগবগিয়ে কচ্ছে কথা
কু-গদ্যে, একগুঁয়ে।

এখন

সেই শিশু দু'হাতে ধরেছে !
খেলাচঞ্চল, মেঘের অঙ্কুশ

বহুকাল পরে দেখা
মনে নেই, তীব্র মনে নেই।
বহুকাল পরে দেখা
সেই শিশু দু'হাতে ধরেছে !

এখন কলসে জল পড়ে
এখন বাতাসে পাতা নড়ে
এখন কলসে জল পড়ে।

মাল্যবান চাঁদ তুমি

অতি ব্যক্তিগত কথা চালাচালি করেছি ব'লেই
কিছুতে অস্পষ্ট নই তার কাছে, চাঁদের দ্যোতক,
মাল্যবান চাঁদ তুমি ঝর্নাজলে লুকোচুরি খেলো—
লুকোও ঘাসের নিচে, জলাঝোপে, গুল্মের ভিতরে,
আমি ঠিক খুঁজে নেবো, অন্যথা হবে না।
আমি ঠিক খুঁজে নেবো, কিছুতেই অন্যথা হবে না।
মাল্যবান চাঁদ, তুমি ঝর্নাজলে লুকোচুরি খেলো।

মানুষ কী আর !

দুটো বাঁশের কাঠখোদাই-এর চোখ আমাকে
লাগায় ধাঁধা,
আমি কি আর এমনি বাঁধা
এমনি বাঁধা ?

সে-বাঁধায় কী জটিলতা, জটিলতা
দুই কাঠুরের কুঠার পড়ে
একটি গাছে,
মানুষ কী আর তেমন আছে
তেম্‌নি আছে ?

কখন, কীভাবে

কিছুদিন ভুলে থাকা ভালো :
ছোট্ট পাখিটির মতো কলংকের কালো
কপালে পড়েছে ।
বাড়ির সুমুখে খানা রাতেই খুঁড়েছে
কেন ?
যেন দেখতে চায়
কীভাবে তোমারও বুকে গর্ত খোঁড়া হবে ।
কেটে ছেঁটে ফেলা হবে বাড়তি ডালাপালা
কখন, কীভাবে
তোমার কলংকমাখা দিনগুলি যাবে
নদীর আলোয় ভাসতে-ভাসতে
কিছুদিন
কিছুদিন ভুলে থাকা ভালো ।

বইমেলায়, একা

জঙ্গলে গাছের ফাঁকে অসতর্ক চাঁদ
ত্রস্তপায়ে গিয়ে সেই শিখরবাসিনী
চাঁদের চোখের নিচে একবার দাঁড়াই—

চেনো চাঁদ ? কখনো দেখেছো ?

একভিড় সবুজ ভেঙে সাহসী সাঁতারে
তোমার সমীপবর্তী, শুধু অকারণে।
হয়তো তাকাবে, তাই, সসম্ভ্রম আসা।
ভালোবাসা ? তাও আছে, পুরাতন প্রেম
কূলের সংস্পর্শ মেখে তমসা নদীর
মতন বহন করে নীল জলবায়ু।
ক্ষতি নেই, সুখে থেকো, সুখে থাকা যায়
অনায়াসে। আমি সুখে আছি।

পাল্লারোড বাংলো থেকে

সামনে দামোদর, বাঁধ, নিচে পাল্লারোড
বাংলো, নির্জনতা তাকে দুহাতে ধরেছে,
প্রতিষ্ঠা করেছে যেন মুখ করতলে।
মুখ না মুখশ্রী, দেখতে এসো একদিন.
তিনগাড়ি ভর্তি কিছু পিকনিক-পিপাসু
মানুষ নেমেছে গিয়ে বাঁধের উপর
একদিন।
শহরের ধুলো ও জঞ্জাল
মুছে ফেলতে গিয়েছিলো বাংলোর সন্ধ্যায়।
বালির ভিতরে কিছু এলোমেলো জল,
চর ছিঁড়ে খুঁড়ে সেই এলোমেলো জল
পিপাসা মেটালো, কিন্তু জাগালো আরেক
অগ্নিবর্ণ মেঘরূপ শান্ত ভালোবাসা।
শুধু মুখোমুখি বসে থাকলো সারারাত,
দুটি হাত দুই হাতে খঞ্জনী বাজালো,
চোখ সরালো না কেউ, অন্য মুখ হতে—
এভাবেই ভোর হলো, পাল্লারোডে ভোর।

অন্নদা মুনসি শ্রীচরণেষু

বাঁ হাতে কর্ণিক আর ডান হাতে ছিল তুলি-কালি !
প্রাসাদ গড়েছো পাশে, রঙে রঙে বিপ্লব ঘটিয়ে
ওপারে বর্ণিকাভঙ্গে বহুরঙ্গে এঁকেছো প্রতিমা—
যার নাম ভালবাসা, নাম যার স্বজনবিদ্রোহ ।

করস্পর্শে কোন্ ঘরে মূর্ছিত সঙ্গীত ?
ডুবসাঁতারের ঘোর রেখায় লেখায়—
তোমাতে না পেলে, আর্য, আর কোথা পাবো ?
সুখে-দুঃখে দীর্ঘজীবী, থেকো ভালোবেসে
উন্মাদ দিবসরাত্রি সন্তরণময় ।

মনে রেখো, ভালোবাসা বাঁচায় ও মারে

তপসিয়া আকাশের নীল শাদা পরিপ্রেক্ষিতের একাংশ দখল ক'রে
গোদাচিল, অসংখ্য অজস্র চিল ছাই মেখে ঘুরে ঘুরে ওড়ে ।
হয়তো ধাপার কোনও নালার ভিতরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে হরিণ-
রঙের গাই, টের পাই গোদার ওড়ায় ।
ঘয়লার স্যাঙাতি নিয়ে কাৎ হয়ে উদাসীনতায়
যেন ভেসে আছে জলে, চুলখোলা পরীর সাঁতারে—
অসংখ্য অজস্র গোদা, গোদাচিল তপ্সের আকাশে ।

নিমডালে কাক-কাকী চূড়ান্ত চিল্লায়
মেঘ করে আসে ।
যে-মেঘে বৃষ্টির ছুতো নামমাত্র,
সেই মেঘ কলকাতার স্কাইলাইটের পাশে শ্মশানের ফুল ।
আশ্বিন এখন,
হাঁসের পায়ের মতো শেফালি ফুলের দেখা নেই ।
শুধু ভোরবেলা
ট্রামের চলনশব্দে শবতের জামাকাপড়ের
আশ্চর্য নতুন এক আক্রমণকারী চাপা বাস
নাকে লাগে ।

জান্‌লায় কিশোরী মুখ তালকানা সংস্পর্শকাতর...
সবটাই হঠাৎ,
শরতের ভাবই এই—
অকারণে থতোমতো-খাওয়া।

রাজমহলের দিকে যাবো ভাবি তিন পাহাড় ছুঁয়ে
দু-চার দিনের জন্যে।
ছুটি কম, কাজ থৈ থৈ
দিনগুলি পাথরের মতো পথ জুড়ে।

প্রকৃত কি কোথা যাবো?
না কি শুয়ে-বসে থেকে মনসা মথুরা!
যাবার কথায় কেন বুকে লাগে টান
আমন্ত্রণময় হয়ে ওঠে দ্বিগ্বিদিক।
যে কোনো দিকেই যেন ভেসে যাওয়া চলে
যাবার সন্ন্যাসে।

ঢাকে কাঠি পড়ে।
কাঁসর ক্রন্দন করে ওঠে,
গোঠে চাঁদোয়ার নিচে দেবদারু পাতা
বাঁশের বল্লায় বাঁধা,
রঙিন শিক্‌লিতে করে ঝলমল ঝলমল
পুজোর মণ্ডপ।

পুজো-আচ্চা নিয়ে এই জীবনের আনন্দের ক্ষণ
মাঝেমধ্যে আসে।
বাকি একটানা দিন, রং-এ বর্ণে মাটো।
ছোটোখাটো সুখদুঃখ, ছোটোখাটো হিসাব-নিকাশ
দিয়ে গড়া।
জীবনে ঘুলঘুলি বেশি,
সিং-দরজা সড়কের কথা
বচ্ছরান্তে একবার—
স্বাভাবিক গেলে!

ফিরে এলে
তোমাকে বসাবো প্রেম রাজসিংহাসনে।
এই স্তোকবাক্যে প্রেম ফেরে নাকি ?
ফেরার তাড়সে
দূর থেকে দূরে চলে যায়।
স্মৃতির ব্যথায়
নীল হতে-হতে শূন্য দূরে চলে যায়।
এটাই নিয়ম।
সবজির সবুজ নিয়ে প্রেম চলে যায়
খড় হতে, স্তব্ধ হতে,
অপ্রাসঙ্গিক হাতে তুলে দিতে বিচ্ছেদ, বিচ্যুতি।
যে কোনো মৃত্যুর মধ্যে বেঁচে থাকা আছে
স্মরণীয় নও ব'লে মৃত্যুর চালুনি দিয়ে গলে যাবে কাঁকরের মতো
একথা দিও না ঠাঁই মনে
মনে রেখো, ভালোবাসা বাঁচায় ও মারে
একাধারে
বাঁচায় ও মারে।

অবসর এখানে মাঠ
অবসর এখানে গাছপালা

পাহাড়ের চূড়া কেটে বাংলোবাড়ি, চারিদিকে খাদ
সবুজ চাদরগুলি পেতে রাখা আছে,
বালিহাঁস উড়ে যায় মাথার উপরে
ভোরবেলা—
দেখে মনে হয় তার শস্যক্ষেত্র কাছে।
কাকচক্ষু জল কোনো পাহাড়সানুর
মেঘের ছায়ায় হয়ে রহস্যলাঞ্ছিত
প'ড়ে আছে একা একা জঙ্গলে গভীর
মমতার মতো।
অন্যমনস্কতা ছিলো সর্বত্র ছড়িয়ে
সহসা দামাল হয়ে ফুঁসে উঠলো হাওয়া
কী দাপটে বৃষ্টি এসে সন্ন্যাসে ভাসালো

চতুর্দিক, কী অসহ্য রূপে ছারখার
করে তুললো বনভূমি, উপড়ে দিল গাছ
অন্তরের, বাহিরের, যেখানে যা পেলো !
চোখ পুড়ে গেলো বজ্রপাতে ও চিকুরে
ফালা ফালা করে তুললো আকাশ, জঙ্গল
এ যে কী সৌন্দর্য দেখে কিছুক্ষণ ধরে
মনে হলো, বেঁচে থাকা মহামূল্যবান ।

মেঘ হৃদয়ের কাছে ঢাকা পড়ে আছে ।
এখন লেগেছে তাতে হানাদার হাওয়া,
বুকের ভিতরে অন্য অরণ্য তোলপাড়,
দুই চক্ষু বেয়ে পড়ে কুলুকুলু জল
আমোদের ।
বৃষ্টিতে পাতার ধুলো মুছে কী সহজ
সবুজ সুঘ্রাণ ওঠে উপত্যকা জুড়ে
সিংভূমের—
বড় স্বেদ রক্তপাতে গড়া এ-ভুবন !
বদগাঁও বাংলোর টালি ফেটে জল পড়ে
জল পড়ে ঘরের ভিতরে ;
পড়ে জল উদ্‌ভ্রান্ত জল
ঘরের অন্তরে খেলা করে—
দেয়ালে, চিবুকে দাগ, দাগ কোণে-কোণে
এখন উৎক্ষিপ্ত আমি, কাল মনে-মনে
ছিলুম শামুক হয়ে ঝোরার এক পাশে
দ্বিধা দ্বন্দ্ব কেটে গেছে, পোড়ার উল্লাসে
পুড়ি অহরহ আজ, বৃষ্টিতেই পুড়ি ।
সজল অগ্নির ধারা পোড়ায় আমাকে
একটি চুম্বন দাও, হৃদয় জুড়াবো ।
প্রকৃত চুম্বনে দাহ আরো বেড়ে যাবে
পুড়ে যাবে অধরোষ্ঠ, দুকূল ভাসাবে
লেলিহ আগুনে বানে, এ কী অভিলাষ ?
তার চেয়ে থাকি আমি প্রকৃতির মতো
ওতপ্রোত, আমায় ছুঁয়ো না ।
সবুজের মতো থাকি, আমায় ছুঁয়ো না ।
আমি তো নিজের জ্বালা নিয়ে জ্বলি সবুজ আগুনে
জ্বলতে দাও ।

তুমি কোনও অন্যথা করো না,
অন্যথায় কষ্ট পাবে
পুড়ে হবে ছাই।

বন্দগাঁও-এর বাংলো ছেড়ে চলেছি উত্তরে
চড়াই-উৎরাইপার চলেছি উত্তরে—
বুনোগন্ধে জ্বলে নাক, দু বাহু বাড়ায়
দুটি দিক থেকে সোঁদা সেগুনমঞ্জরী।
গভীর গভীরতর মর্মতলে ডাকে
শিশু শাল পিয়ালের নিচু কণ্ঠস্বর।
বনমুরগি উড়ে যায় বনেট পেরিয়ে
রামধনুহাতে সেই বীরসা ভগবান
পাহাড়চূড়ায়...
মাদলে কাঠির ঘায়ে বিপদসঙ্কেত
ছড়ায় মহল্লা থেকে সর্বত্র জঙ্গলে।

জীবনে বিপদ আসে শ্বাপদের মতো
গুঁড়ি মেরে
সভ্য মানুষের মতো শান্ত গুঁড়ি মেরে—
এ-বিপদ থেকে স্থির পরিত্রাণ চাই
যে কোনও উপায়ে।

দূর পালামৌ পানে পথ চলে গেছে,
আমরা যাবো ডানদিক, গহন জঙ্গলে।
ম্যাক্‌লাসকির বুড়ো দাঁত দূরাগত টিলা,
ওটি পার হলে পাবো প্রয়াত শহর
ম্যাক্‌লাসকিগনজের।
ভুতুড়ে বাড়ির মধ্যে শতাব্দীর শীত
ইউক্যালিপটাস-শাদা কিছু শান্ত
দুপুরে ও রাতে
বুড়ি মেম পথে-পথে কুশল শুধায়—
একাকী থাকার চাপ অসহ্য হলেই
সরু বনপথে ঘোরে, দোক্‌লা কোথা পাবে ?
ছোট্ট ইঙ্গ-ভারতীয় জনপদ, প্রেমে তৈরি করা
প্রয়োজনে ততো নয়, লনডন-আভাস
পেতে ও অন্যকে দিতে গড়া হয়েছিলো

একদিন।

আজ ছেড়ে-যাওয়া বাড়ি ধূসর হয়েছে—
জানলা দরজা কিছু নেই, হাওয়া করে হু হু
কে যেন কাউকে খোঁজে, দিনরাত খোঁজে!
না পেয়ে ক্রন্দন করে বারান্দায়, ঘরে
আগাছায় ভরে গেছে ফুলের বাগান,
শখ শৌখিনতা ভাঙা ইট হয়ে আছে...
খুবই স্বাভাবিক।

এ-উপজীবনে আমরা দুদিন থাকার
পরিকল্পনা নিয়ে এসে গেছি।
এ-সমাধিক্ষেত্রে আমরা দুদিন থাকার
পরিকল্পনা নিয়ে এসে গেছি।
শহরের হৈ হট্ট ছেড়ে আমরা দুদিন থাকার
পরিকল্পনা নিয়ে এসে গেছি।
মুখের বিদ্রূপ নয়, শুধু রূপ গ্রাস করবো বলে
আমরা এখানে এসেছি
ভালোবাসা অবসর নিয়ে দুটি দিন গড়ে নেবো বলে
এখানে এসেছি
ঘাসের ভিতরে শুয়ে থাকবো বলে
এখানে এসেছি
প্রকাণ্ড আকাশ শুয়ে দেখবো বলে
এখানে এসেছি
পাঁচজন পৃথক লোক একা হয়ে যাবো বলে
এখানে এসেছি
নকল পোশাক ছেড়ে নগ্ন হয়ে যাবো বলে
এখানে এসেছি
এখানে কারুকে কোনো কাজের ফিকিরে ঘুরতে নেই বলে
এখানে এসেছি
এখানে স্বতন্ত্র কোনও দিনের ভূমিকা নেই সব একাকার
অবসর এখানে মাঠ, অবসর এখানে গাছপালা
অবসর মানে স্নান সেরে ফেরা আরেক জীবনে
ভালোবাসা নিয়ে ফেরা আরেক জীবনে
মৃত্যুর বিরুদ্ধে জোর নিয়ে ফেরা আরেক জীবনে
খুবই প্রয়োজন ছিলো, মাঝেমধ্যে প্রয়োজন হয়।



কক্সবাজারে সন্ধ্যা

সূচিপত্র

কক্সবাজারে সন্ধ্যা

চাকমার পাহাড়ি বস্তি, বুদ্ধমন্দিরের চূড়া ছুঁয়ে
ডাকহরকরা চাঁদ মেঘের পল্লীর ঘরে ঘরে
শুভেচ্ছা জানাতে যায়, কেঁদে ফেরে ঘন্টার রোদন
চারদিকে। বাঁশের ঘরে ফালা ফালা দোচোয়ানি চাঁদ—
পূর্ণিমার বৌদ্ধ চাঁদ, চাকমার মুখশ্রীমাখা চাঁদ!

নতুন নির্মিত বাড়ি সমুদ্রের জলে ঝুঁকে আছে।
প্রতিষ্ঠাবেষ্টিত ঝাউ, কাজুবাদামের গাছ, বালু
গোটাদিন তেতেপুড়ে, শীতলে নিক্রান্ত হবে ব'লে
বাতাসের ভিক্ষাপ্রার্থী! জল সরে গেছে বহুদূর।
নীলাভ মসলিন নিয়ে বহুদূরে বঙ্গোপসাগর
আজ, এই সন্ধ্যাবেলা।

ব্ল্যাকডগ মধ্যিখানে নিয়ে দুই কবির কৈশোর
দুটি রাঙা পদছাপ মেলানোর তদবিরে ব্যাকুল—
ব্যর্থ আলোচনা করে, গানের সুড়ঙ্গে ঢুকে প'ড়ে,
স্বর্ণাক্ষর বর্ণমালা নিয়ে লোফালুফি করে তীরে!
রূপচাঁদা পড়ে জালে, খোলামকুচির মতো খেদ
রঙিন কাঁকড়ার স্তূপ সংঘ ভেঙে ছড়ায় মাদুরে
একা একা। উপকূলে।

বুদ্ধপূর্ণিমার চাঁদ কক্সবাজারের কনে-দেখা-
আলোয় বিভ্রান্ত আজ। অধিকন্তু, ভরসন্ধ্যেবেলা!

স্বপ্নের ভিতরে একই মুখ

স্বপ্নের ভিতরে কেন একই মুখ নড়াচড়া করে ?

তবে কি আমার কাঠে শাদাপিঁপড়ে করেছে জটলা—
ঘুণপোকা গুণছুঁচ দাঁতে ফুঁড়ে ক্ষত ও বিক্ষত
মেধা, দেহকোষ আর ঝাঁঝরা করে বুকের কপাট
হাট বসে গেছে এই কাঠের চালুনি দেখতে, মেয়ে !

স্বপ্নের ভিতরে আজই একমুখ নড়াচড়া করে—
কেন ? তা কি জানা যায় ? অন্তত একাংশ জানা গেলে
পরবর্তী তৈরি করে নেওয়া যেতো বিশ্লেষণ দিয়ে—
ছোবল কোথায় শুরু, বিষস্রোত ধমনী-ধারায়,
কী খাতে বহতা আর কোন্ অংশে সমুদ্রের গতি !
এইসব দেখেশুনে স্বপ্নের ভিতরে মুখগুলি,
পুরাতন মুখগুলি একই বৃত্তে ঘোরাফেরা করে ।
মন-মন কাজে ঝাঁঝরা করে দেয় মানুষের কাঠ—
করিৎকর্মার দল, জানে না হৃদয় কোথা আছে
লুকোনো, গুদামঘরে চাবি ও কুলুপ ছাড়া একা,
শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হৃদয় এখনো বেঁচে আছে !

অদরকার প্রত্যেকে জানানো...
স্বপ্নের ভিতরে সেই মুখ আজো ঘোরাফেরা করে ।
গুদামের সামনে এলে কিছুতেই ফেরানো যেতো না
তাকে, ভাগো, আসেনি সে । না, আমার শান্ত বিবেচনা

এখন গুহায়

বিক্ষুব্ধ কাগুজে বাঘ এখন গুহায় !
গুটিসুটি কেন্নো হয়ে শুয়েছে একপাশে,
গুহামুখে বাঁশপাতা রোদ্দুরের ফালি,

তাছাড়া সমস্ত কালো কালি দিয়ে মোড়া।

একজোড়া চিতলে গাঁথা সন্তানের চোখ !
আদর, সম্ভ্রম, ভয়—তিন বাটনা মিশিয়ে
গুহার সুমুখে আসে, ডাকলে সরে যায়
তৎক্ষণাৎ।

কল্পশেকলের কাঠি খোলে,
খবরকাগজে তার পদচ্ছাপ রীতিমতো দোলে,
ভয় পায় তৎপরতা দেখে।
সবুজ কাঁথার মধ্যে হলুদ গুনছুঁচ
কী ভাবে ফোঁড়ের পর ফোঁড় তুলে গেছে,
একদিন।

ইচ্ছে, নিমজোড়ে রাখা কলসের ফাঁদে
শালিক বাঁধুক বাসা।
তুলো লোম দেবো,
বুড়ো ঘাস, খড়কুটো পর্যাপ্ত রয়েছে।
যতটুকু পারে নিক, লুটেপুটে নিক—
শিশুদের জন্ম দিতে সবাই পারে না।
পারে না বাড়াতে তাকে মানুষের মতো,
প্রশ্নাতীত।

আশ্চর্য নতুনভাবে দেখা হয়েছিলো

কবরখানার থেকে হিমঘুম ঝাপটেছে সড়ক।
এখন দুপুর, রোদ-জ্বালা ধুন্ধুমার কাণ্ড করে
পিছলে যায় ট্যাক্সি-গাড়ি, চোখ মুদেছিনু কেন ভুলে ?
খুলে হাহাকার, ওকে বাম থেকে ডানে যেতে দেখি,
হঠাৎ সুমুখ দিয়ে পার হয়ে ওপারে সারস
চোখ তুলে, তন্মুহূর্তে দৃষ্টি রাখে পথের উপর

সন্তর্পণ, গ্রাহ্যাগ্রাহ্য মনে করে গাড়ির ভিতরে,
কিশোর সিঁড়ির দিকে ধেয়ে যাই নেবুবাগানের
গলিতে, গালের 'পরে গন্ধ পাই দুধের সরের
দু আঙুলে যবে তোলো রাতের আলস্য, নাকি ঘোর
ঘুমের, স্বপ্নের মোম ! ভুলে ফেলো অবিমৃষ্যকারী
হাওয়া, যা তোমাকে ছোঁয়, সেবার সকালে ছুঁয়েছিলো ।
তারপর দীর্ঘদিন গেছে ।
বালুর উপরে এসে দাগ রেখে জলের বছর
এখানে-ওখানে গেছে । মধ্যবর্তী দূরত্ব বেড়েছে ।
ক্ষতি নেই । দেখা হয়েছিলো ।
আশ্চর্য নতুনভাবে দেখা হয়েছিলো বারবার,
মনে আছে ।

সংকীর্ণতা

সংকীর্ণতা, এমন কি আকাশেরও আছে ।
পাহাড়ের চূড়ে সেই সংকীর্ণতা গাছ,
সংকীর্ণ শিকড় আর কিছু ডালপালা
স্থূলতার পরিপ্রেক্ষা, আনাচে-কানাচে,
এমনও কি সংকীর্ণতা আকাশের আছে !

সংকীর্ণ মানেই ছোটো, অনাবা, শিথিল ।
উচাটন নয়, শুধু সংকোচনে ভরা ,
সংকীর্ণ বাহির নয়, একা ঘর করা,
সংকীর্ণের সঙ্গে আছে প্রণয়েরই মিল !
সংকীর্ণ মানেই ছোটো, অনাবা, শিথিল ।

ঘরে ফেরা

সমুদ্রের তীরে গোটা রাত ধরে চাটাই পেতেছে
কেউ, গোটা রাত ধরে চাটাই পেতেছে।
জলে-নুনে ভিজে গেছে, বরবাদ হয়েছে
চাটাই, পাড়ের থেকে নেমে গেছে জলে।
হারিয়ে গিয়েছে আর ঢেউ-এ গেছে ছিঁড়ে!
মাটি-বালি মেশা সেই চাটায়ে পা ফেলে—
কিছু শিশু হেঁটে গেছে সমুদ্রের দিকে
অবলীলাক্রমে স্নান-সাঁতার সেরেছে,
তারপরে উঠে-হেঁটে ফিরে গেছে ঘরে,
কানের গহ্বরে নীল দাগ নিয়ে, জমা নুন নিয়ে
ঘরে ফিরে গেছে।

এভাবেই সমুদ্রকে ফেলে রেখে যায়
স্থল থেকে যারা আসে, এমনও কি শিশু!

গলিতে গজনভী নেই

মাথার চুবড়িতে মেঘ, ঝুরো-ঝুরো মাটির মতন—
অলিগলি পার হয়ে বন্ধ একটি দরজার সুমুখে
দাঁড়াল হঠাৎ এসে, ভোরবেলা, সকলে ঘুমায়।
সন্ত্রস্ত আঙুলে চেপে ধরে ঘণ্টা ঘুমভাঙানিয়া
বাজিয়ে, দু-এক ধাপ নেমে আসে সংক্রান্ত সিঁড়ির
আধো আলো অন্ধকারে।
'গজনভী এখানে থাকে ?'
নিরুত্তর মুখ, মাথা নাড়ে।
অথচ ঠিকানা এক, বিবরণও হুবহু মেলে।
তবুও, গজনভী নেই। সত্যবান দরোজা জানালে,
এক চুবড়ি মেঘ নিয়ে নেমে যায় চকিতে মানুষ,
গলিতে গজনভী নেই, অন্যান্য গলিতে খুঁজতে হবে!

চতুর্দশী

এখন, শোকের দিনে, কোনোদিনও নির্বোধ করে না
বিবাদ। মানুষ, তুমি ভুলে যাও, অত্যাগসহন,
ছেড়ে দাও ওর কটুকাটব্য কবিতা লক্ষ্য ক'রে...
ও ছিলো পাথরে-জলে ম্রিয়মাণ দেবতার মতো

ক্ষমা করে দাও ওকে, শাস্তি দাও, কেননা এখনই
চলে যাবে, মুক্তি দাও, ওর ঘনবন্ধন চারদিকে.
তুমি তো পাথর জল কিছু নও, ও যজ্ঞডুমুর
তুমি তো পাথর জল কিছু নও, ও যজ্ঞডুমুর

সুতো ধরে এসেছিলো ভুলভুলায়, সুতো ধরে গেছে।
ভিতরে জীবন ছিলো, পুষেছিলো পাখি ও প্রতন
একদিন, মানুষের মতো, শুধু চিতা ব'লে গেছে
ওই একটি শব্দ ছিলো অহরহ, অত্যাগসহন,
চতুর্দশী চাঁদ, তুমি, কথা দাও, করো না বঞ্চনা..
ভালোবাসা, ভিক্ষা, পেতে ওর বড় পরিশ্রম হলো।

দীর্ঘদিন পরে তার করস্পর্শ

ভালোবাসা দীর্ঘদিন পরে তার করস্পর্শ করে।

ধুকুমার লেগে যায়, মাংসের ভিতরে ছুঁচ ফোটে,
শিরায় বারুদ ঢেলে তারপরে করেছে চুম্বন
ফুটন্ত রক্তের মধ্যে এবার একমুঠি চাল ঢালো।

ভালোবাসা দীর্ঘদিন পরে তার করস্পর্শ করে।

মেঘের ভিতরে ফাটে মেঘের মাংসের খণ্ডগুলি।
হেমবজ্রপাত হয়, সর্বাংগে চিকুর যায় দেখা,
শিকড়ে জড়িয়ে পড়ে এখনো দুজনে কেন একা ?

দীর্ঘদিন পরে এই চিতার নিশ্চিন্ত ঘুম থেকে
উঠে-আসা, কাছে-বসা, হাতে-হাত জড়িয়ে অবাক
মূঢ় চেয়ে থাকা, বলা : বৃষ্টি দাও, শুধু মেঘ নয়,
শুধুই উল্লাস নয়, রক্তের ভিতরে ঢালো খেদ,
খরা ও খর্জুর নিয়ে আমি বহু দূর থেকে এসেছি।
মালা দাও, শুকনো হোক, হোক গন্ধহীন, জ্বালাময়ী—
মাথা পেতে নেবো, আর সময়ে ফিরিয়ে দেবো হাতে।

ভালোবাসার পদ্য

যন্ত্রণার মতো দীর্ঘ পথ পড়ে আছে।
সম্মুখে অরণ্য যার মধ্যে নেই স্বাধীন চিন্তার
পরিবেশ, গাছ আছে—বিকল্প রয়েছে।

যন্ত্রণার মতো দীর্ঘ পথ পড়ে আছে।

কে জানে কোথায় আছে এলোমেলো মেঘ
আকাশে ? কে জানে, কেন হৃদয় হয়েছে
পাথর, কে জানে কেন পাথরের মাঝে
ফুল আছে, কুঁড়ি আছে, শিকড় রয়েছে—

যন্ত্রণার মতো দীর্ঘ পথ আছে পড়ে।

চলে যাই তার কাছে

ভাঙা সিঁড়ি : কে ওপরে যাবে ?
দুই আলুথালু ছেলে মূর্তিমান দুটো দশকের
রক্ত নিয়ে, তেজ নিয়ে নিষ্কলুষ মনুষ্যত্ব নিয়ে

কথা বলে। কার কথা? কথা যেন নিজেরি ভিতরে
কথা, যার মানে নেই, শব্দ—যার অত্যন্ত বন্ধুর
মাঠ আছে। তালদীঘি! আর আছে বৃষ্টি-হয়ে-যাওয়া
খোয়াই

যেখানে যাই, যেখানে সহজে যেতে পারি
তার কাছে, চলে যাই, যেখানে সহজে যেতে পারি।
চলে যাই তার কাছে যেখানে সহজে যেতে পারি
শব্দ যার অত্যন্ত নিষ্ঠুর
মাঠ আছে। গেরস্ত রয়েছে।
চলে যাই।

চাঁদ মুক্তি পেলো?

পুরনো বাড়ির আলসে খসানো হয়েছে।
নিচের পাটির দাঁত খুলে নিলে মুখশ্রী তামাম
বদলে যায়, মাড়ির উপরে নকল দাঁতের সারি
অনিবার্যভাবে পুরাতন অনুষঙ্গ আনে না, যা
পলকে বিভ্রান্ত মনে হবে।

নিজের বাড়িটি আজ চেনাই মুশকিল।
গা-গতর চিকণ হয়েছে। নিঃশ্বাস সংযত, শান্ত
অধিকন্তু, নেয়াপাতি ভুঁড়ি,
দেয়ালের রং কাঁচা হলুদের মতো
প্রাণবন্ত।

এমন ছিলো না।
ছিলো কাস্তে, হাতছাপ, দুস্থ বর্ণমালা আর
পোস্টার, পোস্টার।

রাহু কি সত্যিই মৃত? চাঁদ মুক্তি পেলো?

পার হয়ে এসেছি

যৌবন-মাখা শেফালির স্মৃতি
মনে পড়ছে, বারান্দার কোলে উঠোন
উঠোনের কোলভরা শেফালি গাছের নিচে
শাদা, মরা নয়, জোটবদ্ধ হাঁসছানার মতো
পায়ের ডাঁটা হলুদ, পড়ে আছে।

সেই ফুল করতলে তোমার,
ও যৌবনের দিনগুলি!
শাদা-হলুদে মেশা ও যৌবনের দিনগুলি!
তোমার জন্যে কষ্ট হচ্ছে—
বহুকাল হলো তোমায় পার হয়ে এসেছি।

আমার কাছে এসো না

আমার হাত বন্ধ, আমার মুঠিতে রাখা বিষ
আমার কাছে এসো না, দুই মুঠিতে রাখা বিষ
একটি ছিলো দেবার এবং একটি নিজে নেবার
এসো না কাছে, আমার আছে দুহাত ভরা বিষ
ভয়ংকর ভয় দেখাই আমার হাতে বিষ

একদা পরমান্ন ছিলো শকুন খেয়ে গেছে
চুলের মূলে বকুল ছিলো উকুন খেয়ে গেছে
দুহাতে ছিলো রেখার ভার জোছ্‌ছনার জোছ্‌ছনার
এখন তার বদলে আছে দুহাতে ভরা বিষ
এসো না কাছে আমার আছে দুহাত ভরা বিষ।

বস্তুত সে হারে

হয়তো যাবো, এমনি করেই ভাঙতে ভাঙতে যাবো
কাঠ গড়া দালানকোঠা ভাঙতে ভাঙতে যাবো
বুক ফাটিয়ে সুখ ঘুচিয়ে ভাঙতে ভাঙতে যাবো
কিন্তু, কোথায় ? নিরুদ্দেশে ? অন্য ভুবন ডাঙায় ?

গঠনকারী মানুষ আছে নদীর অপর পারে
তার কাজই তো গড়া গঠন, তার কাজই তো পঠন পাঠন
তার কাজই সব জয় করা, তাই, বস্তুত সে হারে ।

শুরু ও শেষের খেলা একই সঙ্গে

অসমসাহসী হাত সোনা রুপো তামার পিছনে
ঘুরে ফেরে দিনরাত, কিছু পেলে পকেটে সাজায়—
শিশুর খেলনা যেন দাবায়, উঠোনে, এককোণে :
এমন নিষ্পাপ করে রাখা তাকে, ভ্রূক্ষেপবিহীন !

সেই একই হাত ছোটে, অন্ধকারে, গদানের দিকে
কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো, খরচোখ, নিঃশঙ্ক কদমে ।
ভিজে কানি নিংড়ে তাকে জল-প্রাণহীন করে তোলে
তারপর ছুঁড়ে দেয় মাঙ্কাতাব মৃত্যুর গলিতে !

দূরে বাজে হরিধ্বনি, জলে ভাসে ক্ষণিকা বুদ্বুদ,
শুরু ও শেষের খেলা একই সঙ্গে গড়ের ময়দানে—
দেশে দেশে স্বাভাবিক মানুষের পাথরের চোখ
সব কিছু সহ্য করে, সব কিছু মেনে নিতে পারে ।

পরিত্রাণের জন্যে

সুপরিকল্পনা নিয়ে মানুষ জঙ্গলে যেতে চায়।
যায়ও অনেকবার, নতুন সামগ্রী নিয়ে ফেরে ;
সামগ্রী সম্পদ নয়, বাহ্যভাবে মূল্যবানও নয়,
শুধু প্রাকৃতিক কিছু, মিছু খুশি অভিজ্ঞতা নিয়ে
মানুষ জঙ্গল থেকে ফিরে আসে শহরে, সভায় !

দীনহীনতার কাছে পরিত্রাণ পেতে হলে যাও—
জঙ্গলে হঠাৎ চলে, একা একা, দোসর না নিয়ে।
আকাশ ছুঁয়েছে গাছ, তার পাশে নিশ্চুপ দাঁড়াও,
বড়োর নিকটে গেলে তুমি ঠিকই পরিত্রাণ পাবে।

যাবার সময়

ভেবে দ্যাখো, আর যাবে কিনা ?
অত্যন্ত সহজ যাওয়া, শুধু, বুকে হেঁটে...
ভেবে দ্যাখো আর যাবে কিনা—
যাওয়ায় তোমার নেশা ছিলো না বিখ্যাত !
তবে ?
যেতে হবে।
বেঁচে, বুঝি থেমে থাকা ভাল ?
তুমি না জমকালো ভাবে জীবন আরম্ভ করেছিলে—
একদিন !

ডেকে আনো

বাতাস ঘুরপাক খায় নদীতীরে
জঙ্গলের পাশে

তুলে নেয় ধুলোবালি, অকপট
ঝরা শুকনো পাতা,
সে সেনাসামন্ত নিয়ে
জঙ্গল দখল করে রোজ,
বিনা রক্তপাতে যুদ্ধ
ঘটে যায় নদীটির তীরে।
কোথাও ক্রন্দন নেই
জয়ধ্বনি সর্বত্র ছড়ানো
ভালোবাসা, সমর্পণ
এখানে প্রত্যেকে ডেকে আনো।

দুপ্রান্তে দুজন

পাহাড়ের এক পাশে শুয়ে আছে ঘাসের মতন
ছেলেবেলা, মেঘ রোদ। সমীচীনতার দেখা নেই
হঠকারী মেঘ এসে উঁকি দেয় জঙ্গলের ফাঁকে।
বাংলোর বারান্দা থেকে স্মৃতিময় স্থবিরতা ডাকে -
সাড়া দাও, উঠে এসো : ওঠে না সে। পাথরের মাঝে
প্রতিবেশ থেকে যেন শুনতে পায় বিসর্জন বাজে!

বারান্দা বন্দর আর এলোমেলো অসতর্ক বেলা
দুই মেরু মধ্যে চলে টানা ও পোড়েন নিয়ে খেলা
কে জেতে, কে হারে— এই জঙ্গলে পাহাড়ে রোদে মেঘে,

দুজন মৃণ্ময় মূর্তি দুপ্রান্তে রয়েছে নিরুদ্বেগে।

একটু থমকে দাঁড়ানো

এখন একটু থমকে দাঁড়ানো দরকার
অনেকদিন হলো বাতাসে ভাসিয়ে গা,
দুপারের বনজঙ্গল টিলাপাথর বাড়িঘর হাপিশ করে,
আপন গোমরে সমুদ্রের দিকে, শুধুই সমুদ্রের দিকে।
অন্তত, এক গণ্ডূষে গোটা দামালপনা হাঁ করে গিলবে
এমন একটি নদী চাই।
ছোটখাটো মাছ-মছলিগুলোকে আপোসে অন্তর্গত করবে
এমন বড়সড় মাছ চাই।
তিমির জন্যে চাই তিমিঙ্গিল!
সবকিছু নিয়ে ভাসার আগে
এখন একটু থমকে দাঁড়ানো দরকার।

ঘুমন্ত কেশর নিয়ে

দুধ কেটে গেছে। তাই খণ্ড খণ্ড মেঘের ছানায়
ভোরের আকাশ ভরতি। অন্যদিকে পিত্তির মতন
জলও তরঙ্গহীন। হাসপাতালে আরামকেদারা
যতটুকু দেয়, তার বেশিটাই কাঠ হয়ে ঢোকে
স্থগিত শরীরে-মনে। বাইরে কাপাস, কার্বঙ্কল
বাতিল স্মৃতি ও স্বপ্ন শুষে নিয়ে চৌকাঠের পাশে।
নার্স নথিপত্র নিয়ে খুটখুটিয়ে ঘরে চলে আসে—
বুক দ্যাখে, পিঠ দ্যাখে, ভ্রূক্ষেপ করে না গর্তগুলি,
যা শুধু মানুষে খোঁড়া, আগাগোড়া জিবের শাবলে।
না ব'লে এখান থেকে বেরুনো মুশকিল,
যদি এরকম হতো সংশ্লিষ্ট সংসারে!
শুতে বাধা, বসতে বাধা, সুস্থ থাকতে বাধা,
তার বদলে শুয়ে এই গন্ধের ভিতরে আলুথালু
ঘুমন্ত কেশর নিয়ে ছেলেখেলা করাও সম্ভব!

হারানো প্রবাস

বৃষ্টির সারল্যে মন বাঁধা পড়ে আছে।
কবিতার গাছে গাছে ফোটে মুক্তিফুল,
অলস ঝরনে ঝরে বেগুনি জারুল
পথে পথে।

শোকযাত্রা চলেছে দক্ষিণে।
অনাদি গঙ্গার খালে পুণ্যবান জল,
কচুরিপানার দান বুকে নিয়ে চলে।
ভিখারি অক্লেশে নেয় প্রয়াত কম্বল
গায়ে টেনে।
জেনে ও না জেনে
খর্বুটে ও খড়ি-ওঠা গায়ে জাগে রোম।

হাঁ করে জলের বাড়ি খেয়ে চারা ধান
যেভাবে বাদায় জাগে,
সেভাবেই হাড়ে জাগে ঘাস।
বৃষ্টির সারল্যে ঠিকে বুঝ পায় হারানো প্রবাস
আমাদেরও।

দোষ নেই অনাক্রমণে

ভিতরের দুটি বাহু কাঙাল কাঁকড়ার মতো খোলা।
নদীকে চেয়েছো তুমি ? পাঁক চাও ? পতঙ্গও চাও ?
এতো কিছু নিয়ে তুমি সিন্দুক ভরাবে !
তারপর চলে যাবে একা
গর্তে, গুহার টান তোমাকে মানায় ?

ভেবে দ্যাখো, তার বদলে তোমার খোলায়
কতো নুন জমা হতো, ইলিঠিলি পোকা।

হোক বোকা, বোকা তো পাথরও।
পরতে-পরতে রেখে হয়নি কাতর ও
কোনোদিন।
শুধু রেখে গেছে,
রেখে-ঢেকে হয়েছে সন্ন্যাসী!
কিছুই চায় না, শুধু
থেকে যেতে চায়।

থাকায় তো দোষ নেই,
অনাক্রমণে!

দাঁড়াবার জায়গা

[বাচ্চুদার স্মৃতি]

সেভাবে জড়াতে নেই, জড়ানোর অনবদ্য ঠাম
ছিলো, ঠাম আছে। সে তো লতা, কথার মতন;
প্রাসঙ্গিক বড়ো গাছ পেলে তবে নিজেকে জড়ায়।
না পেলে লুণ্ঠন ভুঁয়ে, চুঁয়ে চুঁয়ে রসপাত করা
ধুলোর উপর, যাতে অন্য শিকড়ের কাজে লাগে।
এভাবে তোমাকে মাটি পেয়েছিলো, গাছ পেয়েছিলো,
আকাশ-বাতাস ভরে দিয়েছিলে সুঘ্রাণে, সঙ্গীতে—
যতোদিন বেঁচেছিলে, দাঁড়াবার জায়গা খুঁজেছিলে
মানুষের মতো। ঐ তামাটে ভাস্কর্যে চোখ বেঁধে
ছিন্নমূল বোধ নিয়ে কাতর হাঁসের পাখাগুলি
উড়ে গিয়েছিলো একা। জঙ্গলে গুলির শব্দ হলে
মানুষের, পালকের, পাতাদেরও পরিত্রাণ নেই—
একথা জেনেই তুমি রবীন্দ্রনাথের বাম হাত ধরেছিলে!
পথপ্রদর্শক হাত নিয়ে গেছে স্বপ্নলোকে, দূরে।

সমুদ্রে-জঙ্গলে

দুদিনের জন্যে শুধু জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়া যায় ?
যায় না বলেই আমি হাতে রেখে মাস ও বৎসর
একাকী জঙ্গলে যাই, কখনো বন্ধুর সঙ্গে যাই ।
দুদিনের জন্য গেলে জঙ্গলের অপমান হবে—
স্থির জানি ।
দু' একদিনের জন্যে নদীতীরে যাওয়া যেতে পারে ।
গভীর রহস্য নেই, চলমান জল খেলা করে,
বিমূঢ় করে না মন জঙ্গলের মতো
ভাসায়, ভাসিয়ে নেয় সমুদ্রের দিকে—
জলের জঙ্গল এক সমুদ্রের দিকে,
গভীর রহস্যময় সমুদ্রের দিকে ।

যেতেই হবে চলে

একটি দিন ফুরোলে ভয় করে
একটি পাতার মতন ঝরে যাওয়া ।
কিছুই নয়, তেমন কিছু নয়..
শুধুই পাতা ঝরিয়ে গেলো হাওয়া ।
একটি রাত ফুরিয়ে গেলে ভয়,
ভোরের হাতে ফুটাতে হবে ব'সে
ফুলের মতো মধুর পরাজয়
যেতেই হবে চলে ।

উনুনের পাশে

গরম উনুন নিয়ে শুয়ে আছে প্রকৃত বেড়াল :
থাবায় স্থাপিত মুখ, চোখ খোলে, চোখ বন্ধ করে—
বিপুল আরাম যেন গোল হয়ে বলের মতন

পড়ে আছে। রান্নাঘরে এ বেলার কাজকর্ম শেষ।

এমন নিরীহ মুখ, রূপবান টাকার মতন
আঁচলের গিঁঠ খুলে পড়ে গেছে উনুনের পাশে।
বেড়াল টাকার মুখ নিয়ে শুয়ে রয়েছে ঘুমে
ভিতরে, কখনো জাগে, আবার ঘুমোয়, জাগে ফের

স্মারক, মনোভূমি

বাগান ছিলো মুক্তোদাঁতের হাসি
বাগান যেন সুষমা পরকীয়া,
বাগান ছিলো বীজের আঁতুড়ঘর,
বাগান যেন ক্ষণজীবীর বাঁশি।

বাগান বাঁচে জড়িয়ে ধ'বে ঘর,
বাগান দেখো বৃষ্টি হবার পর।
বাগান দেখো রোদের কশাঘাতে,
বাগান দেখো দিনের আলোয়, রাতে

এবং বাগান দেখো অতঃপর,
ঘরের পাশে পুরনো ডাকঘর।
অমল, কেন হারিয়ে গেলে তুমি?
বাগান তার স্মারক, মনোভূমি।

কোন্ আলস্যে

জঙ্গলেতে দমকা হাওয়ার মাঝবরাবর
আকুল যতো শুকনো পাতা উড়তেছিলো।
বুকের ভিতর জব্দ হৃদয় পুড়তেছিলো,
জঙ্গলেতে দমকা হাওয়ার মাঝবরাবর।

হিমজড়ানো পাহাড়গুলির গ্রামের মতন
এখন আমার ইচ্ছে শুধুই নীরবতা।
পথের পাশের কুকুর লুকোয় লেজ সযতন,
পাহাড়গুলির গ্রামের মতন নীরবতা।

কুলকুচোর একফালি রোদ পড়লো এসে
হিমজড়ানো পাহাড়গুলির বুকের উপর।
দুধের মুখে সরের মতন উঠলো ভেসে
উপর্যুপর
সোনার মাছি কোন আলস্যে জড়ালো পা!

দেখা দাও, হাত ধরো

স্বপ্নের বিপন্ন জলে আপার ডেকের ধারে এসে দাঁড়িয়েছো,
মুখশ্রী সিঁদুরে এলোমেলো করে এসে দাঁড়িয়েছো,
সকালে উঠেই তীব্র রোদ্দুরের মতো বাস্তবতা—
রাতের স্বপ্নের কাঠচাঁপাব মতন উঠোনে শ্যাওলার নীল পরিপ্রেক্ষিত
জুড়েপড়ে আছে, দেখে কষ্ট পাই।

স্বপ্নের ভিতরে লোভ গাছের ডগার মতো ফনফনিয়ে বাড়ে,
এদিক ওদিক করে বাতাসের নম্র আলিঙ্গনে
দেয়ালের কাছাকাছি আরো গাছপালার সংসারে
একটি অচেনা ঘাসগুচ্ছে তাজা স্মরণীয় ফুল
হলুদে-সিঁদুরে মিশে আপার ডেকের ধারে এসে দাঁড়িয়েছো।

একাকী দাঁড়াতে পারে? অন্য কারো সাহায্য লাগে না?
কঞ্চির ঠেকনোয় তার ঋজুতা মানাতো,
গভীর গভীরতর করে দিতো তাকে
কিন্তু, আমি তীরে এসে দাঁড়িয়েছি স্বপ্নের ভিতরে
স্বপ্নের ভিতরে তুমি হাত নেড়ে জানাও বিদায়।

প্রকৃত কি চলে-যাওয়া ? ঘরে ফেরা নয় !
এমনও তো হতে পারে তুমি ফিরে এলে !
প্রবাসে সুখের মধ্যে হাঁসের সাঁতার
দিয়ে দীর্ঘদিন পরে ফিরে এলে ঘরে,
আদরে আদরে তুমি আমায় উজ্জ্বল
করবে বলে ফিরে এলে স্বপ্নের ভিতরে,
স্বপ্নের ভিতরে রক্তক্ষরণের মতো প্রেম সঙ্গে নিয়ে এলে
দুহাতে সমস্ত দেবে ভেবে আমি দুহাত পেতেছি
দুটি ঠোঁট দীর্ঘদিন বৃষ্টির ফোটায় ক্ষতবিক্ষত হয়নি বলে
দু ঠোঁট পেতেছি ।

অন্তত স্বপ্নে ও ঘুমে তোমার মুখের গন্ধে বুক ভরে নিতে
পায়ে পায়ে কোন ঘোরে এসে দাঁড়িয়েছি ।
দেখা দাও, হাত ধরো, যেভাবে একদিন
ঘুমের ভিতর থেকে তুলে নিয়েছিলে ।
সর্বাঙ্গ ব্যথিয়ে টান লেগেছিলো বুকে,
কী সুখে বিষম জ্বরে তোমার প্রশ্রয়ে
বেশ কিছু তুলো-তুলো দিনরাত কেটে গিয়েছিলো ।

মনে পড়ে প্রবাসিনী, আজ ফিরে এলে ?

তোমার মুখের হাসি ঝর্নার জলের মতো পাথরে পড়েছে,
যাবার বেদনা তাতে নেই এককণা—
বিচ্ছেদের ভয় নেই স্বপ্নের মিলনে ।
স্বপ্নের বিপন্ন জলে আপার ডেকের ধারে এসে দাঁড়িয়েছো,
মুখশ্রী সিঁদুরে এলোমেলো করে এসে দাঁড়িয়েছো,
স্বপ্নের ভিতরে, ঘুমে তোমার সর্বস্ব পাই অন্তত একবার
দেখা দাও, চোখ ভরে দেখি ।

দোপাটি

ভালোবাসার ভিতর ভেজাল দিলে কাঁকর চালের মধ্যে
যেভাবে দেয় অপ্রত্যক্ষ
সেভাবে ঠিক হয় না দেওয়া লঙ্কাবাটা তরুণ পদ্যে

ছন্দে মিলে কথায় দক্ষ !

তথৈবচ হ্রদের পাশে নিত্য আসে চাতকপক্ষী
কিন্তু, অমন জল রোচে না !
মেঘের মাথায় ডাণ্ডশ মেরে রোদের বোধের দুয়াররক্ষী
সাশ্রু চোখের কোল মোছে না ।

—কেবল—সরল জলকে নামে
অপহ্নুতি মানায় না হে, শকট আমার বললে থামে ।
এক অগোচর লুকিয়ে থাকে—ভালোবাসার পাটের কাঠি—
চমৎকারা ফুল দোপাটি ।

প্রিয় কবি, উচ্চাকাঙ্ক্ষী

[বেলালের জন্যে]

কতোখানি ভালোবাসা না পেলে স্বদেশ ছেড়ে যাবে
আঁক কষে দেখেছো কি, কতোভাবে হৃদয় ফুরাবে ?
করতল উলটে দিলে ভাগ্য হবে শূন্যতামণ্ডিত,
মস্তক এপ্রান্তে থাকবে, দেহ হবে দ্বিধা, দ্বিখণ্ডিত !
তারপর, ভালোবাসা ভরে নেবে দরবেশ-ঝুলিতে ।
যা পাবে না তার জন্যে শিল্পসুখ রঙে ও তুলিতে—
প্রতিষ্ঠিত প্রাণ পাবে, চলে যাবে, বসে থাকা নয় ।
রসেবশে থাকা মানে, হৃদয়ের দীর্ঘ অপচয়—
কতোখানি ভালোবাসা না পেলে স্বদেশ ছেড়ে যাবে
প্রিয় কবি, উচ্চাকাঙ্ক্ষী !

বাস্তবতার ন'টি পংক্তি

অপ্রকৃত স্বপ্নে দেখা
একা একাই স্বপ্নে দেখা
একটি অংশ চাইছে পোড়ে,
অন্যটি চায় মাটি ঢাকা !
কালো কলুষ মাটি ঢাকা ।
একা একাই স্বপ্নে দেখা,
সুখস্বপ্ন একেই বলে,
দেখতে পেলাম অধম ছাড়া -
সংসারও স্বচ্ছন্দে চলে !

অন্তরে যার গেরস্থালি

[কমল প্রিয়বরেষু]

অন্তরে যার গেরস্থালি, সে কোন ছলে পালিয়ে থাকে ?
জঙ্গলে যায়, কমণ্ডলু হাতে — আমায় বুঝিয়ে রাখে
এসব পথে কষ্ট ভীষণ, লোভহীনতার মোরচা দাখিল
করতে হবে, সরলমতি দুই দরজার একপাশে খিল ।
এইভাবে বন্ধনে যাবে, রন্ধনে তার কারুকার্য
দেখেই, সবুজ, মূর্ছা গেলে প্রেমের পাথর পরিহার্য !
করেছো যা করতে হবেই, ঘর ছাড়ানোর মন্ত্র কানে
সরলে দাও গরল, দেখো স্মৃতি তো পশ্চাতে টানেই ।
লন্ডভণ্ড করো না, যা আশিরনখই খণ্ড আছে—
ঘাসের মধ্যে জল ছুটেছে, থামবে গিয়ে নদীর কাছে ।

ছেলেবেলার শব্দ, তুমি

ছেলেবেলার শব্দ, তুমি আমার দিকে তাকালে না
বন্ধু—হাত বাড়ালে না
ছেলেবেলার শব্দ, তুমি আমার দিকে তাকালে না ।

তাকালে যায় মুখচ্ছিরি, অনেকটা ঠিক বাঘের মতন
মূর্তিখানি, ভাঙা প্রতন ।
ছেলেবেলার শব্দ, তুমি আমার দিকে তাকালে না ;

প্রেমের হাত বাড়ালে না
তখন ছিলে আড়ালে না ।
ছেলেবেলার শব্দ, তুমি আমার দিকে তাকালে না ।

বাগান আমার নয়

ফুলের বদলে রেখে গেছে বুড়ো পাতা —
এ-বাগানখানি কখনো আমার নয় ।
ভাঙা বেড়া, ঘাস হাঁটুর সমান উঁচু
চারিদিকে, দ্যাখো, ছড়ানো অনিশ্চয় ।

অথচ আমার বাগান করার সাথে
পর্যুদস্ত হয়েছিলো পড়োশিরা ।
তাদের গাছের ছেঁটে দেওয়া ডালপালা
তুলে নিয়ে বুকে, বলেছি, আসল হীরা ।

সেই হীরা নেই ফলদ তারার মতো,
বাগানের প্রতি কোণেই অমার্জনা ।
শুধু অবহেলা পাতায় ধুলোর দাগ
মর্মান্তিক, হাসি নেই এককণা ।

দেখতে হবে গোলাপ

আমি একটি সরল সুতোয় মালা গাঁথবো ভেবেছিলাম
কিন্তু, সুতো বস্তা পচা !
অতএব যা করতে হলো—গিঁঠে-গাঁটে,
ফুলগুলি সব একই স্থানে রইলো ব্যাকুল,
মধ্যমণি হয়তো গোলাপ প্রস্ফুটিত,
একার হাতে যতেক সেনা জবুস্থবু—
ডাইনে বাঁয়ে আসতে তারা পারছে না আর।
অমনি থাকুক। মালায় জনুক বিশেষত্ব
সরল সুতোয় জব্দ মালার বিশেষত্ব
এতেই হবে। এতেই সবার দিন ফুরাবে
শুধু গোলাপ, ফঙ্গবেনে, না ঝরে যায়
দেখতে হবে। দেখতে হবেই।

একটি উনুন নিভলে পরে

একটি উনুন নিভলে পরে, অন্যটিতে আগুন
দিতেই হবে, যদি জীবন মানো।
একটি ফোটা তারার থেকে আকাশে সবখানে
ছড়িয়ে পড়ে আলোর অভিমান !
দুটি তারার মধ্যিখানে ঘুমের অন্ধকারে
প্রাণের ইশারাতে,
শূন্যতার মহাশ্মশান জেগেছে বারে বারে
তমোঘ্ন এই রাতে।

বাগানের দুটি গাছ

বাগানের দুটি গাছ দুরকম ব্যবহার করে।
একজন কাছে ডাকে, অন্যজন, বলে, যাও দূর—
একজন রুক্ষকণ্ঠ, অন্যজন আপ্লুত মধুর,
ডালপালা ফুল ফল বাগানের বুকে ঝরে পড়ে,
বাগানের দুটি গাছ দুরকম ব্যবহার করে।
ব্যবহৃত হতে-হতে মানুষ বেসেছে গাছ ভালো,
একপ্রান্তে পড়ে আছে আলো, ও প্রান্তে আছে কালো—
ব্যবহৃত হতে-হতে মানুষ বেসেছে গাছ ভালো।

এখনো আসেনি কোনো চিঠি

কমলার দেরি আছে।

ছুরি কাটা পনীর মাখন
একবাটি গরম স্যুপ, কাঁচা লঙ্কা, মরিচ, লবণ—
পিরিচের টোস্ট কামড়ে কাঠগন্ধ ছড়াই ইন্দ্রিয়ে।

কাবলীকলার মতো বেড়ালকুণ্ডলী
পাপোশে।
অসহ্য শীত ভাঙতে আসে মংপুর বাংলোয়
জানালা গড়িয়ে রোদ, কাপড়ের মতো
মেলানো,
স্কোয়াশ ফল বারান্দার পাশে।

কমলার দেরি আছে।
অন্তত দু হপ্তা বাদে হলুদবরণ—
টেবিলে পা দেবে।
কমলার দেরি আছে—
এখনো আসেনি কোনো
চিঠি।

তখনো রিয়াংখোলা থেকে

ওকছাল, পুরনো ঘা-থেকে-ওঠা মামড়ির মতন
ফুলে আছে :
রিয়াংখোলার জলো মেঘটুকরো ওকের মাথায়।
এখানে-ওখানে চষা চীনে-তুলসি, ধাপ-প্লানটেশন
লাতপাঞ্চারের।
মানুষ এখানে
হিম পরিবেশে, চাপে একত্র হবার জন্যে আসে।
টিলা থেকে দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘার
ভুবনভোলানো মূর্তি !
পিঁচুটি জড়িয়ে থাকা কমলাফলের মুখে
এরকমই আশ্চর্য কাঞ্চন
লেগে আছে !
সরল সহিষ্ণু মুখ
পৃথিবীর কীর্তি ভেজালের স্বাদ না পেয়েই ঝরে যাবে
নিজের রসের মতো দামি থেকে
কোনো একদিন।
তখনো রিয়াংখোলা থেকে মেঘ ওকের মাথায়
জায়গা করে নেবে
সিঙ্কোনার ডাল ভরে থেকে যাবে মাকড়সার
ছন্দ, তন্তুজাল।

এইখানে, আলস্য বোঝাই গাড়ি

ইউক্যালিপটাস ফুল শালিনী নদীর পাশে রোদ্দুর ঝলমল
হৃদয়ে শীতের মধু থেকে অন্নপূর্ণার মতন
সেই আকর্ষক ফুলে পতঙ্গ বসেছে।
আরো বেশি আকর্ষক প্রজাপতিদের আনাগোনা
মানুষের মূল কাঠ, তার তৈরি কাটুমকুটুম থেকে শ্রেয়তর কিনা
এই নিয়ে ধাঁধা লেগে গেছে আজ—এইখানে এসে

পাউডারপাফের শীতে, বেড়াল থাবার মতো শীতে
এইখানে কিছু লোক রীতিমতো কাজ করবার গুবরেপোকা মাকড়ের
হেতুক ব্যস্ততা নিয়ে এসে গেছে
মনে ঠিক রোদ্দুর পুইবার মতো কাঁথা আলোয়ান নেই বটে
গিরগিটির স্মৃতি আছে একটুকরো খড়ের মতন চালের বাতায়
লেগেছে রাতের জল এখানে-ওখানে
শুকোবার রোদ আছে জেনে বেশ এলোমেলো আছে
গাড়ির চাকার ধুলো গড়াতে-গড়াতে নেমে আসে
এইখানে, আলসা বোঝাই গাড়ি
খোয়াই, তালগাছ।

জন্মদিনে

শিশিরভেজা শুকনো খড় শিকড়বাকড় টানছে
ঝিনুবাড়ির জানলাদোর ভিতের দিকে টানছে
প্রশাখাছাড় হৃদয় আজ মূলের দিকে টানছে

ভালোছিলুম দীর্ঘদিন আলোক ছিলো তৃষ্ণা
শ্বেতবিধুর পাথর কুঁদে গড়েছিলুম কৃষ্ণা
নিরবয়ব মূর্তি তার, নদীর কোলে জলা পাহাড়..
বনতলের মাটির ঘরে জাতক ধান ভানছে
শুভশাঁখের আওয়াজ মেখে জাতক ধান ভানছে
করুণাময় উষার কোলে জাতক ধান ভানছে
অপরিসীম দুঃখসুখ ফিরিয়েছিলো নদীর মুখ
প্রসারণের উদাসীনতা কোথাও বসে কাঁদছে
প্রশাখাছাড় হৃদয় আজ মূলের দিকে টানছে।

প্রতিধ্বনি, তাও দরজা ভাঙে

নদীখাতে এলোমেলো জল
একধারে হেলে পড়ে আছে
গত বছরের বজ্রসেতু

পাহাড়ি নদীর বাহুবল
বালুতলে লুকিয়ে রয়েছে
শীতের সন্ত্রস্ত সাপঘুমে

রোদ সেই নদীকে জাগাবে
জলকাটা উষ্ণ করতলে
বাঁশের কভারে হিংস্রচোখ

সীতানদী বাংলোর জঙ্গলে
দ্বিতীয়া চাঁদের খুরপি খোঁড়ে
অসহ্য সুন্দর ভয়ঙ্কর

পাতার উপরে হাঁটে পোকা
প্রতিধ্বনি তার দরজা ভাঙে
মাঝরাতে মানুষের খেদ

কন্দে মূলে নখর বসেছে
বুনো ও মানুষে কাড়াকাড়ি
প্রতিধ্বনি, তাও দরজা ভাঙে !

স্মারক

দুই বুড়ো সিলভার ওক কানে কানে পরামর্শ করে—
সামনে পর্চ, কেদারায় বসে আছে ঘুমন্ত স্মারক
মানুষের ! চোখে কানে জিবে ও গহ্বরে পিঁপড়ে গিয়ে
যা কিছু জীবিত নয়, মৃত মাংস, দাঁতে কামড়ে ধরে ।

সক্রিয়তা বেড়ে যায় মৃতের অন্তরে...
গোলপোস্টসুদ্ধ মাঠ পড়ে থাকে খিলাড়িবিহীন ।
ব্যর্থ ও নিষ্কর্মা বাঁশিঅলা শুধু কালহরণের
তালে থাকে, সন্ধে হয়, খেলার মতন মরে দিন ।

দিন মরে দিয়ে সন্ধ্যা, ধারাবাহিকতা নাম্নী রাত
তারপর, কী তৎপরতা বেড়ে যায় গৃহস্থ আলোর !
তৎক্ষণে পুব উঠোন হয়ে ওঠে জঞ্জালবিহীন,
মেঘশূন্য আবহাওয়ার মধ্যে জাগে গৈরিক প্রপাত-
দিন এসে । দেখা যায় মহাশূন্যতার মধ্যে এক
অর্ধশত বর্ণোচ্ছ্বাস বেঁচে আছে, স্মারক হয়েছে ।

তমোঘ্ন

বালিকাটির দেহে ফিরলো তমোঘ্ন রূপ

প্রদীপগুলো জ্বলে উঠলো, কাঁথায় আগুন
লাগলো যেন ঘুসঘুসে জ্বর রাতের মধ্যে
বালিকাটির অঙ্গে ছিলো কাপড় মোড়া
বালিকার ভ্রূভঙ্গে ছিলো আধেক খোঁড়া
অর্ধখানি বাকি রাখার প্রগল্‌ভতা

বালিকাটি হঠাৎ যেন উড়াতে শেখে
পোড়ার মতন পুড়তে শেখে
বালিকাটির দেহে ফিরলো তমোঘ্ন রূপ ।

শিশুকালের তৃষ্ণা

তার পরনে ছেঁড়া জামা। মধ্যে থেকে
দু-মুঠো বাজবরণ লতার মতন পাংশু
স্তনের বোঁটা বেরিয়ে আছে শিশুর জন্যে
শিশু তো নয়, নাছোড়বান্দা পুরুষ, খোঁড়া।
হয়তো তাকে জন্ম দিয়েই মা মরেছে
কাঁটার ওপর গা ঘষটে এই আজ ধরেছে
মায়ের বোঁটা
মেঘ না ডাকলে ছাড়বে না—এই পণ করেছে
শিশুকালের তৃষ্ণা করুক প্রাণহরণ।

এখনো আসেনি

এখনো আসেনি চিঠি মিঠির
পর্দার জঙ্গলে খেলা করে
টিকটিকি এবং আরশোলা
এখনো আসেনি চিঠি
মিঠির
ডিঙিয়ে লাফিয়ে প্রাণ বাঁচায়
সম্মোহক টিকটিকি শব্দহীন
পায়ে চলে এদিকে-ওদিকে
শিকারের সম্ভাবনা ফিকে
এখনো আসেনি চিঠি
মিঠির।
ভোজ্য সব টেবিলে ছড়ায়
বর্গীর বাতাসে ওড়ে ধুলো
ফোলানো-ফাঁপানো চুলগুলো
মিঠির বিহ্বল চুলগুলো!

ঘুমঘোরে

স্পষ্ট মনে আছে কুর্তা পরে
নিদ্রাতুর শুতে গিয়েছিলো
মাঝরাতে উঠে ঘুমঘোরে
বলে উঠেছিলো, কুর্তা কই ?
মশারির আয়তক্ষেত্রের
চতুর্দিক হাতড়ে খুঁজে ফিরে
ছেঁড়াখোড়া কাপড়ে ঢেকেছে
—রক্তের লবণ, নদীতীরে ।

ভোরে উঠে দেখেছে প্রথমে
দেহের নানান স্থানে ক্ষত
নখের আঁচড়ে ক্রমে ক্রমে
পাথর হয়েছে মনোমতো ।
গাছ কি শিকড় থেকে দামি -
সমাধানে নেমে গেছি আমি ।

সৃষ্টির অখণ্ড অবসরে

সৃষ্টির অখণ্ড অবসরে
ভিখারি নদীর মতো চড়া
কোথা ও কুক্ষিতে জল নড়ে
সৃষ্টির অখণ্ড অবসরে ।
বৃষ্টি হলে ঠিকই নামতো ঢল
বসতি ভাসাতো নোনা জলে
কিছুকিছু বিপর্যয় হতো
কিছু হতো, যা হবার নয়,
শরীরের খেদ যেতো গলে
মড়কের মধ্যে ডুব-সাঁতার
মৃত্যুর কার্পণ্য কোলাহলে
দেখি, আদিগন্তও পাথার ।

ফিরে এলাম

ফিরে এলাম ঘরে যখন ক্ষণেক পরে
তখন তিনটি টিনের চেয়ার টেবিল ঘিরে
মর্চেপড়া টিনের চেয়ার টেবিল ঘিরে
খালি বোতল, তালাচাবির ত্র্যহস্পর্শে
ছাইদানিতে মুচড়ে-দেওয়া শাদা কাঠি
কাচের গেলাস উলটে রাখা, সেই শেফালি
সকালের সুগন্ধ শোভা খুইয়ে কেমন
জল-ভেজানো মুড়কি-মুড়ির মতন ক্লেশে
পিরিচে গা এলিয়ে আছে, ফিরে এলাম
ফিরে এলাম একা এবং একটি ঘরে...
চতুর্দোলায় ছলকে যেতে মনে পড়ে,
মনে পড়ে ?
ফিরে এলাম একা এবং একটি ঘরেই।

মানুষটা

একটি পথের পাশে আমি দাঁড়িয়েছিলাম
দাঁড়িয়ে দেখছিলাম মানুষ ঢেউ-এর মতো
ইতস্তত কিছু মানুষ বাঁশের খুঁটি
অপরিসীম কেঁদেছে কাল
পেঁচা, এবং ছুঁচোর গানে পিছলে সকাল
কেঁদেছে কাল
অপরিসীম কেঁদেছে কাল।

মানুষটা তো বাঘের মতন ঘর করেছে
দালানকোঠা আটচালাতে কোথাও ফাঁকি
দেয়নি, ব'লেই ঘর করেছে
এখন কিছু তেতোর লোভে বাহিরজিহ্ব !

মানুষটা তো মানুষ বটেই, ঘোরো মানুষ
ফড়িং তো নয়, ঘাসের পাতায় মিশিয়ে দেবে
রাগরহস্য, দুঃখ ও ক্ষোভ নির্বিবাদে
মানুষটা তো মানুষ বটেই !

বিমানবন্দরে বিদায়

দুই কিশোরীর এই হাসি এই কান্না মুখের
ধরা পড়ছে বৃদ্ধ চোখে
কঠোর দুটি চক্ষে ফাটে জল-দোপাটি
নিমন্ত্রণের সীমান্তে খেদ, বিদায় বিদায় !

মাঝখানে এক স্বচ্ছ কাচের পাঁচিল আড়াল
যাচ্ছে এবং যাচ্ছেনাদের মধ্যে খাঁড়ার
মতন অনিবার্য কাটা বাংলা ভাষা
এপারে ধড় ওপার মুণ্ড যাওয়া আসার !

স্মৃতির মধুচাক দুখানির একটি রেখে
অন্যটিকে বিমানবোঝাই আনতে হলো
একফোঁটা খাই, দুঃখে ফেরাই মধুর ভাণ্ড
মোমের স্তম্ভ স্বপ্নে হলো কষ্টিপাথর
—যাচাই করতে আসল এবং নকল সোনায়
বিমান থেকে যা ফেলে যাই, সব দেখা যায়
অন্তত যা শুধুই দৃশ্য !

ফুলের মতো ছেঁড়া

দোকানপাটে বিক্রি-হাওয়া ফুলের মতো ছেঁড়া
কিছু মানুষ পথের উপর চলছিলো ফিরছিলো—
কখনো হেঁটে কখনো ছুটে থেমে-স্থগিত হয়ে,

কিছু মানুষ বাসনাভাসি হাওয়ায় দুলছিলো।

কেউ এখন সহজ নয়, বুদ্‌বুদের মতন
কিনার ছেঁচে থাকছে বেঁচে ডাকাতে-মোরাটিতে
কোনক্রমে, যেভাবে পারে, কপট এই শীতে।
তেমন রক্ষাকবচ পশম কারোর গায়ে নেই!

শুরু যখন করেছে, শেষ হতেই হবে তাকে
মাছের আঁশ ও বাহুপাশ, খেলনা সাতপাকে
বাঁধন বুঝি বাঁধন নয়, কাঁদছে জীবনভর
দোকানপাটে বিক্রি-হওয়া ফুলের মতো ছেঁড়া।

দিন এসে গেছে

চর জেগে উঠেছে গঙ্গার
পটভূমি তিনপাহাড়
পাকা টমাটোর মতো পশ্চিমে সূর্যের
চর ছুঁয়ে ডুবে যাওয়া!
পাখিরা রয়েছে
এখনো চরের বালি উত্তপ্ত রেখেছে
কোলাহল
সবুজ গমের পাশে মুথা ঘাস রয়েছে সজাগ
মোষের সাঁতার কেন চরের উদ্দেশে?
সে-কারণ স্বচ্ছ, স্পষ্ট বিজলির আলোর মতন
গঙ্গাভাঙ্গনেও।
সুন্দর বাংলোর ঘরে মানুষ এসেছে
একটি শিশুর হাতে পড়ে গেছে কুকুরের শিশু
যাবতীয়
ভালোবাসা আদরের দিন এসে গেছে।

চারশ বছর প্রাচীনতা

কতকালের প্রবীণতা, হাজার ঝুরিমূলের হাতে তুলে দিলে
লুকিয়ে ফেললে জরার আঘাত, পেঁচার কোটর,
লুকিয়ে ফেললে চারশ বছর প্রাচীনতার
নবীনমূর্তি, ঝুরিমূলের উপঢৌকন।
গাঙ্গেয় দুধ সাপটে শিশুর মতন ধরলে
বেঁচে থাকলে, বেঁচেই থাকলে—
ঘুমের মধ্যে ঝুরি নামলো সারসের পা
জনসভায় স্মৃতিপাষাণ দাঁড়িয়ে রইলে
হাজার বছর অগ্রবর্তী দাঁড়িয়ে রইলে
সময় গঙ্গাজলের মতন কূলপ্লাবী
বাতাস গঙ্গাজলের মতন কূলপ্লাবী
দাঁড়িয়ে রইল—
বটদেবতা, পূজা ও পাট পাবার জন্যে,
মানুষ তোমার সামনে হলো নতমস্তক।



ও চিরপ্রণম্য অগ্নি

সূচিপত্র

জন্মদিনে

জন্মদিনে কিছু ফুল পাওয়া গিয়েছিলো।
অসম্ভব খুশি হাসি গানের ভিতরে
একটি বিড়াল একা বাহান্নটি থাবা গুনে গুনে
উঠে গেলো সিঁড়ির উপরে
লোহার ঘোরানো সিঁড়ি, সিঁড়ির উপরে
সবার অলক্ষ্যে কালো সিঁড়ির উপরে।
শুধু আমিই দেখেছি
তার দ্বিধান্বিত ভঙ্গি
তার বিষণ্ণতা।

জন্মদিনে কিছু ফুল পাওয়া গিয়েছিলো
এখন শুকিয়ে গেছে।

পড়ন্ত বিকেলে

ও বোধিবৃক্ষের পাতা রয়েছো লুকায়ে ?

কীভাবে সন্ধান ক'রে সর্বশক্তিমান
পাতার উপর লিখি শূন্যতার কথা !
কীভাবে নিকটে এসে উঁকি মারো সর্বশক্তিমান
ও বোধিবৃক্ষের পাতা পড়ন্ত বিকেলে !

প্রকৃত কে ধরা দিল তা নিশ্চিত নয়,
খুঁজে পাওয়া গেলো কিনা তা নিশ্চিত নয়,
কিন্তু, এসে গেলো, দেখা একে অপরের
পড়ন্ত বিকেলে...
মাথার ভিতর ছিলো এক একটি কবিতার মতন শূন্যতা।

কেবল মানুষই পারে

সুষমার মধ্যে গ্লানি পাত্র ভরে আছে।
জানি না বলেই ভাবি সুষমাই শান্ত অধীশ্বর
সকল প্রাণের,
জানি না বলেই ভাবি সুষমাই হৃদয়ে বসেছে
সমস্ত গানের,
সুষমার মধ্যে গ্লানি পাত্র ভরে আছে।

কেবল মানুষই পারে বিষমুক্ত করে দিতে বায়ু—
আয়ুর অধিক যায় মানুষেরই আয়ু।
অন্তর্গত বিষ ছেনে সুষমায় আনে
বহির্জগতে,
কেবল মানুষই পারে বিষমুক্ত করে দিতে বায়ু।

তোমাকে পীড়িত করা

দুগাটুনটুনির মতো রূপবান মুখে
কেন এতো ক্লান্তি এলো আমার অসুখে ?
আমার অসুখে নেই পারাপার, ক্ষয়
লেগে আছে হরিদ্রাভ সকল সময়।
সকল সময় আমি হয়ে আছি কালো
চেয়েছি সবার ভালো সকল সময়,
তবু কেন এতো ক্লান্তি এতোশতো কালো ?
চেয়েছি সবার ভালো সকল সময়

তোমাকে পীড়িত করা পছন্দই নয়

শরীরের সার অঙ্গ

শরীরের সার অঙ্গ বরফে ঢেকেছে।
বাকি অংশে কোনমতে রয়েছে জীবন,
জীবন মানেই শুধু হাত নাড়া পা নাড়া,
শরীরের সার অঙ্গ বরফে ঢেকেছে।
পরিত্রাণহীন আর অকর্মণ্য ক'রে
রেখেছে আমায়, যাতে পিঁপড়েয় পা ধ'রে
বাইরে না আনতে পারে, কুরে কুরে খেতে।
শুধুই রয়েছি পড়ে দুটি হাত পেতে—
যাবার আগেই কিছু পেতে হবে, জানি।

ও চিরপ্রণম্য অগ্নি

ও চিরপ্রণম্য অগ্নি
আমাকে পোড়াও।
প্রথমে পোড়াও ঐ পা দুটি যা চলচ্ছক্তিহীন,
তারপর যে-হাতে আজ প্রেম পরিচ্ছন্নতা কিছু নেই
এখন বাহুর ফাঁদে ফুলের বরফ,
এখন কাঁধের 'পরে দায়িত্বহীনতা,
ওদের পুড়িয়ে এসো জীবনের কাছে,
দাঁড়াও লহমা, তারপর ধ্বংস করো
সত্যমিথ্যা রঙে-শ্বেতে স্তব্ধ জ্ঞানপীঠ।
রক্ষা করো দুটি চোখ।
হয়তো তাদের
এখনো দেখার কিছু কিছু বাকি আছে।
অশ্রুপাত শেষ হলে নষ্ট করো আঁখি,
পুড়িও না ফুলমালা স্তবক সুগন্ধে আলুথালু,
প্রিয় করস্পর্শ ওর গায়ে লেগে আছে।
গঙ্গাজলে ভেসে যেতে দিও ওকে মুক্ত, স্বেচ্ছাচারী.
ও চিরপ্রণম্য অগ্নি
আমাকে পোড়াও।

ফুলের মতো সহজ

ফুলের মতো সহজ করে ফোটার
স্পর্ধা ছিলো তোমার ফুটে ওঠার,
গর্ব ছিলো তোমার ফুটে ওঠার,
কিয়দ্দিন হলো কোথাও গেছো !

উচ্চ ডেকে পাই না তোমার সাড়া,
ঘুরেছি আমি তোমার চেনা পাড়া,
কিয়দ্দিন হলো কোথাও গেছো !
দেখাতে পাবো তোমার ফুটে ওঠা,
ফুলের মতো তোমার ফুটে ওঠা,
কিয়দ্দিন হলো কোথাও গেছো !

শিকড়বাকড়

শিকড়বাকড় শিকড়বাকড় শিকড়বাকড়
উপরভাগে মানুষ প্রতন,
পিঠের থেকে পেটের থেকে ঝুলছে শিকড়,
জমির ওপর, ক্ষেতের ওপর ঘেঁষটে চলে।

কোনখানে পায় জলের দেখা,
খরায় মাটি বক্ষ ফাটি চিতিয়ে আছে,
মনুষ্যাস্বর নেই তো কাছে।
তার ভাষা সেই আপনি বোঝে,
বসার মতো ঠাঁইটি খোঁজে,
গোটা জীবন উড়ে-উড়েই চলে বেড়ায়।

চেনাজানা মানুষ এড়ায়,
উড়ে বেড়ায়,
জমির উপর ক্ষেতের উপর ঘেঁষটে চলে,
শিকড়বাকড় শিকড়বাকড় শিকড়বাকড়।

কী হয়েছে ?

একা একটি ঘরের মধ্যে ঘুমন্ত লোক,
বাইরে সবুজ অট্টহাসি,
শোকগ্রস্ত ।
একা একটি ঘরের মধ্যে ঘুমন্ত লোক
শোকগ্রস্ত ।
কী হয়েছে ?
প্রশ্ন মাথা কুটে ফিরছে আগলবন্ধ--
দরজা জানলা দেয়াল যেন কান্না-ভেজা ।

কী হয়েছে ?
প্রশ্ন মাথা কুটে ফিরছে আগলবন্ধ--
দরজা জানলা দেয়াল ছিলো কান্নাভেজা ।

স্মরণীয়

দুপুর রাতে স্নান সেরেছে ।
ভাবটা, এখন পূজায় বসবে,
আমার নাকে ধূপের গন্ধ আছড়ে পড়ে ।
ঠাকুরঘরে
মন্ত্র যখন মাছির মতন ভনভনালো !

বন্ধ ঘরে চাঁদের আলো দেখিয়েছিলাম,
প্রবৃত্তি নেই ।
বাতাস বইতে দিয়েছিলাম,
প্রবৃত্তি নেই ।

চতুর্দিকের কিছুই কি নয় স্মরণীয় ?

দিনের পিছনে দিন যায়

দিনের পিছনে দিন যায়
সন্ধ্যা নেমে আসে।
ঘর ছেড়ে বসে আছি ঘাসে
প্রান্তের বাগানে,
ঘর ছেড়ে নেমেছি উঠোনে।

ঘর ভরে আছে শাদা পাতা
আঁচড় পড়েনি,
ভিতরে-ভিতরে কোনো শব্দও গড়েনি—

প্রাসাদ।
গাছের গায়ে হাত
রাখি, পাতায় ও ফুলে
কিশোরবেলায় কোনো কিশোরীর চুলে
ফিতে ও কাঁটায়,
দিনের পিছনে দিন যায়
এইভাবে।

ছড়িয়ে রইলে

পুকুর হয়ে ছড়িয়ে রইলে।

কচুরিপানার বেগনি ফুল, নালের সঙ্গে শালুক দুল
কলমিশাক মালায় তুমি অপেক্ষমাণ হয়ে রইলে।

দূর পথের ঢোলক দ্রুত বেজে সবুজে হলো আড়াল,
চাঁদের আলো খুঁচিয়ে গেল রাংচিতার কাঙাল ডাল
পুকুর হয়ে ছড়িয়ে রইলে।
আকাশভরা রাতের তারা শাড়ির ভাঁজে লুকিয়ে রেখে
উদাসীনতা, পড়ে রইলে

এলো না কেউ।
টোপর শোলার শুভময়তা জড়িয়ে পাশে এলো না কেউ,

পুকুর হয়ে ছড়িয়ে রইলে !

লিচু চোর

লিচু গাছের ঝুলন্ত সব ডালপালাতে
জড়িয়ে আছে খেলার শিশু, পলকা হাতে
বোঁটার থেকে নিচ্ছে ছিঁড়ে রসের মুঠোর
মতন লিচুগুচ্ছ, এখন বিকেলবেলা।

বিকেলবেলা হাওয়া এবং হাওয়ার দোসর
মরশুমি ফুল উড়ছে যখন ছটফটিয়ে—
মাথার উপর ছিন্নমালার সবুজ টিয়ে
তালখেজুরের কোটর পানে করছে ধাওয়া।

আমার চাওয়া লিচুর ডালে চিনির ডেলা।
বেচনেঅলা সাঁতরে আসে জানলা-ধারে,
সত্যিকারের বাগানভরা লিচুর গুচ্ছে
অনধিকার চর্চা আমার, নকল খেলা !

আসল খেলা ঐ শিশুদের, সহজ সরল !
মালির বারণ-টারণ ওদের বাঁধতে পারে ?
ফলছে যখন, ছিনিয়ে খাবে—অবহেলায়
ফেলবে কিছু, টাটকা লিচু, এই আঁধারে।

আমরা যাবো রাত-বিরেতে ধরনা দিতে।
দেখবো লিচুবাগানখানি দেয়াল ঘেরা,
দরজা থেকে কেউ কি পারবো কুড়িয়ে নিতে—
ছড়িয়ে-দেওয়া দুইটি লিচু পাতায় চেরা ?

দেখা

ঘর ভর্তি মানুষ, তবু ঘর লাগছে ফাঁকা
কারণ তুমি নেই
কিছুদিনের জন্যে শুধু দূরে বেড়াতে গেছো

এ-অনুভূতি কখনো আসতো না
কখনো যদি ছেড়ে না যেতে ঘর
তুমি আসলে পর
ঘরের বাঁধন দিয়ে আগলে রাখবো

কিছুদিনের জন্যে শূন্য ঘরের ভিতর থাকবো
তোমায় বেঁধে রাখবো
দড়ি ও দড়া অনেক আছে ঘরে

তুমি আসলে পরে
দু চোখ মেলে দু চোখে চেয়ে থাকবো
অনর্থক, পূর্ণ ঘরে, একা

তোমার পাবো দেখা।

সন্ধ্যায়

সন্ধ্যায় নদীর গান মন্থর লেগেছে
দীর্ঘদিন পর
আলুথালু জেগে ওঠে চর
বাঁশি
জঙ্গলের থেকে নীল কালি
মিশেছে নদীতে
সন্ধ্যায়
নদীর গান মন্থর লেগেছে।
নদী তো দুপুরে ছিল সকালেও ছিল
বেগবান গতি ছিল জলে

এখন কুয়াশা মাখা সন্ধ্যার কম্বলে
মন্থরতা আসে
অলৌকিক নৌকাখানি ভাসে
চাঁদের
বাঁধের উপরে হাঁটে কারা ?
তারা দেয় নৌকাটি পাহারা।

দুই কিশোর কর ছোঁয়ায়

গাছের সবুজ জ্বলছে, আমরা তা থেকে রোদ্দুর
দুহাতে কুড়োবো বলেই গোল হয়ে বসেছি।
বেতলা থেকে জন্তু নয়, শীতের বাঘনখ
চিরে দিচ্ছে পশম ঢাকা ননীর তনু—পাথর।

এ-হাত কোষে অন্ন চায় না, দুহাতে চায় তাপ,
ভিজে কাঠের ভাপ ভরিয়ে দুহাতে চায় তাপ,
বাঘনখের থেকে কঠোর বাইসনের নখ—
দুই কিশোর কর ছোঁয়ায় কাটে মনস্তাপ।

দেবদারু

দেবদারুর হলুদ পাতা ছড়িয়ে পড়ে আছে
গাছের ডাল বড় কাঙাল হয়েছে ফাল্গুনে
কচি ও কাঁচা সবুজ পাতা আসেনি কাল গুণে
দেবদারুর হলুদ পাতা ভূতল ভরে আছে।

পাখি হয়েছে আধোমাতাল বাতাসে সুর পেয়ে
মেঘের পরে মেঘ উঠেছে আকাশখানি ছেয়ে
বনে হরিণ ঘুরে বেড়ায়, বন মানুষে দেখে এড়ায়
দেবদারুর হলুদ পাতা ছড়িয়ে পড়ে আছে
দেবদারুর হলুদ পাতা ভূতল ভরে আছে।

কারাগার

কারাগারের মতন লাগছে হরিণ-জঙ্গল
কঠোর কারাগারের মতো হরিণ-জঙ্গল
কেননা শীতে পড়েছে পাতা
কচি ও কাঁচা পাতায় গাঁথা
হয়নি আজো গাছপালায় ভরাট জঙ্গল
কারাগারের মতন লাগছে হরিণ-জঙ্গল
কঠোর কারাগারের মতো হরিণ-জঙ্গল।

হেমন্তে, উৎসবে

দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা ঘুরতে-ঘুরতে যায়
প্রতিদিনের অল্পচেনা মুহূর্ত পিছলায়
দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা ঘুরতে-ঘুরতে যায়
প্রতিদিনের শুরু ও শেষ একভাবে শেষ হবে
একটি দিনও আলাদা নয়, পৃথক করতে হবে
প্রতিদিনের শুরু ও শেষ একভাবে শেষ হবে
এমনভাবে বাঁচা কঠিন, এমনভাবে কাটে না দিন
হেমন্তে, উৎসবে।

দুহাত দিয়ে

দুহাত দিয়ে জড়িয়ে থাকার মতন মানুষ নেই
কোনোদিকেই তোমাকে খুঁজে পাচ্ছি না পাচ্ছি না
কোনোদিকেই তোমাকে খুঁজে পাচ্ছি না পাচ্ছি না
মানুষ ছিলো হারিয়ে গেছে এই আনাচে সেই কানাচে
ঘরে এবং বাহিরে তাকে খুঁজেও পাচ্ছি না
দুহাত দিয়ে জড়িয়ে থাকার মতন মানুষ নেই
পাথরে-আর মাটিতে খোঁজো কোনো মানুষ নেই

কে যেন কিছু

কে যেন কিছু হঠাৎ করে দেবে
কে যেন কিছু হঠাৎ কেড়ে নেবে
করতলের শূন্যতা ঘুচবে না
ফাঁকি পড়ার কলঙ্ক মুছবে না
করতলের শূন্যতা ঘুচবে না।

সাঁকো

মধ্যে নদী, চর জেগেছে, মধ্যিখানে সাঁকো—
থাকো, একটি চরে কেন ? দু চর জুড়েই থাকো।
দু চর এখন রহস্যময়,
তোমার হাতে অনেক সময়,
থাকো,
মধ্যে নদী, চর জেগেছে, মধ্যিখানে সাঁকো।

আজ বাতাসে

আজ বাতাসে কীসের আভাস, কীসের ?
সমুৎপন্ন বিষে
বাতাসে দম বন্ধ হয়ে এলো।
এখন এলোমেলো
বাতাস আছে, জলের রেখা আছে,
রোদের সাপরেখা জড়ায় গাছে।
বাতাস আছে, জলের রেখা আছে
আজ বাতাসে কীসের আভাস, কীসের ?
সমুৎপন্ন বিষে
বাতাসে দম বন্ধ হয়ে এলো।

অল্পস্বল্প

অল্পস্বল্প বাতাস দিচ্ছে
গাছের পাতা ঝরছে নিচে,
অল্প ক্ষুধার স্বল্প খাদ্য
ঢাকা রয়েছে মৃৎপিরিচে।
অল্প কথার কল্প কাঙাল
মধুমক্ষী করছে জড়ো,
লিখতে যদি না পারি আর
তুমি আমায় কাঙাল করো

অজিতেশ

তোমার মুখ দেখলে মনে হতো কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে
কপালের সন্ন্যাসের নিচে কেমন দীঘির মতন চোখ ছিল তোমার
দীঘির পাড়ে তালপাতার বাড়িটি বড় খেটেখুটে তৈরি করা
অদূরে বিলাসী অথচ সুকুমার তালধ্বজ
এই ঠুনকো জীবনচারিতায় কোনো যোগ ছিল না তোমার

তুমি বজ্রকণ্ঠে ঘুরে দাঁড়াতে মেঘের দিকে
আমাদের খরায় তোমার নিমন্ত্রণ নিতেই হবে।
জীবনকে ভাবি ভালোবেসে সাপটে ধরেছিলে তুমি
ভালোবাসার বেদনায় চিড় ধরেছিলো কোনো কোনো পাথরে, কঠিন
তর্জনী তুলে শাসিয়ে বলেছিলে হাঁ এই ফাটা পাথরেও চাষ হবে
ভালোবাসার ফুল ফুটবে থোকা থোকা, পাতাও আমার চাই
গভীর বিহ্বল সবুজ পাতার পাহাড় থাকবে বাগান ভর্তি তুমি বলেছিলে।

তোমাকে দেখে আমরা একটা অন্যধরনের ভালোবাসা বাসতে শিখেছিলুম
দুই বাহুর আলিঙ্গনে দামাল ঝড়কে বেঁধে ফেলতে তোমাকেই দেখেছি কেবল
আমরা ভয় পেতুম, তুমি সহজেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারতে।

আজ চোখ বুজলেই দেখতে পাই, ঐ শয্যায় তোমায় আঁটে না
গভীর তাৎপর্যময় হাসি হেসে তুমি জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর গাটছড়া বেঁধে দিলে
কেমন অনায়াসে
প্রয়োজন ছিল ?
এ-অনুষ্ঠানের কোনো দরকার ছিল কি ? প্রয়োজন ছিল এ শান্ত নাটকীয়তার ?

আমাদের কাছ থেকে একটা ধূমকেতুর প্রখর বিস্ময় এইভাবে সরে গেলো অকস্মাৎ
তুমি রাতের গাঢ়তায় দিনের মতন স্বচ্ছ সুন্দর ছিলে
তোমার সুখে থাকার গন্ধ আমার কোনোদিনই ভালো লাগেনি
অনিবার্যভাবেই তুমি কাঁটাতার লাফিয়ে গেছো, একজীবন যুদ্ধ করেছো জয়
ক্ষতবিক্ষত হয়েও তুমি সিংহের মতো পরিহাস করতে
ধিক সেই প্রাণবান বাতাসকে, যা তোমার দেহ ফাঁকা করে বেরিয়ে এসেছে আজ।

পারলে হারে

শিশুর হাতে খুচরো, শিশু ছড়িয়ে দিচ্ছে সব উঠোনে।
দুহাত কেঁকে কুড়িয়ে নিচ্ছে রোদের গুঁড়ো ধুলোয় মাখা,
সবটাই অযত্নে রাখা,
জড়ভরত খুচরো, শিশু ছড়িয়ে দিচ্ছে সব উঠোনে!

জড়িয়ে ধরতে শিকড়বাকড় শীতের বাতাস দিচ্ছে হামা।
শিশুটির সন্ন্যাসী জামা,
উদোম গা সন্ন্যাসীর জামা।
সংসারসম্পর্ক খুচরো ছড়িয়ে দিচ্ছে সব উঠোনে।

লোকটা পাগল ছাগল, এসে দাঁড়িয়ে আছে বেড়ার ধারে,
শিশুর কাছে পারলে হারে,
এমন খেলায় পারলে হারে।

ছিন্নবিচ্ছিন্ন

১

মিঠুর মায়ের একটু ছিল পুকুরে ঘষটানি
কেউ বা ধরে হলুদ কোঁচা, কেউ বা টানে কানি
বাগানভর্তি ছিল আমার একটি টোপা কুল
মিঠুর মায়ের মুখমণ্ডল সমস্ত জড়ুল

জড়ুল ছিল চাঁদের গায়ে
জড়ুল ছিল কাঁধে
মিঠুর মায়ের সব কিছু সেই পুরনো আহ্লাদে।

২

গঙ্গাফড়িং এর মতো স্থানীয় শুদ্ধতা
দিলে কে গো নিষাদের মতো
সন্ধ্যার মতন এত তীব্র প্রবণত
গঙ্গাফড়িং এর মতো স্থানীয় শুদ্ধতা

দিন ফুরোলো

একটি শালিক দেখতে পেলো কিশোর মেয়ে
সাত সতেরোয় অনুক্ষণ সবার চেয়ে।
চিন্তাতে খানেক জল পেরোলে নতুন চরে
পৌঁছে যাবে কেমন করে?
—এই কথাটি ভাবতে-ভাবতে ভাবতে
একটি শালিক দেখতে পেলো কিশোর মেয়ে।

আতান্তরে কাটলো বেলা সন্ধে হলো,
নদীর পারে কলহাসির দিন ফুরোলো।
আজ বাদে কাল ছুটতে হবে আপন ঘরে
নতুন চরে
সচরাচর কৌতূহলের দিন ফুরোলো।

কলকাতায়, ভোরে

ভোরের ট্রামের মতো প্রেমের সঞ্চার
মানুষের দেহে-মনে। শীত সরে গেছে।

দক্ষিণে ধানের বোঝা নামিয়ে গোলায়
ট্রাক ছুটে চলে যায় দুঃখভরা খড় নিয়ে শুধু
উত্তরের দিকে। ক্রমাগত।

ধীরে আলো ফুটে ওঠে ফুলের মতন
টবে, বারান্দায়।
কলকাতা-কলুষ মেখে ফুলগুলি তবু ফুটে ওঠে,
ফুটে ওঠে ঝরে যায় এ-মুহূর্তে কতশত শিশু—
মনে পড়ে গেলে আর সুন্দর লাগে না।
মোহময় লাগে না এ-ভোরবেলা তিক্ত কলকাতার!
রাতজাগা শেষ করে মানুষের শ্লথ পায়ে ফেরা
নিজের ঘরের দিকে। কেউ কেউ
ঘর থেকে বাহিরে।

বালকের হাত ধরে বৃদ্ধ যায় বাদাম কুড়োতে!
বাদামের বুড়ো পাতা টুঁড়ে পায় দুচার বাদাম,
তার মধ্যে বালকাল খলসে মাছের মতো নড়ে!
রোদ ওঠে, রোদ উঠে পড়ে,

কাজের কলকাতা তার পোশাক বদলায় ঘরে ঘরে।

আবার পূরবী

প্রকৃতির মতো মুখ,
জানি না কোথাও ঘুণপোকা
কাজে লাগে কিনা!
তার কাজ কুরে-কুরে খাওয়া
মুখ ও মুখশ্রী—গোটা দেহ!
এখন দুঃস্বপ্নে তুমি আসো,
ধীর-স্থির, অন্তরীক্ষ, মোহ!
মৃত্যু জানে, কোথায় সন্দেহ—
বেঁচে আছো, তুমি বেঁচে থাকো।

বধ্যভূমিতে

বধ্যমুহূর্তেই শুধু জল !
আগে নয়, পিছে নয়—
বধ্যমুহূর্তেই শুধু জল !
জল কি একাকী আসে ?
জল কি একাকী ভেসে যায় ?
জল কি শুধুই তাকে সমর্পণ করে-
একা, একা ?

একটি দুটি ধাপ

মানুষের বিচারের একটি ধাপ আছে, দুটি নেই ।
বিচার মানুষই করে, কোনোমতে শকুন করে না !
কী খাবো, কী, না-খাবো দ্বন্দ্বে—এখন মানুষই আদালতে
বসে থাকে, আসন ছাড়ে না ।
আসনেব অবস্থান কাটিগঙ্গা সমুদ্রেই নেবে...

একটি হরিণছানাই তুমি চাইতে পারতে
[করুণদার জন্যে]

একটি হরিণছানাই তুমি চাইতে পাবতে
বুকের উপর পশম, এতো অনভিজাত !
পশম তো নয়, পশম তো নয়—শ্লেষ্মা গভীর
হলে কেমন বাত্যাহত !
এই কথা কি ছিল, করুণ, তোমার সঙ্গে
হেমন্তে বসন্ত করবো ঋতুরঙ্গে
কথা কি তাই !
একটি হরিণছানাই তুমি চাইতে পারতে

শাদা পাতা

শাদা পাতা। আক্রমণ করো।
তীর যোথো কাঠের ধনুকে,
পুরনো বিষাক্ত তীরে আক্রমণ করো—
বর্ণমালা, সরল ও জটিল।
আক্রমণ করো রং-দুর্গ আর কুশের সমাধি,
আক্রমণ করো প্রেম, পরিত্রাণময় এই দেহ—
শাদা পাতা। আক্রমণ করো।

যৌবনের জ্বালা ছিল

যৌবনের জ্বালা ছিল, আজ নেই।
সকালে এসেছে, একা
ঘুরে ঘুরে সকালে এসেছে
প্রেম, যার নাম দয়া, অন্নপূর্ণা, প্রিয় মাতৃমুখ।
এসেছে বলেই তাকে ফেরানো যাবে না,
এইই লব্‌জ, ফেরানো যাবে না।
ফিরিয়ে কোথায় দেবো ?
পুরনো পাথরে !

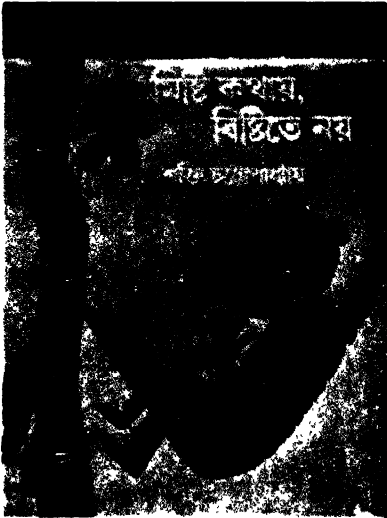
অবলম্বনের মতো প্রেম

অবলম্বনের মতো প্রেম এসে দরজায় দাঁড়াল ।
—বলেছিলে ভালো আছো, একি ভালো
থাকার নমুনা !
ছি ছি ছিছিক্কারে গেলো দুটি দেশ
—পূর্ব ও পশ্চিম।
—বলেছিলে ভালো আছো, একি ভালো থাকার নমুনা !
অনেক অকাজ থেকে ক্রমশ কাজের সৃষ্টি হয়

সৃষ্টি হয় ভূত প্রেত, সৃষ্টি হয় স্বর্গ ও নরক—
অনেক অকাজ থেকে ক্রমশ কাজের সৃষ্টি হয়।

হলুদে গোলাপে মেশা সেই বাংলোখানি
ঝিলের একপ্রান্তে আছে আঁচিলের মতো
প'ড়ে, শানঘাটে দুই পাদুপাদপের অবস্থান
আর দুটি রানা গেছে উরুর মতন ধীরে নেমে
ঝিলের নাভিতে, জল শুয়ে আছে পরম্পরাময়
নারকেলকুঞ্জের ছায়া কালির ছোপের মতো জ্যাবড়া হয়ে আছে
জলে, তীর ধরে নামে জল খেতে হরিণ শাবক
...এবাংলোয় বারবার, বহুবার হলো এইভাবে।
সেদিন বর্ষার রাতে শ্যামলী হারিয়ে গিয়েছিলো
সন্ধ্যার জঙ্গলে কার ডাক শুনে নেমে এসেছিলো
একাকী জঙ্গলে, আমরা লক্ষ্যই করিনি
বৃষ্টি শেষ হয়ে গেলে দোতলা বারান্দাময় গান হয়েছিলো উচ্চকিত
শ্রাবনের মতো গান, বৃষ্টি শেষ হয়ে যাওয়া গান
বেড়াল-থাবায় মুখ মুখশ্রী ঘষছিলো অন্ধকার
পোকামাকড়ের পাল মজলিস আক্রান্ত করেছিলো
ভূতের মতন চাঁদ উঠেছিলো পাকুড়ের ডালে
বনময় জলছেঁচা হরিণের ডাকের মতন
কার ডাক ডাকে শ্যামলীকে
লক্ষ্যই করিনি আমরা, একা নেমে গেছে
খেলাচ্ছলে।
জানি হিংস্র জন্তু নেই হরিণ-জঙ্গলে।
কিন্তু অন্ধকার আছে, গাছপালা আছে
গাছের শাখার মুগ্ধ নিমন্ত্রণ আছে
শ্যামলী একাকী গেছে কঠিন জঙ্গলে
আমাদের গান তাকে আকর্ষণ করে
আমাদের ভয়-ভীতি আকর্ষণ করে
কিন্তু, দীর্ঘকাল হলো ফেরেনি শ্যামলী
হরিণের সঙ্গে তার হরিণীর মতো রয়ে গেছে
...প্রতিধ্বনি ফিরে আসে, ফেরে না শ্যামলী
ওপরে মেঘের জামা পরে ফেলে চাঁদ

বারান্দায় গান বন্ধ, সহসা বাতাসে
'সুখে আছি' তীব্র কণ্ঠ ভেসে আসে কানে শ্যামলীর।
বারান্দায় সমস্বর 'সুখে আছি' ব'লে
'সুখে আছি'।



মিষ্টি কথায়, বিষ্টিতে নয়

সূচিপত্র

ছড়ার আমি ছড়ার তুমি

ছড়া একে ছড়া, ছড়া দুগুণে দুই
ছড়ার বুকের মধ্যিখানে পান্‌সি পেতে শুই।
ধানের ছড়া গানের ছড়া ছড়ার শতেক ভাই
ছড়ার রাজা রবিন ঠাকুর, আর রাজা মিঠাই।
আরেক রাজা রায় সুকুমার, আছেন তো স্মরণে ?
আর ছড়াকার ঘুমিয়ে আছেন সব শিশুদের মনে।
ছড়ার আমি ছড়ার তুমি ছড়ার তাহার নাই
ছড়া তো নয় পালকি, বাপা, ছজন কাহার চাই!
ছড়া নিজেই বইতে পারে কইতে পারে, দুইই—
বাংলা ভাষা মায়ের ভাষা তার তুলোতে শুই ॥

বিণ্টুর জন্যে

বিণ্টু ছিলেন ওকলাহোমায়
বিলটু আছেন দুলিয়াজান
হেলিয়া দুলিয়া হাঁটেন বিণ্টু
মুখে ভরিয়া তাম্বুল পান।

ইস্তাম্বুলে যাবেন বিণ্টু
যাবেন কখনো কান্দাহার
দুলিয়াজানের বিণ্টু যাবেন
বন্ধুর নাম কি রানধাওয়া ?
বিণ্টুর দিদি তিতি আইলেন
ঘুরিয়া-ফিরিয়া গৌহাটি
কয়দিন রইলেন, ফিরত যাইলেন
বিণ্টু রইলেন একলাটি।
আবার দেখা হবে বিণ্টুর
তিতির সঙ্গে কলকাতা
কোতুলপুরে যাবেন দুজন
সঙ্গে নিয়ে বইখাতা।

লিখবেন পড়বেন হয়তো পড়বেন
মাটির পুতুল টর-ঘোড়া—
এখান থেকে যাবার আগে
হইল কেন রাগ থোড়া ?

পুপলুর জন্যে

পুপলু যাবে মামার বাড়ি
সঙ্গে যাবে কে
সঙ্গে আছে মেঘরোদ্দুর
আসতে লেগেছে
আসতে-আসতে গলির মধ্যে
কাশতে লেগেছে
কাশতে-কাশতে পুষ্প ফোটায়
বিষ্টি দিয়েছে
পুপলু যাবে মামার বাড়ি
সঙ্গে যাবে সে ।

মেলা কথা কস্‌নে

কারো কৈ ভাল লাগে
কারো লাগে খল্‌শে,
কেউ খায় ঝোলে ফেলে
কেউ খায় ঝলসে ।
কেউ খায় তিতপুঁটি
ভাজা নয়, সুক্তো
ঘটি-বাটি বলে জাত—
বাঙালেরা ঠুকত ।
গেঁড়ি ও গুগলি খাস
আর চাঁদা চৈতন

পদ্মার বুক ভ'রে
মেঘো বান বইত
কাঁচা খাস, ডাঁসা খাস
চুষে খাস পাখনা
আঁশ-ফাঁস খাস যা-তা
পেলে বিনি মাগ্‌না।
তোদের ডোবা-ই সার
আমাদের বড় বিল
তোদের কুটুরে পেঁচা
আমাদের গোদা চিল
তোমাদের কচু ঘেঁচু
আমাদের সজ্‌নে
হেরে ভূত হয়ে যাবি
মেলা কথা কস্‌নে ॥

ছড়া দুগুনে দুই

১
হাম্‌টি ডাম্‌টি মাম্‌টি তিন বোন
পাহাড় থেকে পড়ে ভাঙলো সিন-বোন
হাম্‌টির দেরি হলো হাসপাতালে গেলো
ডাম্‌টি মাম্‌টিরা রয়ে গেলো তিন কোণ
পারক-এর এক কোণে
ঘরে যাবে তিন বোনে না হলে মা তিন জনে
পিঠে দেবে দুম দ্রাম ॥

২
একটি মাসি দুইটি মাসি তিনটি মাসি কইতো
তাদের দেশের চিনাং নদী দুকূল ছেপে বইতো
বইতো বলেই রইতো কি আর তাদের দেশের মধ্যে ?
থাকলে আমি বসিয়ে দিতুম রুল-টানা এই পদ্যে।
চিনাং চিনাং নদীর আবার কী নাম কী নাম হবে—
মাসির মেয়ে নাচতো যদি সাঁওতালি-উৎসবে ?

ইচ্ছে

আমার সত্যিকারের ইচ্ছে
ওড়ার একলা সাহস দিচ্ছে
বলোই, পারতপক্ষে উড়ি ?
ময়ূরপঙ্খী ময়লা ঘুড়ি।

আমি হোঁৎকা-পেটা সীল
এবং নই ব'লে হাড়গিল
ওড়ার সত্যিকারের ইচ্ছে
ওরা ছাই চাপা দে দিচ্ছে
তোদের উড়ুৎ-পুড়ুৎ কান্না
আমার ক্ষীর করে দেয় রান্না
তবে, টক-মেলানো চাটনি
কমায় আর-ফিরে-বার খাটনি
নেহাৎ সত্যিকারের ইচ্ছে
ওড়ার একলা সাহস দিচ্ছে ॥

এই ছেলেটি, ছেলের বড়

চুলগুলি তার কদমখাড়া বাস্তবিকই আধেক ন্যাড়া
ঘুরে বেড়ায় চমৎকারা ন্যাংটা।
পরনে নকাশি কুর্তা বিড়ালমুখো, বেজায় ধূর্তা
দুপায়ে পায়জোর পরেছে আংটা !
মার চিকিচ্ছে মনোরোগী এই ফিরঙ্গী বাতাসভোগী
খাওয়ার কথায় সদাই ওঠে ভেংচে।
সন্ধেবেলা মা ফিরলে পর ছাদের থেকে গেরস্ত ঘর
ছুটে আসে একপায়ে বা নেংচে।
খাবার বলতে মুট্টামুড়ি হারালঙ্কা উনিশ কুড়ি
অবশ্য তো প'টাক চিনি, উচ্ছে।

বিধবা প্রায় একাহারী মনোরোগীর দুয়োরধারী
দিনে ঘুমোয়, রাতে কে আর শুচ্ছে ?

এই ছেলেটি, ছেলে তো নয় পিলপিলেটি, কী যেন কয়!
নাগাল পেলেই ঘরের থেকে দিচ্ছে—
গামছা সাবান তেলের শিশি ট্রানজিস্টর এক নিমেষেই
নিচের থেকে দীন ভিখারি নিচ্ছে।
এই ছেলেটি, ছেলের বড় আমরা কেবল জড়োসড়ো
বন্ধনে তার রাজার মতো ইচ্ছে।
সবাই তাকে বলে পাগল নেই ব'লে বোধ-বাধের আগল
মা তার করে মনোরোগ-চিকিচ্ছে!

কোন্‌খানে সে কাঙাল দৃশ্য

কোন্‌খানে সে কাঙাল দৃশ্য
উপরভাগের পাতায়, নাকি শিকড়বাকড় ?
জলের তোয়াজ দু'হাত ঢেলে দিচ্ছে সবুজ
ফনফনিয়ে উঠছে শাখার অবিমিশ্র
কীর্তি, যাচ্ছে টলমলিয়ে রোদের দিকে।
কাচের বয়াম ভরাট-করা অর্থলতার
কোন্‌খানে সে কাঙাল দৃশ্য—
উপরভাগের পাতায়, নাকি শিকড়বাকড় ?
সেমুই, সরু কাঠির খোলে জড়িয়ে আছে
কতরকম অঙ্গভঙ্গি ও বাসীজল
কোন্‌খানে সে কাঙাল দৃশ্য—
উপরভাগের পাতায়, নাকি শিকড়বাকড় ?

মিষ্টি কথায়, বিষ্টিতে নয়

কথায় ভেজে চিড়ে মুড়ি
খই বাতাসা
সোহ্‌নুনি দেখতে আসা।
জল ভেজাতে পারলো কিছু?
হাঁসের পালক, মুখটি নিচু—
রানার গায়ের গুগলি-গেঁড়ি
জল ভেজাতে পারলো কিছু?

তাই তো বলি, কথায় ভেজে
ভরন-কাঁসার বদনা-গাড়ু—
জল থই-থই থাক নাগাড়ু।
মিষ্টি কথায় চিঁড়ি ভেজে
বিষ্টিতে নয়, মিষ্টি কথায়
যত্রতত্র, যথাতথা ॥

থাক যতদিন ইচ্ছে-টিচ্ছে

তালবীথি-তীর ঘেঁষটে বাড়িব
একতাল্লাতে তিন আনাড়িব
বকম বকম পায়রা-রকম
জলকে বলে নীর উদকম্।
দূর সমুদ্রে শুশুকনাসা
পাহাড় ভালবাসতে আসা
চেপটে থাকা লেপটে থাকা
ইমলিজলে পান্তা মাখা
গালপোড়া টক নোনতা পনির
চান করে তাই গা মুছছনি।
জল বলে, চল্ গোপালপুরম
খাই দধিমাছ তালের গুড়ম্,
গৌরা মূর্তি, দুই নুলিয়ার
হাত ধরে ঢেউ সই, দুলি আর

এবড়ো-খেবড়ো পাহাড় ডুবো
আয়েস করেই শরীর চুবো
থাক যতদিন ইচ্ছে-টিচ্ছে
বাপ-মা হোটেল খরচা দিচ্ছে ॥

মীমাংসা

কেউ বলে গ্রামান্তে যাব,
কেউ বলে আয় কানতে বসি।
ধপধপিতে দর উঠেছে,
রূপশালি ধান ভানতে বসি।

কেউ বলে দিন বিষ্টিমুখর
মেঘ দেখেও তক্‌রা করো ?
কেউ বা বলে দিন ফুরোল,
সাঁঝবেলাতেই ঝগড়া করো !

কেউ বা বলে চাঁদের হাসি
বাঁধ ভেঙেছে মাতলা নদীর !
কেউ বলেছে জলদি চলো
গ্রামান্তে পৌঁছুবেই যদি।

সেইখানে এক আংরাভাসা
পুষ্করিণীর পূর্বদিকে,
জট-বুড়োদের বোঠকখানা
কল্‌কে-বোঝাই কালো টিকে।

আমাদের এই ঝগড়া-বিবাদ
ওদের কাছে তুচ্ছ বলেই,
মীমাংসাসূত্রটি খুঁজতে
সামিট-এ যাই সবাই মিলে।

কিনার একটা পাবই পাব,
নইলে রাষ্ট্রসংঘে যাব।
সবার জন্যে রুটি-মাখন,
নিজের জন্যে 'আবার খাব'!

তাতারের সাঁতার

তাতার কাটে সাঁতার ডাঙ্গায়
তাই কখনো হাত পা ভাঙ্গা
কাটত যদি জলে
শুতো না কম্বলে
খাদ যখনি কাটে
তাতার পাড়ে হাঁটে
জলের মধ্যে কালো
তাতার জানে ভালই
মেঘ ওরা, নয় মাছ
আস্ত ডাঙ্গার গাছ
ছায়া তো নয়, সিঁড়ি
বসতে দিল পিঁড়ি
গড়িয়ে পড়ে জলে
বয়সটা কম ব'লে ॥

বেড়িয়ে এলো সুন্দরবন

তিতি তাতার দু ভাইবোন
বেড়াতে গেলো সুন্দরবন।

সুন্দরবনের কুমির বাঘ
দেখতে গেলো পয়লা মাঘ।

পয়লা মাঘে ভ্রমণ নাস্তি ।
বিন্ধ্যপর্বত পেলেন শান্তি ।

হ্যামিলটনের জমিনদারি
তিতি করলেন ভীষণ তারিফ ।

সেগুনকাঠের বাংলোয় বসে
তেষ্টা মেটালেন খেজুর রসে ।

জিরেন কাটের মিঠেন রস
তিন তাতার কে কার বশ ?

সুন্দরবনের সুঁদরি গাছ
মুরগির ঝোল-ঝাল পাঁকাল মাছ ।

পাঁকাল মাছের চাটনি ভাল
সারেং মাঝির খাটনি ভাল ।

তিতি তাতার দু ভাই বোন
বেড়িয়ে এলো সুন্দরবন ॥

চললো গাড়ি ধুবুলিয়া

ছেলে তো নয়, ভেলভেলেটা
একটু কালো, একটু শাদায়
আধেক ঘোড়া, আধেক গাধায়
ছেলে তো নয়, ভেলভেলেটা ।

নিবাস তো তার আসানসোলেই
মিরচা যা খায় মাছের ঝোলেই
অম্বলে খায় চিনির পাহাড়
আসল নামটি জানো তাহার ?

নকল নাম তো বহুত আছেই
কোঁড়ক ফুলে কুমড়ো গাছে।
ডোবার কাছের পাটকাঠিতে
তৈরি দেহ, গজকাঠিতে

মাপতে গেলেই খামচে ধরে
সুলক্ষণার গয়না পরে।
মুখব্যাদান করেই আছে
যিনি গানেই ভাংড়া নাচে।

এই তালেবর তালেব মিয়াঁর
স্যাঙাত খুবই ঝনঝটিয়া।
তারও গপ্‌গো কইবো পরে,
মুণ্ডু সাবাড় দমকা ঝড়ে।

ওয়ালেকম ছালাম মিয়াঁ,
চললো গাড়ি ধুবুলিয়া।

মাছ জলে

টোটোপাড়ার টোটো
এক বিঘৎ ই ছোটো
আমার চেয়ে অনেক
ওজন, দু'তিন টনেক

আমার পাড়ার হোয়াং
একটি লেবুর কোয়াং
পেলেই বলে চোয়াং
ভগবানের দোয়াং

ওরই কি নাম বিশে
কেরোসিনের শিশির
একমুঠো জোনাকি

পুরেই, টানং দিসে
মাছ জলে যায় মিশে
এক-নাগাড়ে মিস্-এই

তাতারের পাশ ফেল

চার বিষয়ে ফেল ছেলেটির
নামটি ছিল তাতার
কপিলদেবের ক্রিকেট খেলে
তাই জানে না সাঁতার।
জেনেই কী শ্রীবৃদ্ধি হবে
গজাবে দশখানা
হাত, দুগগার আসছে পুজো
চলেই যাবে ভাতার।

তার দিদিটি হয়তো মিঠি
সবাই করে আদর
'কলারশিপ'-এ নাম কিনেছে
হলোই বা সে বাঁদর!

লজ্জা ঘেন্না হয় মেয়েদের
তাতার কি আর মেয়ে
আট বিষয়ে ফেল করে তার
নাম তো সবার চেয়ে।

ওরা

পাড়ায় পাড়ায় পাড়ায়
ওরা রাতের শেকল নাড়ায়
এবং ডাকে কাদের ডাকে

ওরা কোন্ পাড়াতে থাকে
কখন কোন্ পাড়াতে থাকে—
ওদের চেনে না লোকজন ?

বাবুই

বাবুই বাবুই করে মা
বাবুই গেছে কাদের গাঁয়
কী পারে তাই জানতে
বসেছে ধান ভানতে
চুল্লি ধরায় ছোবড়ায়
কোন্ গাঁ থাকে ঢোকরা ?
এইটুকুনি প্রশ্নে
বাবুই কথা কস্‌নে,
বলেছে ভাট-গিন্নি
ধান কি ?—ও তো বিন্নিই
ওইটুকুনি ভানতে
বাবুই, বসিস কান্দতে !
শোউরোবিবি, তাইতো
নইলে কী আর গাইতো
মেমসায়েবের গানটি—
ফান্টা ফানি ফানটি ॥

একটি পাহাড় দেখেছিলুম

একটি পাহাড় দেখেছিলুম কারমাটারে,
দিনের বেলায় অ্যাত্তোটুকুন, রাত্রে বাড়ে।
রাত্তিরে তার কোল ঘেঁষে খুব মাদল বাজে,
কারমাটারে এসেছিলুম নানান কাজে।
কাজের মতন কাজ ছিলো এই চোখের দেখা,

কারমাটারে কেউ যেও না একলা একা।
কয়েদ করে রাখবে ধরে যাবজ্জীবন
কারমাটারের এই রীতি—ওই পাহাড় লিখন।
সবার নখদর্পণে নেই অর্থভেদী—
বুদ্ধি বিবেচনা এবং কুঠারছেদী
কাঠের মতন শক্ত পাহাড় কারমাটারের,
দিনের বেলায় অ্যাত্তোটুকুন, রাত্রে বাড়ে ॥

ধন্যি মেয়ে

কালিমপং-এর হাটে
কুকরি দিয়ে কাটে
মাছ
তিস্তাবাজার ছাড়িয়ে
বাতাস ছোটে নাড়িয়ে
গাছ
গাছের মাথা, আলিম্পন
ভুঁইজোড়া তোর, কালিমপং
নাচ
মেঘের ঘাঘর জড়িয়ে
বরফ কুচি সরিয়ে
আঁচ
দেখাস রোদের রাগের টং
ধন্যি মেয়ে কালিমপং ॥

বোলচালে কুপোকাৎ

ধরি মাছ ছুঁই পানি
অকথা-কুকথা জানি,
রোগা দেখে তড়পানি

করতে কি পারি না ?
চটকাতে পারি খুবই
কাদা পাঁক জলে ডুবি,
বাগে পেলে শুষ্‌শুষি,
না বাজিয়ে ছাড়ি না।
পারি কি পারি না জেনে
কে আর ঢোলক কেনে ?
বোলচালে কুপোকাৎ
করে ছাড়ি, মারি না।

কি-রি

বিলিতি কুকুরের ছানা
ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না
নিতে হলে জলদি নেবে
খেতে দিলে মাংস দেবে
দেরি হলে আর খাবে না।

অভিমানে থাকবে বসে
লেজ গুটিয়ে লাল পাপোশে
কানে দিলে চশমা এঁটে
তখন খাবে মাংস ঘেঁটে

বিলিতি কুকুরের ছানা
ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না
নিতে হলে জলদি নেবে
কিছু কি আর পয়সা দেবে—
ভালবাসা, তাও দেবে না ?

কাঠের ঘোড়ার গপ্পো

বারান্দাতে পড়ে আছে কাঠের ঘোড়া।
তার পিঠে আজ চড়তে নারাজ তাতার ছোঁড়া—
বলে, ও তো ঠিক চলে না, দুলতে থাকে,
আর মারে চাটি, যখন-তখন, দোলার ফাঁকে।
তাও যা ছিল ছপ্‌টিখানা ভাঙল দিদি,
বুটছোলাগুড় যখন যা দিই—
খায় তো দেখি!
টগবগানো আওয়াজ শুনি রাতের বেলা,
দিনেই মেকি!
মা বলেছেন, উনুনে ও জ্বলত ভাল।
বারান্দাময় আবর্জনার দিন ফুরাল।
ঘুমের মধ্যে কাঠঘোড়াটি দৌড়ে আসে—
'তাতার, তাতার'—এ-ফিসফাসে
কেউ জাগে না, তাতার জেগে ঘোড়ায় চড়ে।
পক্ষিরাজের ডানায় ওড়ে—
সমস্ত রাত, সমস্ত রাত, কী আহ্লাদে!
কিন্তু, কে যে কোথায় কাঁদে,
কিন্তু, কী যে কোথায় কাঁদে!

আল্‌তাপুকুর নাল্‌তাপুকুর

আল্‌তাপুকুর নাল্‌তাপুকুর
পুকুরভরা পদ্ময়
কোন্ সুবাদে নাইতে নামে
দুকাল-ঠেকা মন্দ
নিত্যি আছি ধান্দায়
উচিত মনে ধরতে পেলে
পাঠাবো গাইবান্দায়।

বলতে পারো ?

একটি ছেলে দুলছিলো তার দোলনাতে
বলতে পারো, ফুল ছিলো তার কোন্ হাতে ?
সেই ছেলেটি দুলছিলো তার দোলনাতে।
এই দেখা যায় রোদ, কখনো এই আঁধার
এই দেখা যায় দুলছে বেজায়, এই বাধা।
এই বোঝা যায় মনটি পবন, এই পেঁচা।
এই যাবে সে গোমড়া-বদন, এই চেঁচায়।
কোন্ সে ছেলে দুলছিলো তার দোলনাতে
বলতে পারো, ফুল ছিলো তার কোন্ হাতে ?

উসমি-কুসমি

উসমি কুসমি দুই বোন
—ভাল্ লাগে না ঘরের কোণ
ঘরের কোণে অন্ধকার
উসমি কুসমির মনটি ভার।
একটি তো নয় দুইটি মন
—ভাল্ লাগে না ঘরের কোণ
দুই বোন যাবে কান্দাহার
উসমি কুসমির মনটি ভার ॥

এক কিশোরীর দুঃখ

এক কিশোরী থাকতো সুখে আড়ংঘাটায়
কাজ ছিলো তার বাটনা বাটা
অন্ন ব্যঞ্জন বাটনা বাটাই
সেই কিশোরী থাকতো সুখে আড়ংঘাটায়।
রান্নাবান্না জানতো না সে

আটপহরই কাদ্‌তো বসে
কুটনো কুটতে পারতো কিছু
একটু-আধটু কইতো মিছু
আমড়া খেয়ে বলতো মিঠে
আম খেয়ে কয় আস্‌কে পিঠে
সেই কিশোরী থাকতো সুখে আড়ংঘাটায়
কাজ ছিলো তার বাটনা বাটা
অজম্বর বাটনা বাটাই ॥

আসতো আলো

জানলা দিয়ে আসতো আলো
আমায় একা বাসতো ভালো
তোমার জন্যে ফক্‌কা
টক্‌কা টরে টক্‌কা ।

দরজাতে দুই পাল্লা
এক মাঝি, আর মাল্লা
দরজাতে দুই পাল্লার
ঘরখানা চারচৌকো

পার হবে ? দাও পয়সা
এই তো আমার ব্যাওসা
তার চে' ঘরে থাকলে
আমার কথাই রাখলে ।

তাতার তাতার করে যায়

তাতার তাতার করে যায়,
তাতার গেছেন তিন বিঘায় ।
তিনবিঘা তো বাংলাদেশে,
তাতার ঘোরেন আলগা বেশে ।
আলগা বেশ হয় দুরকম,
মুখের বাদ্যি বকম-বম ।
সুখের বাজনা তাই রে না,
হাজার লোকে জানেই না ।
সর্দি হলে কুঁতে খায়,
না হারালেই খুঁজতে যায় !
খুঁজতে খুঁজতে পগার-পার,
তাতার জানেন ডুব সাঁতার ।
শীতের জলের ঠাণ্ডা কাঁটা,
দুপায়ে নয়, হাতেই হাঁটা ।
হাঁটতে হাঁটতে তিনবিঘায়,
তাতার চলেন ডাইনে-বাঁয় ।
চোখ বোজালে দেখতে পায় ॥
তাতার তাতার করে যায় ॥

কালীঝোরা বাংলো

কালীঝোরা বাংলো
যো কুছু চাই মাঙ্‌লো
চা-কফি নেই, ভাঙ লো
কালীঝোরা বাংলো
ঝোরার বুকে শব্দ
শীতের কাঁটায় জব্দ
আকাশ মেঘে গোমড়া
আসেন হোমরা চোমরা
কি-সন যখন সন্ধে
আমরা পড়ি ধন্ধে

গোবর গণেশ চাঁদটা
ঠিক পাহাড়ের কাঁধটায়

অশরীরী

অশরীরীর শরীর আছেই—
ফিসফিসানি পাকুড় গাছে
শুনছো ?
বনকাপাসের তুলো উড়ে
পড়লো বুড়ির উঠোন জুড়ে—
ধুনছো ?
ধুনতে-ধুনতে তোশক হলো,
ইস্টিশানের মশকগুলো
একলা।

টানা-জালেও হরিমটর
পড়লো চাঁদা খল্‌শে ছোট
খাপ্‌লায়।
মাঁছ দিয়ে যাঁ, মাঁছ দিয়ে যাঁ
পাঁরিস যদি প্রাণটা বাঁচা
বুইলি ?
পাকুড় গাঁছের গোড়ার ঠেসে
জঁল রেখে যাঁ নাজুক হেঁসে—
থুইলি ?

ঠিকে ভুল

মেমসাহেব কি অম্বলে
চুমুক দেননি কম বলে ?
খেয়েছিলেন ভোগের নাড়ু

শুকনো আলুর দম বলে।

মেমসাহেব কি বোকা—
বুঝেছে ঠিক খোকা
বোমার ভয়ে বর্মা ছেড়ে
গেলেন কিনা চম্বলে।

বহুরূপী

বহুরূপীর বহুৎ রং
কেউ বলেছে জবড়জং
কেউ বলেছেন ঐকিক
কাঠের পিঁড়ি চৌকি
কেউ বলেছে গয়া
খাঁদা ও রামসয়া
ওর কথা কে জানতো
না শোনালে কান্ত ?
বহুরূপীর রূপের বাড
কেউ বলেছে নদীর পাড
কেউ বলেছে ঝর্না
সে আমাদের পর্ণা
কেউ বলেছে লম্বায়
ও ঠিক জগদম্বা
কেউ বলেছে ছীঃ ছিঃ
রূপ নাকি ? ও বিশ্রী
কেউ বলেছে লক্ষ্মী
কাকাতুয়া পক্ষী ॥

ঝুমবা

ঝুমবা নামের ছোকরাটিকে
রাখবো যখন তুলে শিকেয়
বুঝবে
মা এসেছেন তেড়ে-পুড়ে
তালাস তালাস রাজ্যি জুড়ে
খুঁজবে

ঝুমবা কথা কইবে না
এ-সংসারে রইবে না
চলেই যাবেন ইস্টিশান
যেদিকে দুই চক্ষু যান
চলবেন
ঝুমবা নামের ছোকরাটিকে
কোথায় পাবে ? রাখবে শিকেয়—
খুঁজবে ?

ছড়ার মতন ছড়িয়ে

ছড়ার মতন ছড়িয়ে
তাতার গেলো গড়িয়ে
ক্যান্ রে তাতার গড়ালি
—মা কেন তুই চড়ালি ?
উলুক ঝুলুক করছে মন
মা তুই যাবি বৃন্দাবন
হোক্ রবিবার আপিস যা
চাপিস যদি মিনিবাস
পাঁচ মিনিটে পৌঁছে যাবি
—তাতার কোথায় খুঁজে পাবি ?
ছড়ার মতন ছড়িয়ে
তাতার যাবে গড়িয়ে ॥

লিচ্ছবি মেয়ে এসে

লিচ্ছবি মেয়ে এসে কীচ্ছবি চায়
ধর্মতলায় তাকে একলা দেখায়
হিজিবিজি ট্রাম বাস চতুর্দিকেই
দশ দুনো কতো হয় আয় না শিখে

একদিন দুই দিন দশ দিন যায়
লিচ্ছবি মেয়ে, জানো, বাংলা শেখায়
বলে, এঁকে লিখে গেছে ওবিন ঠাকুর
তাই দেখে টুকেছেন রবিন ঠাকুর।
তোমাদের দেশে কী যে কেলেংকারি—
এ-পাশে গজালো মুখে ছাগল দাড়ি।

বিষ্টি পড়ে

বিষ্টি পড়ে ছিষ্টি জুড়ে
বিষ্টি পড়ে বর্ষায়
সাঁতার সাঁতার—মেঘ কাঁটাতার
রাখলে কাদের ভরসায়?
রাখলে যখন রাখলে
আমায় কেন ডাকলে?

দোখ্‌নো

লোকটি ছিলেন দোখ্‌নো
তিজেল বলেন, কক্‌নো।
কোন কাজে সংলগ্ন?—বলুন
কোন কাজে সংলগ্ন?

এই সমাচার জানতে, গেলুম
সজনেখালির প্রান্তে
পেলেন কাঁদতে বসে অক্কা
এবং ব্যাটা না করেই ছক্কা
—এই কথা বেমক্কা
বলার জন্য কি শক্রয়
অমন দক্ষ ধনুর্বিদ্যেয় ?

ছিলেন ক্ষিতীশ, হলেন ক্ষিদ্দা
নচেৎ ঠাক্‌মা কীসের দিদ্দা ?
অমন দোখ্‌নো-টোক্‌নো নইলে
গরুর গোয়াল হতো গইলো ?

কুমড়োপটাশ, তোমার

কুমড়োপটাশ কুমড়োপটাশ
        তোমার নাকি ইয়ে
লাউসেনানীর দুর্গে গিয়ে
        জোগাড় কচ্ছো বিয়ের ?

কুমড়ো, তোমার...থুড়ি
এন্তাবড়া ভুঁড়ি
আপাদমাথায় আর কিছু নেই
মদ্দিখানে বাদবাকি সেই
ঢ্যাপসা ঢোলক—ভুঁড়ি ।

কিচ্ছুটি নেই ! কিচ্ছুটি নেই !

বাঘের মাসি ভালই বাসি, বোনঝি বিষম উৎপেতে
তাও তো ঝাঁকিদরূণ আশায় লনচ ভাসিয়ে হয় যেতে
মাতলা আর মৃদঙ্গ ভেঙে, এই-খালি ওই-খালির ধার
ভাসতে ভাসতে জীবন অন্ত, তীর ছুঁতে একদিন কাবার ।

বন দেখেছি শাল-সেগুনের, ছবির মতন, চিরোল পথ—
পাথর-নুড়ির ঠুনুক-ঠুনুক, ঝর্না-টিলা ও পর্বত ।
কিচ্ছুটি তার নেই এখানে, মধ্যে-মাঝে ক্ষীরের চর,
কান-ঝুলঝুল কুকুরে-বন, স্কন্ধ-সমান পরের পর ।

লবডঙ্কা দর্শনীয়, গোলমেলে জল, বকপাখি
উবদো ভুরুর মতন নৌকো আর নালিঘাস, সাংঘাতিক
ঢিবি-কাছিম, উড়ন্ত চ্যাং, এঁটেল মাটির আঠায় কাত—
মাল্লা-মাঝি গান জানে না, কয় না কথা, কী বজ্জাত ॥

চল্ মন্দিরে

কাঠঠোকরা ঠুকরে খায়
হাঁক পাড়ে, সব তফাৎ যা ।
তফাৎ যেতে হইল কি—
মুখ থুবড়ে মইল কি ?

মাছরাঙাদের রং-বাহার
মাঠ পেরুলে গ্রাম কাহার ?
গাঁয়ের নামটি কুলতলি
চল, ঝারি নে ফুল তুলি

ফুল তুলে চল মন্দিরে
সরসতীয়ায় বন্দি রে ॥

এক ছুটে বা দৌড়ে

একছুটে বা দৌড়ে
টুব্‌লু গেছে গৌড়ে
সেখান থেকে সারনাথ
টুব্‌লু সোনা কার না ?
তোমার-আমার-পড়শির
টুব্‌লু ফেলে বঁড়শি
মাছ ধরে আর গান গায়
মিষ্টি ছাঁচি পান খায়
তাই তো গেলো গৌড়ে
একছুটে বা দৌড়ে ॥

ক্ষীরের ধার

আদাম বনের বাদাম পাতা
সবুজ থেকে ধরছে লাল
বাদামগুলোর সবুজ শোভা
শুঁটকো এবং শুকনো গাল

আদুর বাদুড় খায় ওগুনো
চামচিকেটা বেজায় কুনো
দুই পাথরে ভাঙছি তার
মধ্যিখানে ক্ষীরের ধার ॥

নাগাডোম ভাগাডোম

আগাডোম গেলে বাঘাডোম আসে
বাঘাডোম গেলে কে ?
আমার মধ্যে দুকুড়ি চারজন নাইতে নেমেছে ।

নাইতে নাইতে আর গান গাইতে তবলা এনেছে
আগাডোম গেলে বাঘাডোম আসে
বাঘাডোম গেলে কে ?
বাঘাডোম গেলে নাগাডোম আসে
নাগাডোম গেলে কে ?
বুকের মধ্যে দুকুড়ি চারজন সানাই বসিয়েছে।
সানাই সানাই—আর যার মা নাই, তাকেও শুনিয়েছে
নাগাডোম গেলে ভাগাডোম আসে
ভাগাডোম গেলে কে ?

আমার প্রিয় নেড়ি

সবাই বলে, নেড়িকুত্তোর গায়ে ধুত্তোর
রেড়ির তেলের গন্ধ !
দুধ না খেয়ে চিবোয় পশম, কুত্তো কসম,
দেখতে খুবই সুন্দর।
মা বলে, ঠিক কামড়ে দেবে, আমড়া বনে
কাষ্ঠকুটুম পিমড়ে,
ডাক্তার বলে, মাগ্গি ভাতার বর্ধিত হার
ফুলকো লুচি চিমড়ে।
মাগ্না পেলুম নেলী-শেলী, আর পেয়েচি
লোহার চেনের বন্ধন,
তাও তো বলো, নেড়িকুত্তোর গায়ে ধুত্তোর
রেড়ির তেলের গন্ধ !
তোমরা পুজো-আচ্চা করো, ধূপধুনো দাও
আমার তো হয় দমছুট,
কইতে আসি কিচ্ছুটি কি ? চুপ মেরে যাই
দাও না গুঁড়ো বিসকুট।
ওরা আমার বল চিবুল, আমার তো বল
নয় ঠাকুমার পুঁটলি,
ওদের পানে তাকিয়ে দ্যাখো, কষ্ট পাবে
তা নয় বকতে জুটলে !
বড়দের এই খুনসুটি-ভাব কোন্ ছোটতে

মানতে যাবে দৈনিক ?
আমার হল পরীক্ষা-শেষ, সেইভাবে চায়,
খাতা এবং বই নিক ॥

তিতি তাতার

তিতির ভাই তাতার
কম কি জানে সাঁতার
হাত পা ছুঁড়ে পুকুর খুঁড়ে
পথকে বলে পাথার ।

তাতারের দি' তিতি
বাঙালদেশের জল-কাঙালে
মেঘ-বাজে নেই ভীতি
পথগুলোকে পাথার বলা
ওদের দেশের রীতি ॥

এসে দাঁড়াও

দুষ্টুমি হয় একটু করো
বাড়িয়ে ফেললে বারণ আছে !
কারণ সবাই ভয়ংকর
বারণ করার কারণ আছে ।

সমুদ্রে যে পাহাড় আছেই
এই কথাটি কেমন তরো !
পাহাড়ে সমুদ্র ভাসে—
চাইলে, তা, দেখাতে পারো ?

যা চাই না চাই দেখবে যদি
নদীর তীরে দাঁড়াও এসে—
একটু-আধটু ভালবেসেই,
নদীর তীরে দাঁড়াও এসে ।

ছড়ার বুড়ির বড়াই

ছড়ার বুড়ি বড়াই করে পাঁচজনে,
ফুলোর হাওয়ায় জখম করি সাতজনায় ।
তকলিতে সুত-সুতলি কেটে লম্বমান
তাঁতঘরে যা তৈরি হলো জিনিসখান
পটকে দেবে মোল্লাহাটির কন্তাপাড ।
জলপানি দে মুড়কি মুড়ি বস্তাভার,
দিনমজুরি—তাও বেশি না! তিন টাকা,
হাওড়া হাটে বিকিয়ে যাবে—ঘর ফাঁকা !
হপ্তাশেষে আসবে ফিরে মংলাহাটি,
ছড়ার বুড়ি ছ ছ'টা দিন জাবর কাটি ।

মন-ভাল-করা

মন-ভাল-করা রোদ্দুর কেন ।
মাছরাঙাটির গায়ের মতন ?
দুধ দীর্ঘ নীল-নীলান্ত
কেন ওর রং খর ও শান্ত,
লাল হরিদ্রা সবুজাভ বন ?
মন-ভাল-করা রোদ্দুর কেন
মাছরাঙাটির গায়ের মতন ?
মাছরাঙাটির গায়ে আলো পড়ে
হাওয়ায়-বাতাসে পাতারাও নড়ে,
মাছরাঙাটির গায়ে হাওয়া পড়ে ।

মন-ভাল-করা রোদ্দুর কেন।
মাছরাঙাটির গায়ের মতন ?

রাজকাহিনী

তেজপাতার কাঁচা পাতা
এলাচ গাছের বন
খয়ের গাছের খোঁটায় বাংলো
দাঁড়িয়েছে কেমন !
চা গাছের চাব্‌ড়া মাথা
বিরোং পাহাড় জুড়ে
সিঁড়ির মতন সবুজ সিঁড়ি
ঠিক্‌রোচ্ছে রোদ্দুরে।
কোয়াশ ফলে বাগান ভর্তি
টোপর ফুলে মউ
দুই টম্যাটো গালের কন্যে—
হবেন রাজার বউ।
রাজার অনেক ভাঙা আরশি—
খেলনা দেশের ঘর
পাহাড় চূড়ায় শতেক গুম্ফা
রঙিন ছিট কাপড়
রাজা সেজে এসেছেন
অনেক দিনের পরে রাজা
ভালবেসেছেন
রাজা সেজে এসেছেন
রডোডেনড্রন পরে রাজা
নাচতে লেগেছেন
তেজপাতার কাঁচা পাতা
এলাচ গাছের বন
খয়ের গাছের চতুর্দোলায়
মানিয়েছে কেমন
রাজায় মানিয়েছে কেমন।

তিতির নামতা

তিতি একে তিতি, তিতি দুগুনে তুই
তিতির খাটের মাকবরাবর
চৌকি পেতে শুই
তিতি ফ্যালে মশারি
কী ভালো খাও, খেসারি ?

তিতি যাবে কাজ করতে সঙ্গে যাবে কে
জগাই মাধাই দুই পালোয়ান কোমর বেঁধেছে
কোমর বেঁধেছে রে ওরা কোমর বেঁধেছে

কোমরেতে বস্তা পড়ে কুমড়ো ধরেছে
ঐ কুমড়ো রাঁধুন বাড়ুন ঐ কুমড়ো খান
ঐ কুমড়ো খেয়েই তিতি মাসির বাড়ি যান
তিতির বাড়ি নদীয়ার
মাসির বাড়ি যদি ? আয় ।

মুখের মতন মিষ্টি

মুখের মতন মিষ্টি কি আর কিচ্ছু আছে ?
আমার কাছে, তোমার কাছে, তাদের কাছে !
কিচ্ছুটি নেই কিচ্ছুটি নেই কিচ্ছুটি নেই
কথায় কোনো মিচ্ছুটি নেই
মুখের মতন মিষ্টি অমন বিচ্ছুটিও !

সন্ধে হলেই ঠ্যাং ছড়িয়ে কাঁদতে বসে ।
ভূতপেরেতের নিবাস কাছের এক কোরোপেই—
এবং অন্ধকারের ভিতর ব্যাঙবাবাজি
ঘ্যাঙোর-ঘোঙর আওয়াজ করে গাইতে থাকে,

টপ্পা ঠুংরি খেয়ালখুশির কুম্ভীপাকে ।
কোন্ সাহসী একলা বসি' দাবার ধারে,

ইচ্ছে মতন সাহস পাইলে পাইতে পারে—
অমন সময়।

ওগো পউষা পাব্বুনী !

দিগরিয়ার পাহাড় দূরে সাঁওতালি পরগনার
পউষা পাব্বুনীর দিনে জাগায় পিঠের নোলা
খেজুর গাছে হাঁড়ি বাঁধে মনের আপনজন
নেই-রোদ্দুর আকাশখানায় পায়রা বসে গোলায়।
দে ধান, দে ধান—ক'রে ওরা ধান-রোহিণীর পাটে
নিমডালে হিম ঝরিয়ে গেল দেওতাধরের ঘাটে।

দেওতাধরের তালডাংরায় মেঘ করেছে জড়ো
ভুসভুসা জল আর অবিচল বাতাস কেমন তরো
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, পাঁঠার মতন ক্ষেপে
বিষ্টি পেলে উঠবে মাটি তুলোর মতন ফেঁপে
তুলোর ভেতর ঝরাবো
মাস কলায়ের নওলা ফাঁস মাটির হাতে পরাবো
কেউ হবে না বেড়ি
হাঁক দিলে ডাক অম্‌নি দেবে, করবে না কেউ দেরি।
দিগরিয়ার পাহাড় দূরে সাঁওতালি পরগনার
পউষা পাব্বুনীর দিনে জাগায় পিঠের নোলা—
কবে পউষা পাব্বুনী ? কবে পউষা পাব্বুনী ?
অগাহায়ণ মাসের শেষে তোমার শুরুৎ শুণি—
অগো পউষা পাব্বুনী ?

ইলিশ

বাজার ভরা কানখোলা কই
বাজার ভরা কাত্‌লায়
দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি পেলে
ইলিশ পাঠায় মাত্‌লা।
ইলিশ রুপোর ইলিশ
কেমন করে গিলিস
একলা একা সব না খেয়ে
আমায় কিছু দিলিস।

টেবোর জঙ্গলে

টেবোপাহাড় চুড়োর ওপর বনবাংলো থেকে
পাকদণ্ডি পাহাড়ি পথ যাচ্ছে এঁকেবেঁকে।
পাহারাদার আমের বাগান, ভূতলস্পর্শী কুয়ো
শালিখ টিয়া বাবুইপাখির সঙ্গে আচাভুয়ো।

টিলার নীচে ঝর্না ঝোবা তাই সেখানে আসে
বাঘ ভাল্লুক জংলা হরিণ সবাই বারমাসই।
গভীর রাতে হায়না ডাকে আর ডাকে সম্বার,
বাতাস এসে ঝাপটা মারে, ভাঙলে বুঝি দ্বার।

বেশ পুরাতন বাংলোখানির ফায়ারপ্লেসের পাশে
সবাই মিলে জটলা করি শীতকাতুরে মাসে।
উপরে আছে ভিউ-পয়েন্ট, সেখান থেকে আলো
নিচের দিকে ফেললে, বনের সবটা দেখায় ভাল।
কী যেন ওই হঠাৎ সরে, কার যেন চোখ জ্বলে।
স্পষ্ট দেখা যায় না কিছু টেবোর জঙ্গলে ॥

অথ নয়ন-কুসুম কথা

মায়ের সঙ্গে থাকতো ছেলে আমড়াতলায়
খাপড়া চালের ছোট্ট বাড়ি, রোদ ঢোকে না।
উঠোন ভ'রে থাকতো শাদা সজ্‌নেফুলে
মৌমাছিরা গুনগুনাতো ধিন্‌ তা ধিনা।

চক্ষু দুটি নষ্ট তাহার জন্ম থেকেই
কষ্ট ক'রে হাঁটতে হতো দেয়াল ধ'রে
হ্যাংলা ছেলে প্যাংলা ছেলে, বলতো লোকে
ঘাস-বিচালির মতন বাড়তো এমনি করেই।

মা নিশিদিন খাটনি খাটে লোকের বাড়ি
টুকরো-টাকরা, ঠিকে ঝি-এর মধ্যে নামী
চট্‌-ঝটিতি কাজ পেয়ে তার তুষ্ট সবাই
সবার বাছাই, আমড়া-বামী।

প্রথম প্রথম সঙ্গে নিত নয়নকে তার
পায়ের গোছে বাঁধতো দড়ি আটকে দিত
কাজ ফুরুলে কাঁকাল চেপে অন্য বাড়ি--
একলা মানুষ, নয়নকে তার কে দেখিত ?

দেখার যে সে পালিয়ে গেছে, গর-ঠিকানী
কারণ তো নেই কারণ তো নেই কারণ তো নেই
মুখ বুজে সব সহ্য করে আমড়া-বামী
শুদ্ধ নয়ন অন্ধ ? তা হোক পুত্র বটেই।

ভগবানের কাছে নালিশ করবে কতো ?
ঢিব-কপালে যা পেয়েছে যথেষ্ট তাই,
গতর ঠেলে বাঁচতে পারা অল্প তো না
পান্তা ভাতে নুন জোটে তো ? ওইটুকু চাই।

পুজোর আগে ঘোষাল গিন্নি নতুন জামা
গেঞ্জি-ইজের বিছিয়ে দিতেন শক্ত দেখে,
এখন তিনি কাশীবাসী, কপাল মন্দ
এবার পুজোয় নতুন জামা দিচ্ছেটা কে !

নাম রেখেছে 'নয়ন' বামী দুঃখ করে,
এইটুকুনই পক্ষপাতের বিরুদ্ধতা।
পাশের বাড়ির কুসুম ওকে পদ্য পড়ায়
লেখাপড়ায় কী মমতা!

শুনে-শুনেই শিখছে নয়ন পদ্যপঠন,
নানান দেশের গপ্‌্গো-কথা মুখস্থ তার,
নামতা জানে, কাজ চালানো হিসেব-নিকেশ,
দেশের কথা, একটু আধটু, ঠোঁটস্থ তার।

এমনি করে জলের মতোই যাচ্ছিলো দিন
কুসুম-নয়ন নয়ন-কুসুম একটি দাঁড়ে—
হঠাৎ বয়েস বললো : তফাৎ রোক্‌কো গাড়ি—
সহজ ফুলের বাগান ভাঙে ক্ষিপ্ত ষাঁড়ে।

নয়ন বলতো, কী কথা তাব লিখতে হবে
কুসুম ফি-দিন লিখতো চিঠি ঠিকানাহীন,
—কাজ তো তোমার শেষ হয়েছে, এখন ফেরো
বাবা, বাবা—বহুৎ কষ্টে কাটাচ্ছি দিন।
ছিন্ন চিঠি রাখতো নয়ন কাঁথার তলে
সেখানে তার শয্যা ছিল ছেঁড়াখোঁড়া
—আমার ভ্রমণপর্বটি শেষ, ফিরে এলাম
কুসুম জানায়, আত্মঘাতী নয়ন ছোঁড়া।

দড়ির ফাঁসে শেষ করেছে ধুকপুকুনি
কারণ তো নেই কারণ তো নেই কারণ তো নেই
ছিন্ন চিঠি ছড়িয়ে দিলুম বুকের পরে—
আগুন তো খায় সব কিছুকেই ॥



সন্ধ্যার সে শান্ত উপহার

সূচিপত্র

একা গেলো

চুম্বন করিনি আগে, ভুল হয়ে গেছে
গ্রহণ করিনি আগে, ভুল হয়ে গেছে
তেমন বাসিনি ভালো, ভুল হয়ে গেছে
বিসর্জন দিতে আজ গরম পাথর
বুক ভেঙে ওঠে
পাথরে পাথরে লেগে জেগেছে চিকুর
মুখময় অশ্রু যেন জলপ্রপাতের
প্রসন্ন আদলে গড়া
বৃষ্টি হোক, বৃষ্টি হয়ে যাক্
আকাশ খোলসা হবে
পাথরের ক্রন্দন জরুরি
এ-সময়ে
কাঁদে, ঘিরে ঘিরে কাঁদে
ঘুরে ঘুরে কাঁদে
শবদেহ, মৃন্ময়ীর—
শান্ত শব দেহ
মুখশ্রী সিঁদুরে
গরবিনী
শুয়ে আছে
একাকী, আগুনে ছাই হবে ব'লে
আছে, জীবন বিচ্ছিন্ন
মাটি-প্রতিমার মতো
মৃন্ময়ী, যথার্থ নাম !

চুম্বন করিনি আগে, ভুল হয়ে গেছে
গ্রহণ করিনি আগে, ভুল হয়ে গেছে
তেমন বাসিনি ভালো ভুল হয়ে গেছে
[দীপক চুম্বন করে মৃন্ময়ীর মুখ]

দুহাতের মধ্যে করে মুখশ্রী স্থাপিত
[উন্মাদ চুম্বনে ভ'রে প্রয়াত শ্রীমুখ
মাতালের স্খল পায়ে ছেড়ে চলে যায়
চিতা, মাতৃমুখী...

আবার জঠরে]
সর্বত্র গুঞ্জন, ছীঃ ছিঃ একী ছেলেখেলা !
একী রঙ্গরসিকতা, ভাঁড়ামি শ্মশানে ?
পবিত্রতা নষ্ট, ভ্রষ্ট চ্যাংড়াদের হাতে !
ডাকো কোতোয়াল, একে বন্দী ক'রে রাখো
শাস্তি দাও, মর্যাদা ভেঙেছে
হাতকড়া লাগাও, ওকে পিছমোড়া বাঁধো
শয়তান, লাম্পট্য ক'রে পার পেয়ে যাবে
আমাদের হাত থেকে ?
কবতে নিকেচে !
বলে, বিদেশেও নামী
ঝাঁটা মারি ওই নামে
শেয়াল শয়তান !

[মৃন্ময়ীর স্বামী, দিবা, উঠে এসে বলে :
এখানে গোলমাল নয়, ও ঠিকই করেছে
অধিকার বোধে ঠিকই চুম্বন করেছে
এখানে গোলমাল নয়, ওর ভালোবাসা
আদান-প্রদানে, কখনো বিশ্বাসী নয়
ওকে শক্ত চেনা, শিকড় কী ভাবে বুঝবে
উচ্চ বৃক্ষচূড় ? বোঝা যায় !
ছেড়ে দাও ওকে, একা
আজ একাকী হলো
ও আর মৃন্ময়ী ছিলো প্রকৃত দুজন
মনে মনে।

টালীগঞ্জে বসে আছে ঝুল বারান্দায়
দিব্য ও দীপক
সামনে আদিগঙ্গাজল কাদা মেখে ঘোরে
জোয়ারে, ভাসন্ত ফোলা কুকুরের মাংসে কাক
মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরে নেয় ।
দূরে পাতা পোড়া গাছ নারকেলের
ডেকলোয় শকুন
গোদা চিল চক্রে উড়ে
স্থানীয় না-জানা ব্যথা

চাগিয়ে ছড়িয়ে দেয় একটানা কর্কশে
অনেক অনেকদিন বসে থাকে দিব্য ও দীপক
এইখানে। মৃন্ময়ীও বসে।
: মৃন্ময়ী শোনাও গান, ভারি মন খারাপ।
: সে তো পারপিচুয়াল, নতুন তো নয়।
: নতুন তো কিছু নেই, দিব্য, তুমি বলো
কীভাবে নতুন হয় প্রকৃত পুরনো
: মিনু, তাও জানে।
ও শুধু তোমার সঙ্গে তর্ক করে সুখী।
: মৃন্ময়ী সমস্তে পায় সুখ।
আশ্চর্য প্রতিভা ওর—
সুখ শান্তি নিংড়ে আনে এমনও কি ঘোরা গঙ্গা থেকে
: নিংড়ে আনা আর্ট মশাই, সবাই পারে না।
: তাই—তো তোমাকে ভালোবাসি
এত্তোখানি [হাত-ফাঁকে দেখায়]
: মরে যাই, মরে যাই...
ভালোবাসা খুচরো পয়সা নাকি
খালধারে কলমী দাম, হিঞ্চের দঙ্গল
এতো শস্তা! বলে দিলে হলো!

বাড়িতে মৃন্ময়ী নেই, দাগ রয়ে গেছে

কাঁচামিঠে পথে যেন শকটের দাগ
বলে গেছে, কোন্ দিকে? ক্ষুৎ পিপাসায়
নয়, কোন কাজে কর্মে এবং অকাজে
সহজ যাবার দাগ, তেমনি মৃন্ময়ী
দাগ রেখে চলে গেছে ভিতরে-বাহিরে
দেয়ালের ঘুঁটে-খসা সে ভীষণ দাগ
ইঁট সরে গেলে পাংশু ঘাসের তল্লাট
যেমন হা হা-য় ভাসে, তেমনি সংসার
রক্তহীন, প্রাণশূন্য, স্বজনরহিত!

[আলোচনা করে, যাবে, সে-বাড়ির দিকে
আসন্ন কাল বা পরশু, ফুরসুত মতন
যেতে হবে।
মৃন্ময়ী হঠাৎই গেছে অগোছালো করে।

কিছুটা গোছাতে হবে, জীবিতেরা চায় !
মুছতে হবে পদছাপ, হস্তাবলেপন
নানাস্থানে, পেটিকোট শাড়ি জামা সবই
গুছিয়ে তুলতে হবে তোরঙ্গেতে ওর,
ডালায় লিখতে হবে—মৃন্ময়ী, মৃন্ময়ী
রাখতে হবে ভাঁজে ভাঁজে শংসাপত্র, চিঠি ও কাগজ
ব্যবহৃত গন্ধদ্রব্য, চশমা ঘড়ি, রঙিন রুমাল—
এইসব ।]

: দিব্য, কেন নিজেকে জ্বালাবে ?
: জ্বলতে দাও, জ্বলছে মৃন্ময়ী ।
: জীবন্ত জ্বলেনি
: পাপক্ষালন হোক, যদি হয়, অন্যথা করো না
অন্তত কয়েকটি মাস, দু-এক বছর
বুকের ভিতরে চিতা বাতাস নাড়ুক
পারে তো ওড়াক ছাই, পোড়াক সুস্থিতি
বেওদণ্ডী করে দিক মৃতা যাযাবরী
দূর থেকে
জানো, দেখেছিলো ফ্ল্যাট, ছোট্ট ছিমছাম
দক্ষিণের দিকে
পরিকল্পনা ছিল ছবিতে সাজাবে
টেরাকোটা ইঁট এনে বসাবে দু' দেয়ালে
অর্কিড ঝোলাবে থামে পোর্সেলিন-টাবে
ইস্কুলের চাকরি ছাড়বে, রঙের সমুদ্রে
ব্রেস্ট স্ট্রোক দিতে দিতে ভেসে যাবে একা
সাফল্যে, সুদূরে ।
বলেছিলো, কথা দাও, তোমরা দাঁড়াবে
সমুদ্রের তীরে এসে, সারিবদ্ধভাবে ।
জানো, একা কোনো কিছু আমার লাগে না
ভালো ।

সুতরাং, একা চলে গেলো
বসন্তের কূটকচাল
লাগাতে পারবে না ভালো, এই ভেবে, একা চলে গেলো
বলেও গেলো না ।
বড় বেশি বাঁচতে চেয়েছিলো ব'লে

চলে যেতে হলো।
যেতে এ ভাবেই হয়
চাও বা না-চাও
একা গেলো, দোসর নিলো না।

বাইশ বছর পরে

এক একটি সকাল দেখে মনে হয়, অনির্বচনীয়
দিন খুলে-মেলে ধরবে ক্ষণগুলি পাতার মতন
এই মনে হওয়া কোনো কারণ জানে না
শুধু অনুভব করে আক্রান্ত রোদ্দুরে
অংকুর আসার মতো উৎসব সংকেত
অকস্মাৎ।
মন হয়ে ওঠে রংমশাল!
অথচ গলিতে পড়ে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো রোদ
প্রতিদিন, ইতস্তত, যেন জমাদার নিয়ে যাবে
ঝাঁট দিয়ে হাত-কোদালে জঞ্জাল সমেত।
সামনের দেওয়াল জেলের পাঁচিল
এলা রং গিয়ে অবহেলা রং-এ সমান উদ্ধত।
পাশেই নগণ্য বাসা, বারোয়ারি ঘুম থেকে
জেগেছে এখনি।
কলের জলের শব্দে সুদূর ঝর্নার
ঝরা ও মধুটে স্মৃতি, পিঁপড়ের ব্যস্ততা
ঘর থেকে টপকে যায় রেশনে বাজারে
প্রাণ ধারণের জন্যে পায়ে পায়ে গলির জীবন
পথে। ধীরে ধীরে। পথে।
আজ একটি সকাল দেখে মনে হয়, সুঘটনা কিছু
ঘটতে চলেছে, ঘটবে। আকাশের কপাল লিখন
পড়তে পারছি অনায়াসে, অথচ কারণ জানা নেই।

[আপিসে নানান কাজে ব্যতিব্যস্ত, বেলা চারটে বাজে।
মামুলি খবর নিয়ে কাগজ প্রস্তুত
পথ-দুর্ঘটনা নেই, চুরি ও ছিনতাই
আছে, শিলান্যাস করতে মুখ্যমন্ত্রী গেছে
দার্জিলিং।

দৈনিক হত্যার কোপে গৃহবধূ নিয়ে
মামলার ডিটেল আছে। অশোক মিত্রের
কেন্দ্রের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি আর সভাসমিতির
কলামে 'কবির সঙ্গে একটি সন্ধ্যা' নিয়ে বিজ্ঞাপন !
রিসেপশন থেকে ফোন : অমিতাভ বসু।
উপরে পাঠিয়ে দিন।
কোন্ অমিতাভ ?
কতগুলি অমিতাভ সচল রয়েছে ?
বাল্যের অমিত এসে প্রৌঢ় অমিতের
গা গতরে ধাক্কা মারে, ঠেলে ফেলে দেয়।
প্রকৃত কে অমিতাভ, দেখলে, টের পাবো
নিশ্চিত।]
আরে, তুমি অমিতাভ, দীর্ঘদিন বাদে
কী ব্যাপার ? ভালো আছো ? শুনেছি জার্মানি
গিয়েছিলে, তারপর... ?
অমিতাভ : তারপর, এখানে, পুরনো জায়গাতে আছি।
তোমার এখানে সপ্তায় দুবার আসি, মনে আসতে হয়
অবশ্য, সন্ধের আগে আসতে পারি না
তুমি তো চারটেয় যাও। খবর নিয়েছি।
তারপর, শরীর... ?
—আছে কোনোমতে।
মহেন্দ্র দত্তর ছাতা জোড়াতালি দিয়ে আর
সুনামে যদ্দিন যায়। বাড়ির খবর ?
অমিতাভ : [জনান্তিকে। এখনো ভোলোনি ?
বাড়ির খবর মানে, জানতে চাও, সুতপা কেমন ?
কী যে লাভ শুনে, ভালো আছে !
ভালোই থাকবার জন্যে জন্মেছিল। —
তাই ভালো আছে, এ কথা যাবে না বলা।
খুব ব্যথা পাবে।
কিশোর বেলার প্রেম খুবই ব্যথা পাবে।
সুতপা, শুধুলে বলে—এতোটা জানতো না,
হতে পারে। লাজুক মানুষ
এই বিশ্বজিৎবাবু, হয়তো স্পষ্টত
কখনো বলেন নি কিছু, চাহনি বলেছে
ব্যবহার ধরা দিয়ে গিয়েছে নিশ্চিত
বহুবার।]

বাড়ির খবর ভালো। সুদিদি এসেছে।
—কোথায় ?
আজ দিনটা আছে। কাল চলে যাবে।
ওর খুব ইচ্ছে, যদি তুমি আসতে পারো
আমার বাসায়। রাত্রে খাবে।
এখন, বিশেষ করে সে জন্যেই আসা
বলেছিলো, দেখা করতে আসবে নিজে তোমার আপিসে
—সে কী ! আমি যাবো, বলো
সুধন্য এসেছে ?
—না, দিদি একলাই।
দুদিন দিল্লিতে ছিলো।
ভোরের ফ্লাইটে কালকেই পৌঁচেছে এসে
এসেই বলেছে, যদি পারে—
না পারলে আমিই যাবো।
কাল চলে যাবে। আমার ঠিকানা—
নাও, ওদিকে তো গেছো
ফুলবাগান মোড় থেকে প্রথম ডানহাতি
দু-তিনটে বাড়ির পরে—
নাকি, নিয়ে যাবো ?
বলো তো ছুটির পর তুলে নিতে পারি
—তাহলে ভালোই হয়।
অফিসে থাকবো না,
খানিকটা এগিয়ে থাকবো—
অমুক বইঘর, তুমি এসো
কিছু কাজকর্ম আছে
তুমি এলে তখনি বেরোবো
ঠিক আছে।
বাইশ বছর পর দেখা হবে। সুতপাই পারে
এমন বিচ্ছিন্ন ডাল জোড়া দিতে ! কাজেও লাগবে না
জেনে, কী কারণে আজ ইচ্ছা হলো একান্ত দেখার ?
অর্থ বোঝা ভার, তবু দেখা দিতে হবে।
যদি দেখা না-ই দিই, কোথাও পালাই !
পালাতে বা কেন হবে ? যদি ঠিকানায়
না গিয়ে কোথাও যাই, অমিত পাবে না
হদিশ সন্ধ্যায়, তবে একা ফিরে যাবে
যেভাবে প্রত্যেকদিন যেতে হয়, আজ কিছু আলাদা

গৃহ পরিবেশ তার ।
বাইশ বছর বাদে সেখানে একজন
আরেক জনের দেখা পাবে বলে অপেক্ষায় আছে ।
কীভাবে নিশ্চিত জানে আজ দেখা হবে
বাইশ বছর বাদে দেখা হওয়া এতোই সহজ
সেদিনের মতো ?
কিন্তু, ও তো নিশ্চিন্ত রয়েছে ।
কীভাবে এমন জোর পেয়ে গেছে সুতপা, কিছুতে
বোঝার উপায় নেই । দেখতে যেতে হবে ।
[বইঘর । টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্তর বই কয়েকটি কলম ।
অতসী কাচটি যেন পেপারওয়েট
সংশোধন করতে-করতে বিশ্বজিৎ চকিতে তাকায়
বাহিরের দিকে । সন্ধ্যা তখনো নামে নি ।
আলো আছে ।
অন্যদিনকার মতো সংশোধন মগ্ন হওয়া কিছুতে যাচ্ছে না
তাল-ছন্দ কেটে যাচ্ছে মনস্ক কাজের ।
টেবিল ল্যাম্পের আলো জ্বেলে দেয়, মুহূর্ত নেবায়
মুহুর্মুহু সিগারেট জ্বলে ওঠে । মরে ঘাড় গুঁজে
অ্যাসট্রে উপচিয়ে পড়ে ছাই, তামাকের গুঁড়ো আর
অসহিষ্ণু আঙুলে কাগজ ।
পদশব্দ । আসে অমিতাভ ।
অমিতাভ : দেরি আছে ?
—এই হয়ে এলো । চা খাও তত্‌ক্ষণ ?

—বলো । খুব দেরি হবে ?
—মোটেই না । আচ্ছা, অমিতাভ
সুতপা এখনো বই পড়ে ?
তাহলে কয়েকটি বই নিয়ে নেবো ।
চেয়েছিলো 'ডান'
তখন পারিনি দিতে, আজ পেয়ে গেছি
জানি না এখন ডান ভালো লাগবে কিনা
বয়েস হয়েছে ।
—পেয়েছো, নিয়েই নাও,
তোমার দু-একটা বই নেওয়া যেতে পারে ?
আমাকে তালিকা করে দিয়েছিলো
আনতেও দিয়েছি, সরাসরি লেখকের হাত থেকে

পেতে ভালো লাগে।

[দোতলার বারান্দায় ঝুলে ছিলো মুখ,
ঠিক তার নিচে থামলো গাড়ি।
বাইশ বছর বাদে অপেক্ষার শেষ।
দুখানি কপাট খুলে দাঁড়ানো স্বভাব
সুতপার
আজও ! তেম্‌নি আছে।]
—কী ব্যাপার, ভালো আছো ?
অবাক লাগছে, না ?
—একটু তো লাগছেই।
কিন্তু, ঘরে যেতে দাও
সিঁড়ির উপর থেকে বিদায় জানাবে
ডেকে এনে ?
—[সরে গিয়ে] খোকা বই এনেছিস ?
—ঠিক সময়ে পাবে,
ব্যস্ত কেন ?
বাইশ বছর পরে ব্যস্ততা কীসের ?
[সকলের অট্টহাস্য, মূলে ম্লানভাব]
—তারপর, কেমন আছো
চার বছর আগে একবার
কলকাতায় একদিনে তোমার আপিসে
অন্তত বিশবার ফোন করে-করে ক্লান্ত হয়ে গেছি
...সাহেব মিটিং-এ
এই ছিলেন, এই নেই...
কী ব্যস্ত-সমস্ত
মানুষ হয়েছো তোমরা
কী কেজো মানুষ ! ভয় করে।
খোকা ঠিক ধরে ফেললো আজকে তোমাকে
কী কপাল ভাবো ?
—কার ভাগ্য ভালো ?
—রক্ষা করো, বলো দুজনের।
—ঠিক তাই। তাই বলা যাবে।
[ততক্ষণে অমিতাভ গেলাস সাজালো
টেবিলে পরের পর।
'স্বাস্থ্যপান করো' তোমরা একে অপরের,

দিদি, বরফ বসেনি, তুই
জল দিয়ে খাবি ?
বয়েসে জলই ভালো, সোডা ভালো নয়,
বিশ্বদা, কী খাবো, সোডা ?
অনীতা এসেছে।
'এই তো খোকার বউ' বিশ্বদা দ্যাখেনি,
ও তোমাকে চেনে।
তোমার লেখার ভক্ত হনুমতী ও-ও একজন।
দ্যাখো সশরীরে আজ তোমার সম্মুখে—
দেবী, পদ্য হচ্ছে ?]
—আমায় ডেকেছো কেন,
কোনো কাজ আছে ?
—আছে বাপু, কাজ আছে
ছটফটাচ্ছো কেন ?
এখনি উঠতে হবে ?
সময় দেবে না
- সময় দিই নি, এই অপবাদ দিতে
তুমি তো পাববে না, আব
যে পারে পারুক
-দিয়েছিলে।
সত্যিই দিয়েছো,
একদিন
[অমিত বিধ্বস্তভাবে তাকায় চাবদিকে,
অনীতা ইশারা করে,
দুজনে প্রগত অন্য ঘবে]
-- বিশ্ব, মনে কবো পাখি ভুল কবেছিলো
সেদিন খাঁচাটি ছেড়ে।
বিশ্বস্ত বাসার সমাদব ছেড়ে পাখি
ভুল ক'রে বনে
মুক্তির আনন্দে ধারাস্নান সেরে নেবে-- তাই
বনে গিয়েছিলো
—এ কথা সঠিক নয়, কিন্তু, কী দরকাব
বিষণ্ণ, স্মাবক সেই সময় জাগানো
এতোদিন বাদে ?
এইই ভালো ডাক দিলে
আমিও এসেছি।

ভালো লাগছে,
তুমি ঠিক সেরকমই আছো
বদল হয়নি কিছু
—স্তোক দিচ্ছো ?
পুরো বদলে গেছি
ফুসফুসে বাতাস আজ যথাযথ পাই না কিছুতে
কষ্ট হয়
যা কিছু এসেছি ফেলে
তার জন্যে ভারি কষ্ট হয়
—কিন্তু যা পেয়েছো, তা তো কম নয় সুতপা, কখনো
আক্ষেপ করো না,
তাতে কষ্ট বাড়ে।
আক্ষেপবিহীন বাঁচা প্রকৃতই বড়ো
সবকিছু চেয়ে পেলে
কোনো লাভ নেই।
না-পাওয়া তাড়িয়ে নিয়ে দিগ্বিদিকে যাবে
জীবনের ধর্ম এই।
ভারি কথা হলো...
[সুতপা নিমগ্ন হয়ে চোখ বন্ধ করে]
—কে আলো নেভালো ? খোকা,
এমন করে না।

অমিতাভ : দূর ছাই, এইখানে কোম্পানি নেবায়
ঠিক প্রয়োজন মতো, ক্লাইম্যাক্সে উঠেই...
—অত্যন্ত ফাজিল তোরা, চলো বারান্দায়
এখানে ভূতের মতো অন্ধকারে
বসাই কঠিন
—চলো
[ছাদের কার্নিশ থেকে চাঁদ দেয় সুতপাকে আলো
যতটুকু প্রয়োজন।
বাইশ বছর ভরা বেদনার মতো আলো সুতপাকে দেয়
চাঁদ, কলকাতার চাঁদ...
ভোলেনি কিছুই।
ঝুলবারান্দার কোণে বাগানবিলাস ফুলে
মারাত্মক মঞ্চ তৈরি হয়,
দুই কুশীলব স্থির, চিত্রার্পিত।

সুতপার হাতে বিশ্বের দু'হাত চলো চলচ্ছক্তিহীন]

—তোমার লেখায় কেন এত অভিযোগ ?
ক্ষমা কি পাবার নয় ?
চেষ্টা করে দেখো।
—চেষ্টা করি, তবু এসে যায়
বারবার চেষ্টা করি, তবু এসে যায়
তুমি ক্ষমা ক'রো

[সুতপার চোখে জল।
বিশ্ব দ্যাখে, বারণ করে না
জল-ঢল নামতে থাকে বুকের উপরে।
বিশ্ব দ্যাখে, বারণ করে না
কেঁদে যদি পরিচ্ছন্ন হয়
হোক]
—বাইশ বছর পরে দেখা হলো, সুতপা, আবার
কবে দেখা হবে ?
—তুমি বলো
—এলে দেখা হবে, যদি ডাকো
চিতা থেকে উঠে আসবো
যদি তুমি ডাকো
—কাজ থেকে ?
—কাজ থেকে আসবো অকাজে
আজকে সন্ধ্যার মতো।
তুমি ভালো থেকো।

একাকী

দেবদারুবীথির ছন্দ ভেঙেছে উইলো ও সিলভার ওক।
ঝাউ ইতস্তত, আছে নানান ক্রোটন, নেবুঘাস...
মাঝখানে পথ গেছে দুপাশের কবর সাজিয়ে
দেয়াল পর্যন্ত, মানে আধমাইল নিস্তব্ধ দুপুর।
রঙিন ঝিঁঝি ও প্রজাপতি বসে ফুলে ও পাতায়
দুরন্ত, পাখায় করে ব্যতিব্যস্ত মৃতের ময়দান।
জীবিত রয়েছে বলে প্রয়াতের প্রতি ব্যবহারে

এ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য নয়, ওড়ার অভ্যাস, খেলাচ্ছল।

নিরুপম-তপতীর স্বেচ্ছানির্বাচিত বেড়াবার
জায়গা এই, নিরিবিলি, জীবনের আতিশয্য নেই
শানপাথরের কোলে শুকনো পাতা পিছু ঘষটে চলে
তন্ময়তা ভেঙে দিতে এরকম শীতল আওয়াজ
বনের গভীরে ঘটে— বহুরূপী ঝটিতি পালালে
পাতার ভিতর। শানে মুখ তোলে শুকনো পাতাগুলি,
নিরুপম তপতীর দিকে চেয়ে হাস্যপরিহাসে
এবং নিজস্ব ভাষা সাংকেতিকে, ছাতারে পাখির
মতন কী কথা বলে, লাফ মারে তিড়িং-বিড়িং!
ঘুমন্ত এ-প্রেতপুরী এসব আওয়াজে আধো জাগা,
তপতী ও নিরুপম আধো আলো, আধেক ছায়ায়
বসে আছে ঠেস দিয়ে পুরাতন দেবদারুগুঁড়ি।

—তপতী, ঘাসের বীজ থেকে ঘাস গজাতে দেখেছো?
—ছত্তিরিশ নম্বর বাসে কী প্রচণ্ড ভিড় ছিলো কাল!
প্রথমটা না ধরলে হতো, মনে হলো; তোমার বন্ধুরা
অপেক্ষায় আছে, বেশি দেরি হলে শাপান্ত করাও
অসম্ভব কিছু নয়, কোন্‌খানে নেমন্তন্ন ছিলো?
আমার বাবার ছবি ঘরে নেই, জানি না কখনো
তোলা হয়েছিলো কিনা। সেজন্যে আক্ষেপ কবা আজ
যদিও সাজে না, তবু, বোকামি, চালাক লোকে করে।
তপতী, নিশ্চয় আছে। এবং জীবিত ব্যারাকপুরে।
একদিন চলো, গিয়ে ছবি তুলে আসি তোমার বাবার?

—হস্টেলে বিচ্ছিরি খাওয়া। আবহাওয়াও অতীব করুণ।
রোববারে চলে এসো, বিকেলের দিকে
দুপুরের সবজি-ডাল একটু রেখে দেবো
খেয়ে দেখো। মানুষে পারবে না
খেতে, বা খাওয়াতে!

—পাটনায় থাকতেন ওঁরা। যেহেতু, মাতাল
আসাই বারণ ছিলো।
দাদুর কড়ার, আমাকে মানুষ করে তবেই পাঠাবে!
তার পূর্বে দেখা নয়, পিতাপুত্রে যোগাযোগ নয়

এমনও কি চিঠিপত্র চালাচালি নয়
কী অসহ্য কষ্ট বলো পুইয়েছে নওল বালক
গ্রামে, পাঠশালা নিয়ে, ইটকাঠ কড়িবরগা নিয়ে।
—তোমার বন্ধুটি বেশ, কথা বলে, যেন হাঁস দেয়
স্বচ্ছন্দ সাঁতার
জলে।
কথা বলে মনে হয় ওর
প্রতিটি বাক্যই বেশ আগে থেকে তৈরি করা ছিলো।
দেখা যে নিশ্চিত হবে— জানা ছিলো তাও।
—গাঁয়ে তো ছিলুম রাজা, কলকাতায় ভিখিরি হয়েছি।
দাদু মারা গেলে পর, তিন কিশোরীর পায়ে পায়ে
ঘুরেছি বারান্দা থেকে ঘরে-বাইরে সজিনা মায়ায়।
তিনজন তিনরকম, ছোটোবড়ো, খেলায় নিপুণা
খেলায় রকমফেরে ধীরে ধীরে পুরুষ হয়েছি।
একথা বলার অর্থ, সব কিছু তোমার জানার
অধিকার আছে। আমি শিশু নই, শৈশবের ছিটে
ছিটাকোকিলের মতো গায়ে লেগে আছে
আশা করি বুঝতে পারছো?

—একদিন কৃতাঞ্জলি, দুহাতে মুখের
চেহারা গালের কাছে তুলে কিছু চুমু খেয়েছিলো।
এঁটোকাটা আমি গিয়ে নর্দমাতে ফেলি।
সুতরাং, কলঘরে গিয়ে মুখ ধুতে ধুতে ধুতে
শরীর শীতল হলো, কিন্তু যে আগুনে
পুড়ে গিয়েছিলো ঠোঁট এবং দেহের অর্ধখান
সে আগুন নেভাতে পারিনি
আজো জ্বলছে।
—পকেটে চকলেট আছে। খাবে নাকি? সিগারেট খাই?

—আমার নিজের মাও অতিবিবাহিত।
অর্থাৎ, বাবার সঙ্গে বনিবনা না হবার পর
তিনিও দ্বিতীয়বার বিয়ে করে, সুখেই আছেন।
যোগাযোগ আছে। প্রতি রবিবার হস্টেলে আসেন
ঘরের বর্ণনা দিই। বাগানের পাশে,
নেবুডাল আঁচড়ে দেয় খোপকাটা জাল
ফুল কিছু গন্ধ দেয় বাসর সাজাতে—

নিষিদ্ধ বাসর।

যে-মেয়ে প্রথম রাতে আমার বিপ্লবী
করে তোলে, তার নাম ? না বললাম নাম।
ধরো ক খ গ ঘ কিংবা ঙ ঞ
য র ল ব হ
ণ-ত্ব ষ-ত্ব বিধানের মধ্যে
কামকুপিতা হরিণী

—দিদিমার কাছে যাই প্রায়ই রবিবার
গড়পার।
দেয়ালের ধার থেকে যাঠকোটা শুরু
একটানা বস্তি জুড়ে বাজে ট্রানজিস্টর
আজানের ধ্বনি খোঁজে ধর্মপ্রাণ কান
যদি জোটে।
মোটের উপর, একটা দিন
হস্টেল জীবন থেকে মুক্ত হয়ে, ঘরে।
—তপতী, তোমার জন্যে একটা কাজ আছে
কিছুদিন করে দেখবে, ভালো লাগে কিনা ?
দক্ষিণী ইস্কুল, ফলে, কেপ্‌পনের জাসু,
পয়সা আছে, দিতে হাত কাঁপে
বলো তো, যাচিয়ে দেখতে পারি।
একবার জীবন থেকে উশিখুশি ভাব
চলে গেলে, ফেরানো কঠিন।
প্রকৃত রঙিন দিন কেটে গেলে পরে
ভূতের মতন দিন আসে দিন যায়
ভবিতব্যহীন দিনগুলি।

—বাগানের জ্যোৎস্না আসে গুটি গুটি গোসাপের মতো
ঘরে, বামপ্রান্তে দুটি সর্বনাশা মোমের নরম
বল, মেটে খয়েরের এক পোঁচড়া কে তাতে লাগাল ?
শ্বাসরুদ্ধ এ-জিজ্ঞাসা নিয়ে খল-ঘুমের ভিতরে
আমার নিক্রান্ত ঘাম, গরম নিশ্বাস
নদীর নুনের নখে পাড় ভেঙে পড়ে অকস্মাৎ
ওলোটপালোট হয় জলে ও মাটিতে
ধুন্ধুমার কাণ্ড হয় জলে ও মাটিতে

জিবে কী প্রচণ্ড স্বাদ, জ্বালা ও কামড়—
তারা খসে পড়ে ব্যতিব্যস্ত নেবুবনে
—আমার প্রথম পাপ।
উচ্চাশা আমার নেই।
এম-এ পাশ করে
যেমন-তেমন হোক চাকরি নিয়ে নেবো
অন্যের সাহায্য নয়, নিজেই দাঁড়াবো
ছোটোখাটোভাবে।
--সেই থেকে প্রতিদিনই মারাত্মক খেলা।

প্রতি রাতে বড়ো হওয়া বুড়ো হয়ে যাওয়া
অভিজ্ঞতা
ভয়, দুঃসাহস কাঁধে তুলে স্তব্ধ মৃত্যুর আক্ষেপ—
বাম স্তনভূমি জুড়ে একা অকিঞ্চন
লোম।
কবরে বিলিতি মাটি ইঁটের উপরে
রেখে, কোন রাজমিস্ত্রি চোখের জলের
মিশেলে তুলেছে গেঁথে চৌকির মতন
মৃতঘর, বুকের উপরে।
অদূরে মাইকেল-মূর্তি, স্তম্ভের পা ছুঁয়ে
শুঁটকো চীনে গাঁদা ফুল রজনীগন্ধার
ততোধিক শুকনো ডাঁটি। পুজো ছিলো কবে?
মনে নেই। ছুঁড়ে ফেলে কাঠিহীন খোল
হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলে, কিনে নিয়ে আসি
দেশলাই, দু মিনিট, ভয় পাবে না তো?
তপতী ম্লান হেসে বলে, বাবাঃ এতোশত পারো
আমি বসছি, তুমি যাও পারো তো বাদাম
নিয়ে এসো ঝালনুন বেশি করে এনো।

বাদামের খোঁজে গেছে কিছুটা সময়
অযথা খরচ হয়ে, রণপায়ে চলেছে
নিরুপম।
কিন্তু, ও কি? ঠিক তার মতো
অন্য একজন বসে তপতীর পাশে।
দুজনে কৌতুকে ভেঙে পড়ছে যেন ঢেউ
হাসি হাসি রাশি রাশি পড়ছে ছিটকিয়ে

সোডার ফেনার মতো।
বিমূঢ় কদমে দু পা, আরো দু পা
তারপরে স্থির
নিজেকে লুকিয়ে রাখে বকুল গুঁড়িতে।
উৎকর্ণ কানের পাশে হাতবোমা ফাটে...
দুতিন বছর গেলো লুকোচুরি করে
অকারণ!
শোনো
স্পষ্ট কথা, আমি শুধু খেলাধুলো
পছন্দ করি না।
একটা সিদ্ধান্তে এসো এবং এখনি।
বিয়ে যদি করতে হয়, করাই দরকার,
এবং এখনি।
তপতী, জবাব দাও, বিলম্ব করো না।
ভাবছো, চালাবো কীসে? না খেয়ে মরবো না
মরণেচ্ছু লোক মরে, মানুষ মরে না।
দুজনেই টিউশনি করবো, সামান্য রোজগার
আছে তো আমার? আমি ও নিয়ে ভাবি না।
ভাববো ছেলেপুলে হলে, তার আগে বিবাহ
অত্যন্ত জরুরি।
—এ কী, ঘোড়া চেপে নাকি!
হঠাৎ হলোটা কী রে? গাঁজা টানলে নাকি?
বুঝেছি, সেজন্যে দেরি, বাদাম কোথায়?
পাওনি? সত্যিই হাঁদা, মোড়ে গেলে পেতে—
চলো উঠি, সন্ধে হলে সুন্দর জায়গাটা
কীরকম চেপে বসে বুকের উপরে।
তোমার এমন হয়?
শাড়ি থেকে ঘাস ঝেড়ে তপতী দাঁড়ায়
কাঁধে ব্যাগ, হাত বাড়ায়, সেই হাত ধরে
অতি-নিরুপম ওঠে, ঘনিষ্ট দাঁড়ায়
চকিতে চুম্বন করে, দূরে সরে আসে।
কপট রাগের সঙ্গে মেশে স্পর্ধাভরা
দমকে দমকে হাঁটা, তপতী এগোয়,
আক্রমণকারী পিছে।
সন্ধ্যা নেমে আসে,
আগলপাগল হাওয়া চূড়া বেয়ে নামে

গাছ থেকে।
বকুলে হেলান দিয়ে আরেক বকুল
ভূতপূর্ব নিরুপম,
দ্যাখে ডালাখোলা সামনের কবরখানি
অন্যথা করে না, সোজা ঢুকে যায়—
ঝাঁপ বন্ধ করে,
একাকী, ভূমধ্য থেকে,
শিয়রে বাদাম, ঝালনুন।

স্বীকারোক্তি

(মধ্যবয়সী ডাক্তার। গলায় স্টেথো॥ দুই ভদ্রলোক আর এক
মহিলাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বাগান দেখাচ্ছেন। শূন্য জাল ঘেরা ঘর
দেখিয়ে বললেন) : ময়ূরও তিনটি ছিলো। অসাবধানতায়
দুটি উড়ে গেছে ভয়ে
তৃতীয়টি কুকুর কামড়ে।
এক হিসেবে, মনে ভাবি, ভালোই হয়েছে
ঘোষপত্র দিতে হতো, পরন্তু লাইসেন্স
নিতে হতো সরকারের কর্মশালা থেকে
কারণ, জাতীয় পক্ষী, কীভাবে রয়েছে
দেখার দরকার। যেন হেনস্তা না করে
কেউ এই পাখিদের।
(রাজহাঁসের ডাক) রাজহাঁস রয়েছে
বেতো রুগী এর ডিম খেয়ে ভালো আছে
দীর্ঘদিন। দিশি মুরগি আছে আর গরু
দুটো স্থূল ভেড়া আছে আর গাছপালা
ফলের ফুলের।
নারকেল সুপুরি এনে আমি বসিয়েছি
বাদাম হরেক, চিকু, আম জাম সবই
রামফল সীতাফল থেকে পেয়ারা ডালিম ফুলের
নিকটে, কাছে এনেছি বকুল কৃষ্ণচূড়া
রবারের গাছ টবে ছোট করে রাখা
—বনসাই লাগে না ভালো, শুধুই শখের
জন্য এই নিষ্ঠুরতা লাগে না
ভালো।
কেমন লাগছে পরিবেশ ? জানি, প্রাকৃতিক খুবই !

ঘর ছেড়ে বেরুলেই সবুজের কোল
কোথা পাওয়া যাবে ?
(সমস্বরে) ভালো খুবই ভালো লাগছে।

ডাঃ : শুধু ওষুধ কি পারে, বিশেষত মনোরোগ !
সহায়তা করে, পূর্ণ সুস্থ হয়ে অনেকে ফিরেছে
সহাস্য সংসারে, আমি তালিকা দেখাবো।
বেয়ারা, লাগাও কুর্সি, লনের মাঝখানে—
চা না কফি ? চাই দাও, আচ্ছাসে বানিও।
(দেওয়ালের ধার ঘেঁষে সিলভার ওক আর সোনাঝুরি।
এখানে-ওখানে শিউলি, বকুল, মাদার
শিরীষ যুবক সেজে এখনো দাঁড়িয়ে
ইতস্তত।
গাছপালা, ভালোবাসা মাখা এই প্রান্তরের পাশে
ছোটো ছোটো বাড়িঘর, খেলার ময়দান
সাংস্কৃতিক মঞ্চ আছে, ধুলো বালিহীন
দক্ষিণা শহরে আছে বুকভরা বাতাস)
হেমেন : কীভাবে হঠাৎ আপনি এখানে এলেন ?
ডাঃ : হঠাৎ ঠিক না। আমি মিশনারিদের সঙ্গে কাজ
করেছি বছর তিন। তারপর, ইচ্ছা হলো খুলি
নিজস্ব নার্সিং হোম। চমৎকার আবহাওয়া সাংগলির
তারপর ধীরে ধীরে ধীরে আজ এই থিতু হওয়া।
এখনো থামিনি, দুটি শাখা খুলে দিয়ে মারাঠী জেলার
মনোরোগীদের আমি প্রাণপণে করেছি
উদ্ধার। উদ্ধার বলেন যদি...
হেমেন : অতীন্দ্র লাগছে তো ভালো এই পরিবেশ ?
খোলাখুলি বলো, যতদিন প্রয়োজন
আমরা এখানে থাকবো।
ডাক্তার বলবেন কতোদিন লাগতে পারে
মোটামুটি, সে হিসেবে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে
আমাদের। পিকো হর্ষ স্রেফ একা আছে
কলকাতায়।
(অতীন্দ্র সম্মতি দেয়, মাথা নেড়ে, বাক্‌স্ফূর্তি নয়।
কাছে দূরে চেয়ে আছে অত্যন্ত একাকী
নিভন্ত লণ্ঠন যেন, খসে পা বকুলের ফুলের মতন
অসহায় ছন্নছাড়া)

(ইলিশেগুঁড়ি শুরু হয়।
পদ্মমানের পাতায় হীরকচূর্ণের মতো পড়ে বৃষ্টিজল
কেঁচো মাটি ঠেলে ওঠে,
শাপলার পাতায় রঙিন মাছের ছানা কিলিবিলি করে
বেতের চেয়ার ঘরে ওঠে।
সেইসঙ্গে চারজন প্ল্যানেটোরিয়াম ঘরে উঠে এসে বসে
মুখোমুখি)।

ডাঃ : এবার বলুন, প্রকৃত অসুখ কার? যথাসাধ্য হবে,
চেষ্টার থাকবে না ত্রুটি, শুধু সহযোগিতা আসল
রোগী যদি ইচ্ছা করে দু হপ্তায় সেরে যেতে পারে
নতুবা ওষুধ-পথ্যে কারো কিছু লাভ নেই।
বুঝে দেখতে হবে, সারবার কামনা আছে কিনা!
দূর থেকে এসেছেন, তাই করবো শুরু আজ থেকে
যদ্দিন বাঁচানো যায়।
অতীনবাবুর সঙ্গে আমি একা কথা বলবো,
আপনারা আসুন। ঘরে পৌঁছে দেবো ওঁকে
আধাঘণ্টা পরে, চিন্তা নেই।
(বকুল তলার বেদী : হেমেন্দ্র মনীষা
তার উপর বসে থাকে স্তম্ভিত পাথর
বকুলের ফুল ঝরে বিকেল বোঝাতে।)

হেম : শেষতক ও যে আসবে কল্পনা করিনি।
কাজের দোহাই পেড়ে টিকিট কাঁচাবে,
যেমন করেছে আগে বহুবার, মনে করে দ্যাখো
এবার অতীন্দ্র যেন সম্পূর্ণ আলাদা
মানুষ

মনীষা : বোধ করি জেনে গেছে, আন্দাজ করেছে
আত্মনির্বাসিত হতে এসেছে এখানে
এবং বলেছে, যদি হেম সঙ্গে যায়
তবে যাবো। নতুবা যাবো না
এতেও কি তুমি বলবে, অতী অতো নিচে
নামাতে পারে না মন?
এ তো শুধু মন নয়, দেহও জড়িত—
ভুলে গেলে?

হেম : হঠাৎ কী করে জানবো, জঙ্গলে হরিণ
পিছু পিছু ধাওয়া করে কতদূর গেছে!
ফিরে এসে দেখলো আমরা যুগল নির্মিত

খাজুরাহো। তবু বলবো, অতীন অনেক
বিচক্ষণ বুঝে গেছে, ফেরার পথও বন্ধ
অন্ধকারে। একরাতে দুবার
নিজেকে আক্রান্ত করতে চেয়েছিলো
ভাগ্যি দেখেছিলে
নতুবা ধমনী কেটে ও নির্ঘাত আত্মঘাতী হতো
এ বরং ভালো হলো
সাপ মরলো লাঠিও ভাঙলো না!
ডাক্তারের সঙ্গে আজই পৃথক বৈঠকে বসতে হবে।
(বকুলের বেদী থেকে সম্পূর্ণ আড়ালে
কৃষ্ণচূড়ার বেদী, বসে আছে অতীন্দ্র, ডাক্তার।)
ডাঃ : বিবাহ কদিন হলো আপনাদের ?
অতী : মনীষাই জানে, আমি ঠিক হিসাবে পোক্ত না।
পিকোর বয়েস ধরে গুনতে পারা যাবে
এখনি দরকার ?
তাহলে ওদের ডাকি ? হেমেন্দ্রও জানে
জন্মাবধি বন্ধু হেম
আমাদের।
সুখে-দুঃখে বিপদে সহায়
সব সময়ের জন্যে।
কাজকর্ম ফেলে রেখে কে আর এখানে আসতো
হেমচন্দ্র ছাড়া ?
ডাঃ : এক্ষুণি দরকার নেই। পরে জানা যাবে।
আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করবো আমি, ঠিকঠাক জবাব
আশা করি পাবো। আচ্ছা, আপনি কখনো
খোলা তরবারি হাতে বাগানে গেছেন ?
দুরকম ফুল ছিলো গোলাপের, তার মধ্যে কাকে
আক্রমণ করেছিলেন, তা কি মনে আছে ?
অতী : চিরশত্রু আমার ও লাল রং, রক্তবর্ণ জবা
তাকেও সংহার করি, নীলাভ প্রেক্ষিতে।
বাগানে সর্বদা থাকবে সুশীতল শাদা
আমি মনে করি, এ তো সহজ বাস্তব।
ডাঃ : কল্পনার রংও শাদা ?
ভেবে কথা বলো।
বয়েসে অনেক ছোটো, তুমি বলা যায় ?
অতী : নিশ্চিন্তে। বলুন।

আমার স্বপ্নের রং সুশীতল শাদা
মশারির ঘেরাটোপে আমি বন্দি আছি
কখনো বা মনে হয় ডিমের খোসার
ভিতরে আমার জন্ম, জন্মান্ধ যেহেতু
মনে হয়, শাদা এক নতুন কাপড়ে
লুকিয়ে আমার দেহ আছে কারো কোলে
চলমান, মাটি দিতে ফিরে যাচ্ছে পিতা
শোক গর্ভ।

ডাঃ : রাগ নেই কারো 'পরে ?

অতী : রাগ দুরকম। একটি প্রাকৃত রাগ।
অন্য সংস্কৃত। কোন্ রাগ চাচ্ছেন আপনি ?

ডাঃ : রাগ দুরকম হলো ? তা বেশ, তা বেশ।
কারো 'পরে ক্রোধ নেই ?

অতী : ক্রোধ ? খুবই আছে। সবই নিজের উপরে।
অযথা সময়ে আসে, তখন সম্মুখে
যার উপর ক্রোধ হবে, সেই-ই পলাতক।
সেজন্যে নিজেকে মারি, যতো পারি, মারি।

ডাঃ : এভাবে কী যাবে দিন ? কতোটা বয়েস
হলো আপনার, নিজের বয়েস কতো ?

অতী : চল্লিশ ছুঁয়েছে আমার মনীষা তিরিশ
পিকো হর্ষ দশ আট। লিখেই রাখুন,
বার বার একই প্রশ্নে আমি বিচলিত
বোধ করি।

ডাঃ : কিন্তু করতে হবে, একই প্রশ্ন বারবার
পিছোলে চলবে না, তুমি রোগী মনে রেখো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হেমেন : প্রকৃত কি ভালোবাসি মনীষাকে আমি
(স্বগত) নাকি নিদারুণ লোভে ওর গোটা দেহ
সর্বস্ব আমার কাছে ! ধানাই-পানাই
করার বয়েস গেছে। এটুকু জেনেছি
(সম্ভবত) ও-ও জানে, ভালোবাসা নয়
ভালোবাসা নয় ঠুনকো পিরিচপেয়ালা
ভালোবাসা ইন্দ্রজাল অতীন্দ্রই ভাবে
বোকা, নপুংসক লোকটা, প্রেমের কাঙাল

প্রেম দেহ-ছেড়ে-ওঠা বেলুন আকাশে—
হতভাগা মনে করে, ক'রে দুঃখে থাকে
আমি যে হিমঘন নই, মনি ভালো জানে।
পকেটে ব্রহ্মাস্ত্র আছে, মনিও দেখেছে
এখন নছোলা করছে— কী হবে, কী হবে
ন্যাকা, মেয়ে মানুষের এ হেন ন্যাকামি
অসহ্য আমার !
ওর হাত দিয়ে আমি অতীকে খাওয়াবো
নিশ্চিত নিশ্চিন্ত বিষ, ব্রহ্মাস্ত্র আমার
ঘুমের বড়ির সংখ্যা বাড়বে একদিন
সেদিন সমস্ত শেষ। শেষ খেলাধুলো
(হেম টস্ করে টাকা, সফল হয়েছে।
হাসতে-হাসতে পাগলের মতো ছেড়ে যায়
মঞ্চ, আলো, বেদী সবই। এখন দুজন
মনীষা ডাক্তার ছাড়া মঞ্চে কেউ নেই)
ডাঃ : কতোদিন হলো ঠিক বিবাহ হয়েছে
আপনাদের ? ভেবো, তাতে এতোই অতিষ্ট
হলেন কীভাবে আমি খণ্ড গল্প শুনি—
আমার সকল কিছু অত্যন্ত গোপন
গোপন রাখাই কাজ পুলিশের মতো—-
(মনীষা সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক-ওদিক
তাকায়। তাহলে, হেম সমস্ত বলেছে ?
বিশ্বাসঘাতক হেম ! ডাক্তার আমাকে
একদিন সময় দিন, সব বলে দেবো।
ডাঃ : সময় একদিন কেন, একমুহূর্ত দেওয়াও যাবে না।
ব্যাপারটা বলুন, একটা হেস্তনেস্ত হোক।
হেমেন্দ্র কি ভালোবাসে অতীন্দ্রের চেয়ে
আপনাকে ? কী মনে হয়, হেম কি সংসার
আপনার জন্যে ছাড়বে, বন্ধুর গেরস্তি
ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে, হেম কি নিজের
সংসার জাঁতায় ভাঙবে ডালের মতন
আপনার মনে কী আছে, করুন খোলসা
এবং এখনি আমি দুজনকে হাতকড়া পরাবো

তৃতীয় দৃশ্য

অতী : কী রোগ আমার ? আমি নিজেই জানি না
ডাঃ : সে জন্যে এখানে আসা, সহযোগ চাই
সবচেয়ে তোমার বেশি । ওদেরও শুধবো
বিশেষত মনীষাকে ।
অতী . আমাকে রেহাই দিন । পাগল রাখুন
আমৃত্যু আমায় । তাতে ক্ষতি নেই কোনো ।
দোহাই আপনার, বেশি জিজ্ঞাসা ওদের
করুন, যে ভাবে চান, যতোভাবে চান ।
ডাঃ : তা কী হয় ? তোমাকেই কেন্দ্র করে সব
আবর্তিত হবে । তুমি খুন করা দেখেছো ?
(অতী কান বন্ধ করে
মুখ পাংশু হয়
বিপুল ব্যথিত চোখ, মুখভঙ্গি ওর)
দেখেছো কী ভাবে পোড়ে ধূপ দেবালয়ে ?
অতী : দেখেছি, লাগেনি ভালো, ভেবেছি দুদিকে
আগুন ধরানো ভালো, এতে কষ্ট কম ।
ডাঃ : ধূপের দুদিক নেই, প্যাকাটির আছে
(মঞ্চের আলোয় ঘুরে এলো বেদী মনীষা হেমের)
হেম : ডাক্তার কদিন রাখবে এবং কীভাবে
অন্যায় আবদার তাঁকে করা যেতে পারে ?
শুনেছি কঠিন লোক, সারাতে সক্ষম
বাতুল পাগল সবই ভুলে যাচ্ছো মনি
অতী তো পাগল নয়, অপরের মতো !
তোমাকে পাবার জন্যে ও খুন করেছে
হিমঘ্নকে ? তার সাক্ষী তুমি ।
বীঅরে মিশিয়ে বিষ ও খুন করেছে
মনে নেই ? তারসাক্ষী তুমি ! সেই থেকে কেমন অদ্ভুত
ধীরে ধীরে বদলে গেলো অতীন্দ্রের মন ।
সংসার বেড়েছে, কিন্তু স্বাচ্ছন্দ বাড়েনি,
তোমাকে সন্দেহ করে বিষ দেবে বলে
সেবারে তো দিয়েছিলে, কার্যত ও দেয় ।
পুলিশের হাত থেকে সেবার বেঁচেছো,
অধম বাঁচালো বলে, এবার বাঁচবে না
অতী সব বলে দেবে ডাক্তারের কাছে

ভেবে রাখো, সেজন্যে এসেছে

মনি : তবে, কী হবে হেমেন ?

হেম : কিছু একটা করতে হবে,
রণকুশলীর হাতে ব্রহ্মাস্ত্র রয়েছে !
(মনি মাথা হেঁট করে বসে করে নিজেকে আড়াল
আলো থেকে সরে আসে আঁধারের দিকে)

জন্মদিনের মঞ্চে

মঞ্চের ভিতরে-বাইরে বাঁশ-ভারা, খসেছে প্লাস্টার
সর্বত্রই খসানো হয়েছে।
পুরনো নতুন হবে বলে এই মাত্র আয়োজন
মিস্তিরিরা দিনশেষে ফিরে গেছে ঘরে
একজন প্রান্তে বসে ছেনি ও হাতুড়ি
বাঁধছে পুঁটুলি করে, সব নিয়ে যাবে তুলে
এদিনকার মতো, কাজ বন্ধ।
মঞ্চে আলো আছে।
জন্মদিন উদযাপনে বসে আছে কবি
মধ্যে সভাপতি, আর দুজন দুপাশে
বক্তা, কবিবন্ধু আর মাইকে ঘোষণা ·
৫০ বছর পূর্তি, এই অনুষ্ঠানে
স্বাগত জানান সভা, মাল্যদান হলো।
প্রিয় গায়িকার কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত
গাওয়া হলো, বক্তারা প্রস্তুত

১ম বক্তা। ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ
এই সভা। বলার বিষয় :
৩০ বছর বয়সী কাব্যসাধনায়
আজকে দাঁড়িয়ে কবি
এই শতাব্দীর সব থেকে কনট্রোভার্সি যাঁকে নিয়ে, তিনি।
প্রথম যুগের এক লিরিকধর্মিতা
এখনো হৃদয়ে বাজে
এখনো সমানে
বাংলার কাব্যমঞ্চে
দুই হাতে ঢেলে
দিচ্ছেন দৈনিক লেখা

অর্থের উদ্দেশে কখনো গমন নয়
কী কৃচ্ছ্রসাধনে এতাবৎকাল
কাটিয়ে পৌঁছান কবি ৫০ বছরে।
প্রথম পর্যায়ে দেখি, এক কিশোরীর
অনবগুণ্ঠিত মুখ, আপন গরবে
গরবিনী, যুবক কবির
প্রেমাকাঙ্ক্ষা ছিন্নভিন্ন
পরন্তু যখনি সাক্ষাৎ-সমীপে যায়
তখনি বিদায়...

জনৈকা। মিথ্যে কথা [প্রেক্ষাগৃহ থেকে
জনৈকা দাঁড়িয়ে উঠে প্রতিবাদ করে]
কবিরা ভীষণ মিথ্যেবাদী
আমার বাসায় যেতো সপ্তাহে দুবার
কখনো-সখনো বেশি
কিছু কথা হতো কিন্তু সে কথা তো শুধুই মামুলি
কলেজের পড়াশুনো নিয়ে কিছু কথা
অবশ্যই হতো, কিন্তু সে তো অস্পষ্টতা
কখনো বুঝিনি ওকে কাঙাল করেছে
আমার উদ্দেশে প্রেম
ভালো ছেলে ছিলো, জানি
বৃত্তিভোগী ছিলো
আমি সাধারণ মেয়ে
কোনোভাবে পাশ করেছি কলেজে-স্কুলে
অতি সাধারণ
মোটা দাগে রুচি ছিলো
থিয়েটার ছবিতে গিয়ে তৃপ্তি হতো খুব
সাজতে ভালোবাসতুম আর ও করতো রাজনীতি
সমাজসেবায় আসতে বলেছে কখনো
আজ ঠিক মনে নেই
তিরিশ বছর!
তিরিশ বছরে মন বেশ বদলে গেছে
কী যে কোথা থেকে হলো বুঝিনি সঠিক
আন্দোলনে জেলে গেছে কিছুকাল হলো
একে তাকে শুধিয়েছি, খবর রেখেছি
ভদ্রলোক যতটুকু রাখে
একবিন্দু বেশি নয়।

মাঝেমধ্যে দেখা তারপর
আমার পৃথক প্রেম অংকুরিত হলে
ওর জন্যে কষ্ট হতো
কেননা শুনেছি,
শুধুই আমার জন্যে তছনছ করেছে
জীবনযাপন, বৃত্তি, লেখাপড়া সবই—
কবি বনে গেছে আর লিখেছে সুন্দর
দোষারোপ করে।
কিন্তু আমি কীসে দোষী ?
আপনারা বলুন।

কবি। আমি বলি অনসূয়া
কোনো দোষ নেই, আজ অন্তত তোমার
আমি দোষী হয়ে আছি
সকলের কাছে
তোমাদের

জনৈকা। এ তো ছেঁদো কথা কইলে
এড়ালে আমার
অভিযোগ।
অথচ কীভাবে সহস্র অজস্র পদ্যে
অভিযুক্ত করেছো আমাকে—
মনে পড়ে ?
কটকে হয়নি দেখা
তুমি গেছো সংবাদ আসেনি
হয়তো ভেবেছিলে আসবো
দুচোখের দেখা দেখে যাবে
ডেকে কথা কইবে না কিছুতে
এতো অভিমান ?
কার উপর অভিমান
সে তো কিছু জানলো না প্রকৃত
তবু সে সন্ধান করে গেছে
খুঁটে খুঁটে দেখেছে কবিতা
কবিতার মধ্যে মূর্তি কখনো-সখনো।
সত্যি কথা বলি নিরুপম
আমাকে চাওনি তুমি, কবিতায় আমাকে চেয়েছো
এ তো খুব শ্লাঘনীয় আমার নিকটে
আমি তো পেয়েছি খুব, জীবনে অঢেল

প্রকৃত আমাকে পেলে তুমি তো লিখতে না
কিছু, যা আমার নেই তাকে নিয়ে
এ যে কতো পাওয়া !
যে বোঝে না সে খুবই দুঃখিনী।
মনে হয় নিরুপম, এর মতো সুখ
জীবনে কখনো পাইনি
মনে হয় নিরুপম এমন দম্ভও
জীবনে কখনো পাইনি।
সুখে আছি, তুমি তা বুঝবে না।

কবি। তুমি বলো, আমি বুঝতে চাই
তুমিই এগিয়ে এসে ডেকে দেখা করেছিলে
দুবছর আগে
পরিতৃপ্ত হাসি হেসে বলেছিলে, রহস্য জমুক।
পঁচিশ বছর বাদে কেন এই ডাক ?
কোনই কারণ নেই, শুধু দেখতে চাই
তোমায় দেখাতে চাই অনুসরণ করি
সাগ্রহে তোমার পদ্য।
বলো খুশি হলে ?
কী সুন্দর সেদিনের সন্ধ্যা কেটেছিলো
সহজে শুধিয়েছিলে, ভুলে গেছি কিনা
ভোলা যায় ? মনে জানতে ভালো--
ভোলা অসম্ভব।
তারপর একদিন দক্ষিণ শহরে
হঠাৎ তোমার দেখা
সমস্ত ওজোর অগ্রাহ্য করেই বললে, চলো বাড়ি চলো,
দেখে আসবে সবকিছু।
কী আছে দেখার ? এ-প্রশ্ন এলেও তাকে
দূরে রাখা গেছে।
গিয়েছি তোমার সঙ্গে
স্থির পিছু পিছু
মন্থর হয়েছো, তবু কৈশোর মায়ার
রেশ রয়ে গেছে দেহে-মনে
আমিও পেয়েছি টের ভিতরে-ভিতরে
কীসের তোলপাড় হয়
কোন্ গন্ধ বাতাসে ছড়ানো ?
বলেছিলে, দেখা হতে পারে

অনায়াসে চলে আসা যায় ইচ্ছা করলে যে কোনো সন্ধ্যায়
আড্ডা মারা যাবে।
কথাও দিয়েছি...
এখনো লোভের মৃত্যু হয়নি ভিতরে
তাই যেতে ভয় পাই।
দেখা হলে রাস্তায়
এখনো বিদ্যুতে মেঘ ফালা ফালা হয়ে উঠতে থাকে
বয়েস যথেষ্ট হলো, তবু কাঁপে মন
একবার যদি মুখ দেখি

জনৈকা। এ তোমার বাড়াবাড়ি,
বুড়ি হয়ে গেছি, কী আছে আমার আর ?
তোমার নির্মাণ সবই
নির্মাণের সঙ্গে কোথা মেলে
আজ এ-মুখের, বলো নিরুপম
আতিশয্য নয়!
স্পষ্ট করে কিছু বলো আমি শুনতে চাই

কবি। সেদিন শোনোনি

জনৈকা। তুমিও বলোনি কিছু।
ভালোই করেছো।
তীব্র কষ্ট পেয়েছিলে একা একা,
বিষণ্ণ পাথরে
ধাক্কা লেগে লেগে হয়তো পাথর হয়েছো
রক্তাক্ত পাথর

কবি। সেই পাথরের কাছে আজ কী আশায় ?

জনৈকা। কোনো আশা নিয়ে নয়
শুধু দেখবো বলে অনুষ্ঠান
আর যদি পড়ো কয়েকটি কবিতা
তাই শুনবো বলে এখানে এসেছি।
চুরি করে কণ্ঠস্বর শুনেছি তোমার
সভা সমিতিতে গিয়ে। সে সব জানো না
ইচ্ছে হতো মাঝেমধ্যে, কথা কয়ে আসি
কিন্তু, যদি নাইই চেনো এই ভাবনায়
স্থগিত ইচ্ছাটি বয়ে ঘরে ফিরে গেছি
একা একা
কণ্ঠস্বর তাড়া করে ফেরে, বিপর্যস্ত গেরস্থালি
তারই মধ্যে পাথরের মতো বসে

অতিদূরে রক্তাক্ত পাথর
কষ্ট পাও ?

কবি। কষ্ট নয়, ভাবতে ভালো লাগে
এতোদিনে তুমি-আমি বিচিত্র মিলনে...
বিষণ্ণ জীবননাট্য মিলনান্ত হলো আজ
অনুষ্ঠানে, পঞ্চাশ বছরে
[পুষ্পস্তবক হাতে আসে অনসূয়া, মঞ্চে]

আবার দোলের দিন, দু দশক পরে

আবার দোলের দিন দু দশক পরে

সেদিন চোখের সামনে ডি সি মাঠ, খাপড়ার বাড়ির
বস্তুত ছাঁচতলা দিয়ে বয়ে যায় রাস্তা মরামের
আঁকাবাঁকা রাস্তা, যেন বোড়া সাপ, দৃশ্যত পারগ
নয় রাগী ফণা তুলতে, কামড়াতে অথবা
বিষ ঢেলে দিতে...

আবার দোলের দিন, দু দশক পরে।

সেদিন উঠোন ভর্তি রাঙা জল, পলাশ কুসুম
দেয়ালে রক্তের ছিটে, মুখশ্রীর উপরে সাবান
ঘুরেও পারেনি নম্র ব্রীড়া মুছে নিতে।
তারো পর, আবীর গুলালে
কেশপাশে বসন্তের হৈ হৈ মুরতি,

কপালে ভোরের বালু, চিবুকে কস্তুরী—
মুখগহ্বরের গন্ধে সন্দেশ লুটোয়।

—সুমিষ্ট চম্বন সেই সন্ধ্যা দিয়েছিলো
বারবার দিয়েছিলো, যেন বোড়া সাপ,
সর্বাঙ্গ জড়িয়ে মুখে দিয়েছিলো মুখেরই চুম্বন,
বুকের সুগন্ধ কৌটো খুলে দিয়েছিলো বাস নিতে,
মর্মর উঠেছে বনতলে নষ্ট শ্বাপদের পায়ে—
কী বাস নিয়েছে যুবা চেতনারহিত !
কানে-কানে কথা, আজ মনে নেই, কিছু মনে নেই

অন্ধ ও বধির মন— কিছু মনে রাখে ?
—কিছুই রাখে না, রাখা, তেমন জরুরি নয় ব'লে
রাখে না কিছুই, রেখে লাভ আছে ? সুখ-স্মৃতি ছাড়া ?
অথবা, বোড়ার বিষে জর্জর, মোহন
পিপাসা, যা অনায়াসে গণ্ডূষে তরঙ্গ পান করে।
তৃষ্ণা কি তাতেও মেটে ? বেড়ে যায় নাকি ?

আর বাড়ে স্মৃতিতে আগ্নেয়
গিরির প্রণতি আর গুরুগুরু মেঘ কাকে ডাকে ?

আবার দোলের দিন, দু দশক পরে।
এবার পর্বত নয়, ঝর্না নয়, জঙ্গলের জল
দুহাতে পিছনে ফেলে পথের সাঁতার— তাও নয়,
এবার গঙ্গার তীর ধরে-ধরে শহরতলির
কৃষ্ণচূড়া ভেদ করে করেছি উন্নত
মাথা, কিংবা মনে নেই, খুঁড়েছি ময়দান
অর্থাৎ ময়দান ফুঁড়ে গিয়েছি দক্ষিণে..

চাঁচড় দেখেছো তুমি ? ভূতচতুর্দশী ?

তবে, ঠিক বোঝা যেতো গিয়েছি কীভাবে।

এই প্রথা, এদিকেও আছে
'হোলি হ্যায়' দেশে আছে, এদিকেও আছে।
বেলকাঠে জোতা হতো পালের আদর,
আবার বাসনা দিয়ে বেঁধে সেই ভূতের প্রকৃতি
পাটকাঠি দিয়ে অগ্নি তখনই ধরানো।
আরো আছে, রংমশাল ফুলঝুরির রাশ
সেই ভূতে গুঁজে দেওয়া, শব্দের মশলা,
ধূপ ও গুগ্‌গুল রাখা বক্ষে ও কোমরে,
দু চোখে পরানো দুটি কাঁচা বেল ফল...
এইভাবে,
ভূতচতুর্দশী রাত যখন ফুরোবে
তখন পূর্ণিমা।

বাল্যকাল, দোলমঞ্চ সব মুছে গেছে
বাসি পলাশের ফুল, তেপলতে, মাদার
কিছু আছে, তবু, কিছু আছে।
ফুলের পতাকা আজো শহরের গায়ে—
কিছু আছে।
সবাই চুকিয়ে পাট যায়নি এখনো
ঠিকে-ঝির মতো।
বাসন-কোসন আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে
কলতলায়, পেছল মেজেয়
কলকাতার গাড়িগুলি কিম্ভূত সেজেছে
বড়বাজারের কানাগলিতেও রাজপুতানার
ঘাঘরা নাচে, ময়ূরবিহীন
পেতলের পিচকারি রাজপুতানীর হাতে
হয়ে ওঠে অসির ঝনঝনা
অম্বর-প্রাসাদে যেন হোলি-খেলা হয়!
আবার দোলের দিন, দু দশক পরে।

রক্তপাত হয়ে গেছে এবার ফাল্গুনে
না, শুধু অরণ্যে নয়, ফুলমঞ্চে নয়,
মানুষের কাঁচা রক্তে ভেসে গেছে নদী
শিশু ও নারীর রক্তে ভেসে গেছে নদী
তাই, বান-বন্যা দেশে, এতো অহরহ!
কার রক্ত নেবে গঙ্গা, কার রক্ত নয়—
এ নিয়ে সংবাদপত্রে ছুৎমার্গী লেখা
প্রকাশিত হতে পারে, প্রকাশিত হয়।
আবার দোলের দিন, দু দশক পরে।

অবনীর বাড়ি যেন, বাড়িখানি এই
মধ্যমাঠে, চরের মতন, হঠাৎই উঠেছে
টিকটিকি উইপোকা এখনো আসেনি
বাড়ির দখল নিতে, বাড়িখানি এই
মুথা নালিঘাস চেপে গজিয়ে উঠেছে।

মেঘের মতন মোষ চতুর্দিকে চরে,
জ্যোৎস্নার ভিতরে বালিয়াড়ি দূরে অন্যান্য দেয়াল,
জলায় কচুরিপানা ফণা তুলে সাপের মতন

কেবল বাতাসে দোলে, দোল খায়, দোল খেতে থাকে।
ভয় চতুর্দিকে, যেন ভয় চতুর্দিকে,
ভয় দেখায়...

তামা ও ভরণে মেশা রাঙা চাঁদ মাথার উপরে
আবীরে গুলালে মেশা রাঙা চাঁদ মাথার উপরে
আমাদের দুজনের দুটি হাত ধ'রে
আমাদের দুজনের চার হাত ধ'রে
জ্যোৎস্নার ভিতরে টানে।
সে-টান সমগ্রে এসে লাগে আর সমগ্রকে খায়
খসে যায় বাঁধা চুল, ডালে ফুল, খসে যায় পাতা
কী আনন্দে চোখ থেকে জল ঝরে আঠার মতন
কী আনন্দে বুক ভরে বৃষ্টি পড়ে আঠার মতন
দুটি ছোট মুষ্টি কেন মন্বন্তর খোঁজে ?
দুটি ছোটো হাত কাঁপে বড়োর ভিতরে,
বড়ো-র অরণ্যে কাঁপে ছোটো গাছপালা,
কষ্ট হয়, সুখ হয়, দেহে-দেহে সর্বনাশ হয়, হতে থাকে।

সন্ধ্যার সে-শান্ত উপহার

দিনগুলো সেই স্মৃতির ঘোড়ায় ছুটছিলো আর ছুটছিলো না
কখন কোথায় থামছিলো তার নিজের ঘোরে
থামছিলো আজ মাঝ-সড়কে, কাল থেমেছে গাছের নিচে
আগামী কাল থামবে, নাকি থামবে না—তা তার অজানা।

তোমার কথা পড়তো মনে, পড়বে না তার কারণ তো নেই !
কিশোরবেলার দরজা সে তো একটি পাল্লা বন্ধ রাখতো
ওপার থেকে একটি মুখের অবগুণ্ঠনমাত্র খুলে
একটি দুটি দয়ার বাক্য, আবছা কিছু বর্ণমালার
পাঁচটি মিনিট, সঠিক স্বর্গ, পায়ের নিচে ঘুরছে সিঁড়ি
নামতে হবে, নামতে হবে, তোমার হাতে সময় তো নেই !
আমার ছিলো একটু সময়, তাই দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলুম
বন্ধ হয়ে গেলেও আমি তন্মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ছিলুম
আমার ছিলো একটু সময়, তোমার হাতে সময় তো নেই !
এইভাবে দিন খোঁড়ার মতন চলছিলো, কি চলছিলো না
এইভাবে 'সে' সেই কথাটি বলছিলো, কি বলছিলো না

কার কী আসে ? কার কী-বা যায় ? কার কেনা ঢেউ কোথায় মিলায়—
কেউ কি জানে ?
সেই কথাটি সত্যিই অনর্থ আনে—
কেউ কি জানে ?

শহর তখন ফুটছে কড়ায় খই-এর মতো
খুঁটছে বুড়ি ঝিনুক দিয়ে পান-ঘামাচি
বেঁচে আছি, বেঁচেই আছি।
গলির থেকে গলগলিয়ে নামছে লাভা
গঙ্গানদী কোল দেবে, তাই থাকছে কাছে
কাক কালো ঠোঁট ফাঁক— দেখাচ্ছে খরার আগুন
তার মাঝে প্রেম ডাক ছেড়ে ঐ কাঁদতে বসে
দাবায়-দাবায় চোখের জলে তুচ্ছ ফোঁটা
পুচ্ছ নাচায় তৈরি ফিঙে ঝোপের নিচে—
অবস্থা এই, মজারু—তার মজাও আছে
আমার কাছে দেশের দুঃখ ভীষণ বড়ো
কিন্তু, চোরাই ঘুণ ধরেছে বুকের মাঝে
আশপাশে চাই, চক্ষু ফেরাই, বৃষ্টি পড়ে...
এই পুড়ন্ত শহরে ছাই, বৃষ্টি পড়ে...
বৃষ্টি পড়ে পোস্টারে, আর বিপ্লবে লাল
ফেস্টুনে রোজ বৃষ্টি পড়ে
কাকভেজা তার মনপবনে বৃষ্টি পড়ে!
পড়ছে পড়ুক
ভরপোয়াতির উবদো পেটে নড়ছে নড়ুক
ইশতাহারের মধ্যে 'বদর বদর' ধ্বনি
সামনে কি জল, সামনে কি ঢেউ, সিন্ধুশকুন ?
ভরপোয়াতির মাথায় উকুন
দুহাত নুলা, কে পরচুলার যত্ন করে ?
অপেক্ষা তাই, যে আসছে তার দমকা ঝড়ে
উড়বে, উড়ুক।

হয়তো কিছুই উড়লো না, বা উড়লো কিছু
হয়তো কিশোর প্রৌঢ় এখন, মুখটি নিচু
তোমার কি আর বয়স হলো ?

ঠিক ছিলো যে থাকবে ঝোলোয়
থাকবে থেমে
পায়ের নিচে সেই তো সিঁড়ি
আসবো নেমে
সেই সেদিনের মতন, একটু থেমে-থেমে
থেমে-থেমেই
আসবো নেমে।
শুনতে পেলুম, তিন শতকের পর ডেকেছো !

বয়েসটা তো কম হলো না
পৌঁছেছিলাম গুলমোহরের পাশটি ঘেঁষে
রাস্তাগুলোর পিচের কালো
এপাশ-ওপাশ ছিটকে গেছে
আকাশে নেই তেমন আলো
দেখতে ভালো, শুনতে ভালো
তেমন আলো নেই আকাশে

বাতাসে কোন্ গন্ধ পেলুম ?
বাতাসে সেই গন্ধ পেলুম
সেই সুবাতাস

হারিয়ে গেলো সেইই চেনা-পথ
কোন্ চেনা পথ ?
গিয়েছিলুম একদা, এক সন্ধেবেলায়
গিয়েছিলুম— তোমার দেখা পেলুম নাকি ?
ঘরের মধ্যে একটি ঘরে অন্য আলো !
আলোকময়ী, তোমার মুখের প্রদীপখানি
জ্বলতে-জ্বলতে নিভলো কখন ?
কখন জানো ?

সামনে বসে, বেতচেয়ারে, মধ্যিখানে বেতের টেবিল
মাথার উপর একলা বাতি
আর যারা সব অন্যঘরে।
তুমি আমায় বললে, ভালো—
কথাটি শেষ করলে না আর, মুখটি নিচু
বলছি আমি, সত্যি ভালোই—কথাটি শেষ, গাছ মুড়োলো

নষ্টে গাছটি।
সন্ধেবেলায় ওইটুকুনিই শেষ উপহার
আর কিছু পাই, না পাই আমি বেঁচে থাকবো
আর কিছু পাই, না পাই আমি সুখে থাকবো...সুখে থাকবো।

ওরা মানুষের থেকে বড়ো হয়ে আছে

গাছের ভিতরে কিছু ভেদাভেদ আছে।

শালের জঙ্গলে নেই অন্য কোনো গাছ
তা কি শুধু শোভা, শুধু সৌকর্য একক,
নাকি শাল অন্য কোনো সংশ্রবে বাড়ে না,
একাকী জঙ্গলে বাড়ে, মরেও একাকী।
শুধুই বার্ধক্যে নয়, বাজ প'ড়ে মরে
তখন ধূপের গন্ধ, ধুনো গন্ধে ঘোর
জঙ্গলে পুজোর ঘণ্টা বেজে ওঠে ধীরে—
ঝাঁঝর-কাঁসর বাজে, চালচিত্র দোলে,
পাথর-প্রতিমা সুদ্দু দুলে ওঠে মোহ।
কী মায়া লেগেছে ঐ নীলাঞ্জন-ছায়ে—
মাঝে মাঝে লাগে।

গাছের ভিতরে কিছু ভেদাভেদ আছে
জানি। মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ আছে,
খাদ্য ও খাদকে কিছু ভেদাভেদ আছে,
ভেদাভেদ কোথা নেই? আছে সবখানে।

মানুষের মধ্যে আমি ঘুরেছি অনেক
সেই শিশুকাল থেকে বয়ঃসন্ধি-তক।
অনেক দেখেছি আমি—ঘরে ও বাহিরে
কিছু মনে আছে তার, সমস্ত ভুলিনি।
ভুলিনি বলেই কিছু ব্যবহার আছে—
এলেবেলে, যুক্ত নয়, সম্পর্করহিত,
সৌজন্যমূলক কিছু, কিছু আন্তরিক।

মানুষের মধ্যে আমি ঘুরেছি অনেক,
সেই বয়ঃসন্ধি থেকে প্রৌঢ়ত্ব অবধি।

দেখেছি, মানুষ কিছু কাছে এসে গেছে,
কিছু দূরে চলে গেছে ঢেউ-এর নিয়মে।
আসা-যাওয়া, জানি আমি, অমোঘ দর্শন
মধ্যবর্তী কাজ কিছু করে যেতে পারা
যথেষ্ট, যথেষ্ট—বলে জীবিতেরা হাঁকে।

যতক্ষণ কণ্ঠস্বর যাবত নিশ্বাস...
কিন্তু, কোন্ কাজ তাকে করে স্মরণীয়
এমনও কি নিজগৃহে, নিজের পল্লীতে,
সেকি আগেভাগে বলা কোনো দিন যাবে ?

যাবে না বলেই তাস অন্ধকারে খেলা
হতে থাকে দেশ জুড়ে, ফলের প্রকৃতি
যদিও বা জানা যায়, কেমন আকার
শেষমেশ নিতে পারে, তা কি জানা যাবে ?

বিশেষত সূচনায়, মধ্যদিনে, সাঁঝে,
গভীর রাত্তিরে নয়, ঝরে গেলে নয়,
ঝরা মানে, তার সব সম্ভাবনা শেষ—
স্থগিত-বর্ধন, মৃত্যু, শেষাকার নেওয়া !
তখন, অবশ্য, বলা যায় সে কেমন,
কী ভাবে এমন হলো, তাও বলা যাবে।
অন্তত, সে-চেষ্টা শুধু মানুষেই করে,
অন্য কোনো প্রাণী নয়, উদ্ভিদেরা নয়,
ওরা ভেদাভেদ করে অচেতনভাবে।

শিক্ষাদীক্ষা নাই-ই থাক, স্পষ্ট নীতি আছে,
সে-নীতির স্পর্শ পায় গুল্ম ছোটগাছ
বড় গাছ থেকে, সিংহ আক্রমণ করে—
নিতান্ত হিংস্রতা থেকে নয়, শুধুমাত্র ক্ষুধা থেকে।

মানুষ সুরক্ষা করে গুদোমে-গোলায়
ধান চাল ও সুকীর্তি, ব্যাংকে টাকাসিকি।
গাছের শিকড়ে শুধু মাটি লেগে থাকে,
ক্ষুরে ও থাবায় থাকে লেগে জলঘাস—
বাঘের মস্তিষ্কে কোনো হরিণীর স্মৃতি

আর কিছু নয়, ওরা চায় না মুনাফা,
কেনা-বেচা বলে নেই ওদের বাজারে,
দোকানে ভেজাল নেই খাদ্যাখাদ্যে কোনো
ওরা মানুষের থেকে বড়ো হয়ে আছে
ঝর্নায় জঙ্গলে।
না, কোন শহরে নয়, ঝর্নায় জঙ্গলে
ওরা মানুষের থেকে বড়ো হয়ে আছে।

যাওয়া যায় ?

—এসো, দীর্ঘদিন পথ চেয়ে বসে আছি
তোমার সময় হলো এতোদিনে
আসার সময় হলো এতোদিনে
কতোদিন গেছে, তাও জীবন্ত রেখেছি
দ্যাখো, মুখখানি দ্যাখো, দেখে তৃপ্তি পাও
—তৃপ্তি পাবো ? একী বলছো অনুরাধা
সৌমিত্র হঠাৎ মৃত, তা শুনে স্খলিত
হয়ে গেছে প্রাণমন, জানি না কীভাবে
মৃতের যাবার কথা দুঃখে বলা যাবে
তোমায় ? অথবা কথা বলি মনে-মনে
এভাবে যাবার কথা ছিলো না গোপনে
সৌমিত্রর।

কথা হতো, তারই মাঝখানে
বেদনার্ত ছায়া এসে বসে যেতো কানে
যদি বলি, এ-বিষাদ কেন
এই অফুরন্ত রোদ, সমুদ্র সফেন
বাতাস বহতা, তবে এ-বিষাদ কেন
ও বলতো লাগে না ভালো আমার কিছুই
কিছুই লাগে না ভালো মরতে সাধ হয়
অকারণে।
 —তাই মরে গেলো
মরার অসুখ নিয়ে জন্মেছিলো
 —তাই সরে গেলো।
এখনো জীবন্ত মুখ ফুলের মতন
নিশ্চিন্ত, উদাস মুখ ফুলের মতন

স্পষ্ট ও সতেজ।
কিন্তু, তা কী করে হবে
ও তো দীর্ঘ মৃত !
আমায় দেখাবে বলে শুধু অনুরাধা
বাঁচিয়ে রেখেছে দেহ।
আমি দেখি, মনে হয় সৌমিত্র জীবিত
অভিমান করেনি কি কোনো একটি দিন
অপমান করেনি তো কোনো একটি দিন
সৌমিত্র জানতো সব, মেনে নিয়েছিলো
বলেছিলো, ইচ্ছা হলে তুমি চলে এসো
আমি আছি মাত্র কিন্তু গৃহটি তোমার
—তা কি হয়
—কেন বা হবে না ? আমি বলছি হয়, হবে
অনুরাধা সুখী হয় তুমি এলে-গেলে
কেন বা আসবে না ? আমি সমস্তই বুঝি
ভালোবেসেছিলে, কিন্তু অমিল অসুখে
ভুগে ভুগে মিলতেও পারোনি
আমি তোমাদের মন মেলাতেই চাই
দেহ নয়, দেহ শুধু সম্পত্তি আমার
বিবাহে পেয়েছি, তাই দেহ নিয়ে সুখী
দুঃখ, এ আমার সুখ
আমি জানি সীমাবদ্ধ কতো
—সৌমিত্র মহান তুমি, কতো বড় মন
বারবার ক্ষুদ্র হই তোমার সুমুখে
অনুরাধা বাঁচায়, এতো স্বাভাবিক সুরে কথা বলে যেন
কোথাও গরমিল নেই, অসম্ভব নেই
—সম্পর্ক বাঁচাতে আমি বলেছি অনুপ
সুসম্পর্ক কঠিন জিনিস
দেখো, অপমান যেন আমায় না লাগে
কোনোদিন।
তখন প্রকৃত মৃত্যু নিশ্চিত আমার
এসো সুখস্বর্গ ঘিরে তিনজনে বাঁচি।

বিবাহ বছর দুই, অনুরাধা হয়েছে জননী
আমি প্রায়ই যাই-আসি, শিশুটি হয়েছে ন্যাওটো ঘোর
—এখন খোকার জন্যে তুমি আসো-যাও

এভাবে সাজানো হলে গল্পটি একদিন
চলচ্চিত্রে রূপায়িত হবে
আর সাফল্য নিশ্চিত
—সৌমিত্র বদল হচ্ছে ধীরে ধীরে তোমার মনের
—টের পাচ্ছি
মনে হচ্ছে প্রায়
আমার সময় বেশি নেই
ভয় নেই, তুমি আছো
—আমি তো ছিলাম, আছি
কিন্তু কী নতুন তোমার বদল
কেন ? টের পাচ্ছো কিছু ?
—কী যেন হয়েছে, কিংবা হতেই চলেছে
যা রোখার সাধ্য নেই তোমার-আমার
অনুরাধা বিধবাই হবে।
এবং প্রকৃত ঘটলো সে ঘটনা, ভারি অকস্মাৎ
আকস্মিকভাবে হলো পথদুর্ঘটনা
সৌমিত্র নিধন হলো।
তারপর গল্প অন্যরূপ
অনুরাধা একা থাকে সপুত্র, বিদেশে
একা একা
যেহেতু সৌমিত্র নেই, যাওয়াও কমেছে
হয়তো অপেক্ষা করে আছে অনুরাধা
কিন্তু যেতে পারিনি এখনো
সেদিনের পনে যেতে পারিনি এখনো
যাওয়া যায় ?

সুখে থাকো

চক্রাকারে বসেছি পাঁচজনে
মাঠে, পিছনের পার্চে আলো
অন্ধকার সন্ধ্যা নামে বিড়ালের মতো ধীর পায়ে
তুমি এসে বসেছো আসনে অকস্মাৎ।
হঠাৎই পথে ঘুরতে-ঘুরতে কীভাবে এসেছো
একেবারে পাশে,
তোমার গায়ের গন্ধ নাকে এসে লাগে

বৃদ্ধের রোমাঞ্চ হয় !
খুব ভালো আছো ?
অন্তত এখন, তুমি ?
তুমি ঠিক আছো ?
না থাকার মানে হয়
বিশেষত যখন এসেছো
কৃপা করে ।
কৃপা বাক্যবন্ধ তুমি কিছুতে ছাড়বে না !
ছাড়া যায় ?
কিছুক্ষণ আছো ?
হ্যাঁ, হাতে সময় আছে
তাই, পায়ে পায়ে
এখানে এসেছি চলে ।
শুনেছি, সন্ধ্যার আড্ডা তোমার এখানে
যদি ভাগ্য ভালো হয়, দেখা পেয়ে যাবো,
ভাগ্য ভালো ।
এমনিই এসেছি,
তোমাকে দেখাব জন্যে আজ কটি দিন
কী ইচ্ছা করছিলো ।
জানালে যেতাম ।
কিছুতে যেতে না ।

'কাল আসবো' বলে তুমি পালিয়ে এসেছো
সেই কাল কবে হবে ? ভেবেছি তোমার
সময় অত্যন্ত কম,
আমি নিজে আসি ।
আমার সময় আছে...দীর্ঘ অবসর !
চক্রাকারে বসেছি পাঁচজনে ।
পাঁচজনের মধ্যে থেকে একা একা একান্ত দুজন,
পাঁচজন বুঝেছে সবই
নিচুস্বরে কথা চালাচালি করে যাচ্ছে অহেতুক শ্লথ,
পাঁচজনের মধ্যে থেকে একা একা একান্ত দুজন
অকস্মাৎ ।

ধীরে ধীরে রাত বেড়ে যায় ।
সন্ধ্যার আঁচলে মুড়ে করতল অন্য হাতে পায়—

করস্পর্শ।
পাখির পালক হাত খেলা করে কর্কশ মুঠিতে,
পাঁচজনে সমস্ত দেখে ধীরে ধীরে কোথা উঠে যায়
একাকী দুজনে রেখে।
চলো পৌঁছি দিয়ে আসি তোমার বাড়িতে।
যাবে ?
কেন নয়।
চলো।

একগাড়ি আঁধার আজ দক্ষিণে দৌড়ায়
দ্রুত।
মনে হয়, গতি বড় দ্রুত বিদ্যুতের মতো !
কথা বলো।
কী কথা বলার ?
আছে।
কাছে আছো, এ যথেষ্ট নয় ?
যথেষ্ট যথেষ্ট।
আজ দিন বড় বেশি কিছু দিল।
সত্যি একে দেওয়া বলো এখনো তুমিও।

না বলার সাধ্য আছে ?
বহুদিনই ভাবি, হঠাৎ চলেই যাই, গিয়ে দেখে আসি-
আছোটা কেমন ?
কিন্তু, বড়ো ভয় করে
যদি তুমি কিছু ভাবো ?
অন্যের সংসারে ও কেন হঠাৎ আসে ?
সেই জন্যে ভয়,
জড়িয়ে যাবার ভয়,
মন্দ ভাগ্যে ভয় !
বড়ো দ্রুত যাচ্ছে গাড়ি সমূহ দক্ষিণে

গাড়ির আঁধার হলো হাসিতে উজ্জ্বল
এবং মধুর গন্ধ ছড়ালো বাতাসে।
আবাল্য তোমার কিছু পাওনা রয়ে গেলো।
আমি বলি শোধ হয়ে গেছে।
আজি, এইমাত্র, এই এতো কাছে পেয়ে

জীবনে এতোটা কাছে তোমাকে পাইনি,
একা বহুক্ষণ ধরে গাড়ির ভিতরে।

গাড়ি বাঁয়ে চলো, গাড়ি এখন দক্ষিণে
কিশোর প্রেমের মতো অত্যন্ত রঞ্জিত
এই সুসময় আজ দিনশেষে কেন!

মূর্ছার ভিতরে নেমে, দু'কদম গিয়ে
ফিরে এসেছিলে...
আজ নয়, অন্য একদিন।
আজ দরজা থেকে একা ক্লান্ত ফিরে যাও,
দুর্বলতা গলা টিপে আছে,
আজ নয়, অন্য কোনদিন
আমার সর্বস্ব নিও।
আজ নয়, অন্য কোনদিন...
তুমি হাত দুটি ধরে মুখমণ্ডলের
উপরে আগ্নেয় পাত কেন বা ঘটালে?
সর্বস্ব পেয়েছি আমি আজই, অকস্মাৎ।
সুখে থাকো, আমি ফিরে যাই
একা একা।



এই তো মর্মর মূর্তি

সূচিপত্র

কঠিন অনুভব

চারধারে তার উপঢৌকন, কিন্তু আছে স্থির,
দুহাত মুঠিবদ্ধ কিন্তু ভিতরে অস্থির।
কেউ তাকে দ্যাখেনি হতে, উচিত ভেবে সব
ফিরিয়ে দিল, তার ছিলো এক কঠিন অনুভব।

দু-চার রেখায়

দুচার রেখায় জাগিয়ে দিল তন্ময়তার রূপ,
কী রূপবান, কিন্তু তাকে অসহ্য লাগছে না !
মৃত্যু নামে ছিলো একটি অপার অন্ধকূপ,
মৃত হবার পরেও কোনো আদরে জাগছে না,
দুচার রেখায় জাগিয়ে দিল তন্ময়তার রূপ।

ছেলেটি

[বাপসুর জন্যে]

ছেলেটির রূপ ছিলো কুয়াশার মতন পলকা।
হাসির মধ্যে ছিলো হেমন্তের পাতা ঝরার গান,
তাকে সবাই কেমন আপন করে ভালোবাসতো,
সে জানতো মনে মনে, কোনো ভালোবাসার বেড়ায় তাকে
আটকাতে পারবে না।
কবে যাবে নিশ্চিত করে জানতো না !
তবে যাবে যে একথাটা ভারি নিশ্চিত করে জানতো !
আমি ভালোবাসার খড়কুটো তার ঘরে পৌঁছে দিতাম
সে কিছু মুখে বলতো না, মনে মনে হাসতো,
খড়কুটো নিয়ে খেলা করতো কখনো সখনো,
তখন তাকে দেখাতো এমন সুস্থ
মনে মনে তখনো সে হেসে বলতো, এদের আমার খুবই দরকার আছে।

আমাদের দুজনের দুজনকে দরকার,
একদিন জানো আমি থাকবো না
এরাই বেঁচেবর্তে থাকবে।
ছেলেটির রূপ ছিলো কুয়াশার মতন পলকা।
কুয়াশা কাটার মতো করে একদিন সে চলে গেলো,
কাউকে কিছু বলেও গেলো না।

দুই চড়ুই

জালির নিচে স্থিতিস্থাপক তেমন কিছু নেই।
দুই চড়ুই কুড়িয়ে আনে সমানে খড়কুটো,
বেশির ভাগ ছড়িয়ে পড়ে শীতল মেজেতেই,
গৃহগড়ার শুরুর, মুখে জালির শত ফুটো!
সহসা ডিম ভাঙবে, শেষ কামনা অভিলাষ—
দুই চড়ুই জালির ফাঁকে করুণভাবে বসবে,
একবারের মেলার শেষে দ্বিতীয় হাঁসফাঁস,
খড়কুটোয় ভরিয়ে পাটা দারুণভাবে বসবে—
বাতাস ডাকাতিয়ার হাতে চড়ুইঘর ধসবেই,
দুই চড়ুই কুড়িয়ে আনুক যত না খড়কুটো!

বরেহিপানি বাংলোয়

বুড়াবড়ং প্রপাত যখন নদী হয়েই নামছে—
সামনে খাদ অচল, আমরা অন্য পাহাড়চুড়োয়,
দেখছি চাঁদ উঠছে যেন বাঘের মুড়োর মতন
বাতাস-হাতে ঝাউ-এর পাতা থিরথিরিয়ে কাঁপছে।

এ তো সহজ দৃশ্য নয়, অসহ্য সুন্দর!
বরেহিপানি বাংলো পিছে হাতি ভাঙছে ঘর,
হঠাৎ-আঁকা দৃশ্য এই অসহ্য সুন্দর!

ঠাণ্ডা তার ঝাপট ওতো বুড়িবালাম হাওয়া,
বনবাংলো বারান্দায় হাজার চাওয়া-পাওয়ায়—
পড়লো ছেদ, ভয়ংকর ভয় দেখাও বনে,
শহরে ইঁট সরিয়ে এলো বরেহিপানি মনে।

খেলা

দুই হাতি হস্তিনী খেলা দেখায় বনের ধারে।
খাদ কাটা রয়েছে তাই বেরোতে পারবে না,
বাঘের ডাকে তাদের খেলা স্তব্ধ হলো হঠাৎ!
চোখের উপর হরিণ, জলে চ্যালা মাছের মতন
উঠলো যেন তিড়বিড়িয়ে পালিয়ে গেল বনে।

অগ্রিম

[সন্তোষদার জন্যে]

কীভাবে মুহূর্তে মরছো, বিলাপ করছো না
হেসে হেসে বলছো, দ্যাখ জীবনে একবারই
মৃত্যুর নিকটে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছি!

কে যে কার সন্নিকট বলাও মুশকিল...

কাল যা দেখেছি আজ কৃশ হয়ে গেছো,
কালকের হাসি আজ দুগুণ হেসেছো,

কীভাবে মুহূর্তে মরছো. বিলাপ করছো না।

দুটি হাতের স্পর্শ দিয়ে

দুটি হাতের স্পর্শ দিয়ে আমায় করো জীবন্মৃত
এইটুকুনি অসীম প্রীতি—
দিয়ে, আমায় কেবল করো জীবন্মৃত !

ইচ্ছে ছিলো বেঁচে থাকার, সুখে থাকার,
তার বদলে ভোগ করেছি কেবলি শীত ;
অতল বরফ টানে আমায় অন্য কোথায় !
দুটি হাতের স্পর্শ দিয়ে আমায় করো জীবন্মৃত ।

এই বয়েসে

এই বয়েসে একটু আগুন পেলে আমার লাগতো ভালো ।
যা অবশেষ, কিংবা কালো—
পুড়িয়ে যদি খানিক পেতাম বাঁচার আলো,
লাগতো ভালো,
এই বয়েসে একটু আগুন পেলে আমার লাগতো ভালো ।

কী আর এমন বয়েস তোমার ?
মাথায় ময়ূরপুচ্ছ বাহার,
কী আর এমন বয়েস তোমার ?
নিকটবর্তী শান্ত পাহাড়,
এখন কী সেই যাবার সময়—
অলুক্ষুণে, যাবার সময় ?

আমি আছি ভালো

তুমি যে-শহরে থাকো, সে-শহরে থাকে—
তাই ওকে দিতে হলো অনেক সময়।
ওর ছোট্ট বাড়িটি তো গলিটিরই বাঁকে,
ভালো থাকতে কম জানে, তাই বিপর্যয়।

বলেছি, তোমার খোঁজ তল্লাশ জানাতে,
বলেছি, প্রথমে গিয়ে আমি আছি ভালো
কথা বলতে, মাঝেমধ্যে পায়ের হাজাতে
আমায় করেছে কাবু, অধিকন্তু, কালো।

রমণী

রমণী ভারি কামকাতর, এলায়ে পড়ে আছে।
আমার গায়ে বরফ, আমি তাকাতে পারছি না—
রমণী বড়ো প্রেমকাতর, এলায়ে পড়ে আছে।

গভীর রাত, দেয়ালে ঝোলে বেলফুলের মালা।
স্মৃতির তাপ অবহ, আমার সর্বদেহে জ্বালা—
গভীর রাত, দেয়ালে ঝোলে বেলফুলের মালা।

ঝরা পালক

ঝরাপালক আটকে আছে দেহে,
মনোহরণ দেখাবে সন্দেহে—
লেগে আছেই অন্তরঙ্গ পাখা।
প্রেমের রেশ ঝরাপাতার মতো,
তোমার গায়ে রেখেছো অন্তত ;
কথাও কও, হাসো মধুর হাসি,

জীবনস্মৃতি এখনো ভালোবাসি !

মনে তো হয় এখনো কিছু আছে
মুড়িয়ে নিলে পাতাবাহারি গাছের
পাতা ও ডালপালার সব শোভা
তোমার প্রেম পৃথক, মনোলোভা।

ঝরাপালক আটকে আছে দেহে
মনোহরণ দেখাবে সন্দেহে
লেগে আছেই অন্তরঙ্গ পাখা।

ব্রিজের উপর থেকে

ব্রিজের উপর থেকে তুমি নদীর দিকে তাকিয়ে রইলে
চলমানতা নদীর আছে এবং জলে ব্যাপক ঘূর্ণি,
সব থেকেও কী যেন নেই, স্বাস্থ্যে শুধুই ঘুণ ধরেছে,
ব্রিজের উপর থেকে তুমি নদীব দিকে তাকিয়ে রইলে !

জলের ধারে প্রতিচ্ছবি, নিজের দিকে তাকিয়ে রইলে
বহমানতা তোমার আছে, শরীরময় জটিল ব্যাধি,
ভাঙাচোরার দিন কী হলো ? ভাঙার স্বরূপ দেখাও পাছে,
জলের ধারে প্রতিচ্ছবি, নিজের দিকে তাকিয়ে রইলে

ভালোবাসার মূর্তি ছিলো, এখন দেখছো অবশিষ্ট,
কিছুদিনের মতন জীবন ঝুলির ভিতর লুকিয়ে আছে
কিছুকালের দূরে যাওয়া, ফিরে আসা নিজের কাছেই
এইরকমে আর কটা দিন নিজের দিকে তাকিয়ে রইলে !

বুকের মধ্যে

বুকের মধ্যে পাথর ছিলো জমা,
আনুষ্ঠানিক চেয়ে নিলাম ক্ষমা,
কেন বা এই পাথর করা জমা !
ধারাবাহিক স্মৃতির মতো সরে,
জলের রেখা, ঢেউ ঢেউয়ের পরে,
ধারাবাহিক স্মৃতির মতো সরে !
ভালোবাসার পাথর সারা বুকে,
তন্ময়তার মধ্যে ছিলাম সুখে,
ভালোবাসার পাথর সারা বুকে !

মৃত্যু যেন

মৃত্যু যেন কানামাছি খেলে !
চোখবন্ধ ছেলেমেয়েদের খেলা এই ভুবনডাঙায়
কখনো আমাকে ছোঁয়, কখনো তোমাকে ছুঁয়ে দেয় !
তারপর খেলা চলে ভাঙাগেটে পাঁচিলের পাশে,
কে যেন আমলকিতলা থেকে চলে আসে,
কে যেন আমলকিতলা থেকে চলে আসে,
মৃত্যু যেন কানামাছি খেলে !

তাকে এলেবেলে ভাবে নেওয়া হয়েছিলো
হয়েছে সক্রিয়,
ভেতরে রয়েছে তারও প্রিয় ও অপ্রিয়,
বেছে নেবে, বিদায় জানাবে
মৃত্যু আজ কানামাছি খেলে !

যাবে যদি

রয়েছে কাশের গুচ্ছ সাজানো টেবিলে।
টেবিলের হ্রদে ভাসে কিছু রাজহাঁস,
আমার সকাল সন্ধ্যা ছুটির মোড়কে,
গলার অতীব কাছে স্বর্ণবর্ণ ফাঁস।
যাবে যদি এভাবেই চলে যাওয়া ভালো—
ছুটির আপাদনখ মান্ধাতার কালো,
যাবে যদি এভাবেই চলে যাওয়া ভালো।

স্মৃতির ভিতর

স্মৃতির ভিতর এক বাটি জল
জলের মধ্যে গুবরে পোকা
আমায় দেখায় অন্ধ অগ্নি
ফুল ফোটাচ্ছে থোকায় থোকায়।
বৃষ্টি কোথাও পড়ছে আগাম
বৃষ্টি কোথাও পড়ছে পিছে
হৃদয়মুখে বন্ধ দুয়ার
ডাক দিয়েছো মিছে মিছেই ॥

পাতাল সিঁড়ি

কপাল জুড়ে চন্দ্রবোড়া সাপের ফণা দুলছে,
খুলছে যতো শারীরজোড়, বাতাস ভাসা জানলায়—
থমকে আছে সান্ধ্যমেঘ, আলোর প্যাঁচে খুলছে,
পাতালসিঁড়ি ডাকছে মাতো অন্ধকার খেলনায়।

সাবেক আর হালফেশান খেলনা ছিলো সংকর,
দুহাত ভরে নেশার ঘোরে খেলার রীতি ভুলছে,

স্খলিত পায়ে উঠছে শুধু কঠোর পদঝংকার
কপাল জুড়ে চন্দ্রবোড়া সাপের ফণা দুলছে !

ইশারা নয় পাতালসিঁড়ি দুহাত নেড়ে ডাকছে,
গেলে কী পাবো না পাবো তাই ফাটিয়ে গলা হাঁকছে
ইশারা নয়, পাতালসিঁড়ি দুহাত নেড়ে ডাকছে !

নেশায় আর

নেশায় আর খোলে না দ্বার কপাট থাকে বন্ধ ।
চক্ষু মুদে সব দেখায় সরফরাজ অন্ধ,
নেশায় আর খোলে না দ্বার, কপাট থাকে বন্ধ ।
সাতসকালে ভরেছে ঘর সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বে,
নেশায় আর খোলে না দ্বার, কপাট থাকে বন্ধ ।

একটি সমাজ

একটি সমাজ বৃত্তমধ্যে, একটি সমাজ বাইরে আছে,
এর খানিকটা অংশ আপন, ওর খানিকটা আমার কাছের,
একটি সমাজ নকলনবিশ, অন্যটি তার তুল্যে খাঁটি,
দুইসমাজে ঝগড়া করে পদোন্নতি করছে মাটি ।

একটি সমাজ আয়ত্তাধীন, অন্য কিছু বহির্মুখী,
একটি কিছু পরার্থপর, অন্যটি খুব আত্মসুখী,
একটি সমাজ বৃত্তমধ্যে, একটি সমাজ বাইরে আছে,
এর খানিকটা অংশ আপন, ওর খানিকটা আমার কাছে ।

পাতা আর ফুল

একটি গাছের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি।
পাতা আর ফুল গোনা আমার কাজ,
একবার দূর থেকে মনে হচ্ছে, তার
ফুলের থেকে পাতা বেশি,
কাছে এলে মনে হচ্ছে ফুলের দিকটাই ভারি
আমি প্রথমে তার পাতা গুনি
পাতার পরে ফুল
পাতাগুলি দ্রুত ফুল হয়ে যাচ্ছে।
আমার হিসেবে গরমিল ঘটিয়ে
শেষপর্যন্ত পাতার ফুল হওয়াই
বড়ো হয়ে উঠলো
আর হিসেবনবিশ হিসেবে আমার হলো হার !

উদাসীনতার মতো ব্যাধি

উদাসীনতার মতো ব্যাধি আর পৃথিবীতে নেই।
সমাজে সম্পর্কে এসে এই আমি অকাট্য বুঝেছি,
উদাসীন অগ্নি এসে সব কিছু দহন করেছে,
উদাসীন নদী তার পাশ দিয়ে বয়ে চলে ধীরে।

আজ উদাসীন নই, ব্যাধিমুক্ত, দু হাতে পেয়েছি
সংসারের অম্লতিক্ত কষায় রসের পূর্ণবাটি।
মানসিকতাই ভিন্ন হয়ে গেছে, সর্ব অংশে চাই—
সামাজিক সম্পর্কের পূর্ণ অসম্পূর্ণ দুটি বাহু !

পারাপ্ত কই ?

হঠাৎ যদি লক্ষ্য করো, দেখবে আমার চুল পেকেছে,
গায়ের চামড়া হয়েছে লোল, মুখের ভাঁজে বলিরেখা,
স্থবিরতার বাতাস বইছে দেহজোড়ের সমস্ত দিক—
সভার মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখি, এ-আমি নিতান্ত একা।

চলন-বলন হয়েছে ধীর, শান্ত পায়ে আস্তে হাঁটি,
কথার মধ্যে থরো থরো আড়ষ্টতা হয়েছে সার,
সময় হয়ে আসছে এখন নদীর জলে ভেসে যাবার—
কুটোর মতো ভাসতে-ভাসতে কখন যে ছাড়াচ্ছি মাটি !
এই কথাটি বোঝার মতো মাথার উপর চেপে বসে—
পারাপ্ত কই ? সেই যেখানে কিছুক্ষণের শান্তি পাবো !

দুয়ারে তার

প্রবলবেগে চলছে খেলা গলির মধ্যে সমস্ত দিন।
খেলার বদল দেখতে পাচ্ছি লাট্টু থেকে ক্রিকেট বলে,
জানলা খুলে বসে ভাবছি, এই খেলা কি আমার চলে ?
আমার খেলা অন্যরকম রঙে বর্ণে খেই মেলানো !

দুটি চড়ুই বয়ে আনছে কুটোর পরে কুটোর পাহাড়,
ভরে ফেলবে ঘুলঘুলিটা, অবশিষ্ট ছড়ায় ঘরে,
বই-এর উপর ঝরছে কুটো, কুটোর পাহাড় সব পাথরে,
জানলা খুলে পাংশু মুখে বসে থাকছে অমল ছেলে।

দুয়ারে তার আগলবাঁধা, আঁধারি ঘর, জানলা বন্ধ,
ছেলেখেলায় জোর মেতেছে ভিক্ষা ছেড়ে বালক অন্ধ !

এই তো মর্মরমূর্তি।

এই তো মর্মরমূর্তি।
ধুয়ে-মুছে নির্ভুল রেখেছি।
ওষ্ঠ এই, দুই কান, সিংহনাদ নাসিকার ধ্বনি,
কপালে কলঙ্করেখা, চিবুকে সক্রিয় ব্রণদাগ
থুতনির উপরে কালো আঁচিল রয়েছে সর্বক্ষণ
এই তো মর্মর মূর্তি।
ধুয়ে-মুছে নির্ভুল রেখেছি।

দুভাগের স্কন্ধে রক্তক্ষরণের মতো ভাঙা চুল,
গলায় শাঁখের বলি, উচ্চতে রয়েছে কণ্ঠহাড়,
বুকের উপরে স্তনমূলে কিছু রোম রয়ে গেছে
পিঠে ঢাল পাহাড়ের মেরুদাঁড়া সটানই নেমেছে
নিতম্বে অতুল দূর বাল্য ছোঁয়া সমুদ্রের ছোপ
গহ্বরে লিঙ্গের নিচে অণ্ডকোষ সুরক্ষার দ্বারী
এই তো মর্মরমূর্তি।
ধুয়ে-মুছে নির্ভুল রেখেছি।

আজানুলম্বিত পায়ে পেশীগুলি শুধু দৃশ্যমান,
কলাগাছ দুই উরু, পাকস্থলী, শূন্যতা রাখেনি,
দশনখ অভ্রকণা পদযুগ ফুলপদ্ম পাতা
দাঁড়ানো মর্মরমূর্তি।
ধুয়ে-মুছে নির্ভুল রেখেছি।

ছেলেটি ঘুমন্ত হাতে

ছেলেটি ঘুমন্ত হাতে জড়িয়েছে নিষ্ঠুর পিতাকে।
যিনি সদাভ্রাম্যমাণ, জনপদে, জঙ্গলে, বিজনে—
এক দেশ থেকে অন্যদেশে ছুটে যান ক্রমাগত—
যিনি, এই আসছি বলে, দূরে চলে যান অকস্মাৎ।

সংশ্রবে না পেয়ে শিশুহাত দুটি জড়িয়ে ধরেছে।

এও হতে পারে সেই স্নেহবাধা তুচ্ছ করে পিতা
ঘোর রাতে চলে যাবে, ত্যাগ করে সমস্ত কিছুই ;
পিছে থাকবে কিছু স্মৃতি, স্মরণীয় শয্যার উত্তাপ,
কেন এরকম করে পিতা, তার ছেলে নাই বোঝে !
কীসের বাহির টান, কী সংসর্গ রয়েছে কোথায় ?
কীসের অসুখ এই, পূর্বাপর ওষুধে সারে না !
ছেলেটি ঘুমন্ত হাতে জড়িয়েছে নিষ্ঠুর পিতাকে ।

ঘুমন্ত পরীর দাগ

ঘুমন্ত পরীর দাগ সমস্ত বাগানে...
যেইখানে আছে তার গায়ে সাপটে রয়েছে পরীর
অটুট দেবদারু গন্ধ, মার্বেলে, মর্মরে ।
পরীর অম্লান হাসি যথাখুশি জড়িয়ে রয়েছে ।
ঘুমন্ত পরীর দাগ সমস্ত বাগানে...

পরী যাকে গ্রাহ্য বলে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে সে-ও
বাকি তো তৃষার্ত কিছু, ও পরীর পদার্পণ নেই
অন্ধকারে, জলে আর জীবস্মৃতে পদার্পণ নেই,
পরীর গ্রহণযোগ্য, যা আলোতে স্থির পড়ে আছে
ঘুমন্ত পরীর দাগ সমস্ত বাগানে...

তপশ্চারিণী

বকের ফুলের ভারে ভেঙে যায় অভ্যস্ত আলিসা,
জবরদস্তি যৌনাচার, তবু যেন অনিচ্ছুক প্রেম ?
স্তনের বৃন্তের রোম নিয়ে জেগে থাকা সারারাত
জঙ্ঘার উপরে দুই হাঁটু ছিঁড়ে ঘাস গজিয়েছে ।

এমনই দুঃস্মৃতি আজ, আগে ছিলে আসঙ্গ তৎপর
মর্মরমূর্তির জামা খুলে ফেলে মোহর দেখাতে,
আজ এতোদিন পরে সন্ধে হলো, মেঘলা ভাঙা চাঁদ

গান শোনালে না শুধু দূরে রইলে তপশ্চারিণী।
গান শোনালে না শুধু দূরে রইলে তপশ্চারিণী।

পাহাড়ে পা মুছে

পাহাড়ে পা মুছে নামে সন্ধ্যা
পাহাড়তলিতে, সন্ধ্যা নেমে আসে।
কাঁধের বল্কল খুলে ছেড়ে রাখি পাশে,
অনেকদিনের পরে এখানে পেয়েছি এক ডেরা,
চাঁদ আধো টেরা
পূর্বদিক ছেড়ে এক পশ্চিমের দিকে।

পাহাড়ে পা মুছে নামে সন্ধ্যা
পাহাড়তলিতে,
এখানের সব কিছু বর্জনীয় নয়।
যদি থাকে ফেরার সময়,
যদি ফিরে আসো,
পাহাড়তলির শব্দ যদি ভালোবাসো
চাঁদ আধো টেরা
অনেকদিনের পরে এখানে পেয়েছি এক ডেরা,
পাহাড়ে পা মুছে নামে সন্ধ্যা
পাহাড়তলিতে।

বরং ও আছে ভালো
[আজিজুলের জন্যে]

দুঃখের সমাধি থেকে তুলে আনো
আমি মূর্তি দেখি।
মূর্তি দেখি জলেস্থলে অন্তরীক্ষে আব ভাসমান
বালকের মূর্তি দেখি, সে কি সব সহ্য করে আছে?

জীবন্মৃত, বলা ভালো, সে কখনো মৃত্যুকে দ্যাখেনি।

ওকে মুক্তি দাও, কিন্তু ও তো মুক্তি ভিক্ষাও করেনি,
তবু মুক্তি দিয়ে ওকে আমাদের মধ্যে ডেকে আনো
ও থাকতে পারবে না এই মর্মান্তিক ব্যথার ভিতরে,
বরং ও বন্দী হয়ে তপশ্চরণে আছে ভালো।

জঙ্গলে এক হায়না

জলে বাড়ুক তেলে বাড়ুক আর বাড়ুক না চালে
আমার মধ্যে সেই খিদে আর যায় না আঁচালে,
যায় না খিদে যায় না,
ভালো এবং মন্দ কিছু আসল মানুষ্ পায় না।
না পায় তাতে দোষ কী ?
আমার বা আফসোস কী ?
ভালো এবং মন্দ কিছু আসল মানুষ পায় না,
পিছন ফিরে আছেই দেখো জঙ্গলে এক হায়না !

আমি ফিরে পাই

আজ আমি বৃষ্টিতে ভিজেছি।
ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে শার্ট,
পরনে পাতলুন এলোমেলো,
বহুকাল পরে আজ বৃষ্টিতে ভিজেছি।

যখন বেরুই পথে অসামান্য মেঘ ছিলো কালো।
উপগলি থেকে গলি, তারপর রাস্তায় দাঁড়িয়ে
কোন্‌দিকে যেতে ভালো, ভেবে-ভেবে ভেবে-ভেবে ঠিক
করতে পারিনি আর তন্মুহূর্তে নিয়নের আলো

নিভে গেছে, তৎক্ষণাৎ শালবন উঠেছে চতুর্দিকে।
ফিকে গেরস্থালি আলো ধাঁধায় দু চোখ,
খানাখন্দে চাকা পড়ে ছিটকোয় পাতাল,
কাগজ ছেঁড়ার মতো বৃষ্টি নামে, আকাশে চিকুর
থেকে থেকে, মনে হয় জঙ্গলের মধ্যে এসে গেছি।

এখন যেদিকে ইচ্ছে যাওয়া যেতে পারে।
প্রকৃত শহর নয়, বাড়িগুলি শাল ও সেগুন
কিছু মেহগিনি আছে, সুঁড়িপথে ভেসে চলে জল,
এবার বার্ধক্যে আমি বৃষ্টিতে ভিজেছি,
দারুণ বার্ধক্যে আমি বৃষ্টিতে ভিজেছি,
ভিজে সে-বালকে আমি ফিরে পাই যে গেছে হারিয়ে।

একটি দুটি ঝিনুক আছে

একটি দুটি ঝিনুক আছে আমার করতলে।
বিবাহে যাকে বন্দী করে সুনিশি এক হাওয়ায়,
ছেড়ে যাওয়ার গ্রন্থে থাকে চারদিকের পাওয়া,
প্রেমের আর অপ্রেমের সমস্ত সম্বলে
একটি দুটি ঝিনুক আছে আমার কবতলে।

কী করে আছো? চিরকালের এই যে আবছায়ায়,
কীভাবে এই ঘনিষ্ঠতা, জানিনা কতো ভাবি,
কলসে ছিলো লুকোনো জল, কলসে ছিলো মায়া
একটিবাব খুলিয়া দাও পুরোনো সেই চাবি।

এইখানে

ছেড়ে গেছে, এখানে সে থাকেনি কখনো।
মালা ও মোহর দিয়ে দূরে তাকে সম্ভ্রান্ত রেখেছি,
এখানের অনটন তার বিষদৃষ্টি, অন্য কোনো
সুদীর্ঘ আশ্লেষে সে তো সুখে আছে, স্পর্শনীয় নয়।
শুনেছি বিশুদ্ধভাবে এসেছিলো যাবার সময়,
বলেছি, ছিলে তো ভালো ? এইখানে ক্ষমার হৃদয় ॥

বীরেনদার জন্যে

একটি ফোঁটা চেয়েছিলাম
তোমার মতো আলো,
পারলে যেন নতুন করে
দেখায় আমায় ভালো।
কিন্তু তুমি রইলে না আর
আজকে ভিতর-ঘরে
আলো আমার যেটুকু চাই
তোমারই অন্তরে !

শব্দের ভিতরে ছিলে

শব্দের ভিতরে ছিলে, কিন্তু আমি বাহিরে এনেছি।
এতো দীর্ঘ প্রাণ ছিলো, বস্তুত তা আধো-অন্ধকারে
এখন জীবন্মৃত মনে হয়, সে-দুঃখ মেনেছি,
শব্দের ভিতরে ছিলে, কিন্তু আমি বাহিরে এনেছি।

বাহিরে দেখেছি তার কংকাল, সুষমা সেই মোহ
যে আমাকে টেনে এনে দেখিয়েছে দুঃখ বারে বারে
শব্দের ভিতরে ছিলে, কিন্তু আমি বাহিরে এনেছি।

আমার ছেলেবেলার সব

আমার ছেলেবেলার সব লুণ্ঠনও তার মতো !
এই যে আমি চাইছি কালি, দোয়াত আশাহত,
আমার ছেলেবেলার সব লুণ্ঠনও তার মতো !

আমি যে এই কাগজ ছিঁড়ে ফেলছি অনেক দূরে,
ছেলেবেলার নৌকো ভাসাই, অতসীর নূপুরে,
এই যে দেখি, অনেক লিখি সাতাশ সুমুদ্দুরে !

কোথায় তার ছড়িয়ে আছে জুতোয় আর জামায়
কলংকের সে বহু ছাপ, মিথ্যে করে নামায়
বুড়ো বয়েস চুড়ো বয়েস সেখানে অন্তত
আমার ছেলেবেলার সব লুণ্ঠনও তার মতো !

দেখেছিলাম

দেখেছিলাম স্বপ্নে তাকে, একটু নষ্ট হয়নি
কী স্বাভাবিক মূর্তি, সে তো গুঁড়িয়ে গেলো ঝড়ে,
আমার চোখের সামনে, কিন্তু কী উপায়ে উঠলো,
মূর্তিমন্ত এলো আমার ঘরের নিচে জানলায়,
বললো, এতো বাঁচা কঠিন, কে সেরকম জানতো !

ফুটন্ত এক ফুলের মতন, এই যেখানে এসে
তোমায় পেয়ে গেলাম আমি সশ্রদ্ধ সম্মানে,
একটু নষ্ট হয়নি তোমার, আমায় ভালোবেসে
তবুও কেন বাঁচা কঠিন, কে সেরকম জানতো !

দেখো ভালো হবে

কাটছিলো লাউডগা, মেলাবে চিংড়ির সঙ্গে তাকে
তন্মুহূর্তে এসে পড়লো অমিল পয়ার
বললো, আছো ভালো ?
—দেখে মনে হচ্ছে কী তা বলো, ভালো থাকা খুবই আপেক্ষিক
তবু ভালো থাকতে হয়, ভালো থাকা খুবই আপেক্ষিক
—ভোরবেলা দেখা হলো, খুলে বসলে যতো তত্ত্বকথা !
না এলে ভালোই হতো, জানি না তো তুমিও এসেছো
অবন্তী বলে নি কিছু, ভেবেছে আশ্চর্য করে দেবে ।
—আশ্চর্য এখনো হও নি ? কালই এসেছি
তুমি আসছো শুনে থেকেই গেলাম আজ
কাল চলে যাবো যতো তাড়াতাড়ি পারি
আপিস, ইস্কুল আছে অর্ণবের
—সভায় আসছো তো সন্ধেবেলা ?
—সভাধিপতিকে দেখতে যাবো
কিছু কি কবিতা পড়বে ?
বহুকাল শুনি নি তোমার মুখে
মফস্বলে থাকি, সেই মধ্যরাতে পড়া কবিতা-সনদ
বহুযুগ আগে
—তারপর, তোমার বাড়িতে ! তুমি ও সৌমেন ছিলে
সঙ্গে ছিলো নীল কাচপোকা
ও নাকি আমার ভক্ত, সঙ্গই ছাড়ে না
বললাম, যাবো আমি প্রাক্তনের কাছে
—আমি যাবো দেখে আসবো তাঁকে
—রূপবতী নয় সে তো, অতি সাধারণী
—তাঁকে দেখতে চাই আমি, অসুবিধে আছে ?
—আমার কী অসুবিধে ? সম্পূর্ণ সুবিধে
অসুবিধে হয় যদি তোমাদের হবে
আমাদের কথা হবে সান্ধ্যভাষা ঘিরে
কতোটা যে বোধগম্য হবে, অনিশ্চিত
—কথা তো বোঝার নয়, তাঁকে আসবো দেখে

সুতরাং গিয়েছিলো
খুব ভালো মেয়ে, তোমার আপ্লুত ভক্ত
—আমি ভক্তি চাই না অতসী, তুমি জানো

—জানো না, জানতাম বলো, বদলাতে তো পারো ?
—বার্ধক্যে বদল হয় না অতসীকুসুম
—সময় তো হাতে নেই, কবিতা শোনাও
—শোনানোর পূর্বে কিছু বিষ পান করি
—করো যা তোমার খুশি, অতিরিক্ত নয়
—অতিরিক্তে টান নেই আজকাল অতসী
ঈষৎ, সামান্য খাই, খেতে ভালো লাগে।

বসেছি ছাদের পাশে, বাত্তি জ্বলছিলো
শীতের শিশির এসে ভিজোচ্ছিলো মাথা
সৌমেনের টুপি এনে দিয়ে বলেছিলে,
এটা পরো ঠাণ্ডা লাগবে না
পারস্যে রবীন্দ্র-ছবি মনে হয়েছিলো
গাড়ি ছিলো সদরে অপেক্ষমাণ
সুতরাং, খুব দেরি হয়েছিল সেদিন সন্ধ্যায়

তারপর সৌমেন চলে গেলো
দুর্ঘটনা টেনে নিলো তাকে এক সামান্য বয়েসে
তারপর এই দেখা সুশ্বেতবসনা
অভিযোগ করেছিলে, একবার এলে না !
ও তোমায় ভালোবাসতো, শ্রদ্ধা করতো খুব।
—আমি তছনছকরা ছবি দেখতে পারি না অতসী
তাইতো হয় নি যাওয়া, ভেবেছি যাবোই
যাবার সময় হলে পিছিয়ে এসেছি
ক্ষমা করো, ও ক্ষমা করেছে
—ক্ষমার কথাই নয়, কী কষ্ট পেয়েছি
অতিবড় দুঃসময়ে তোমায় না দেখে
—আমিও পেয়েছি কষ্ট, না গিয়ে, অক্ষম
পুরনো দিনের কথা মনেও কোরো না
তোমাকে নতুনভাবে বাঁচতে হবে অর্ণবকে নিয়ে
সে কথা ভুলো না যেন, অর্ণব সবার
—তুমি ওর ভার নেবে ? আমি মুক্ত হই
—ওর ভার তোমার, আমি দূর থেকে নেবো
যদি তুমি তাইই চাও, ও তো ভারি নয়
অতসীকুসুম, ওকে তুমি সঙ্গে রাখো
—কথা দাও, আসবে মাঝেমাঝে

—এমন দুর্বল তুমি ছিলে না কখনো
একী কথা শুনি আজ অতসীর মুখে।
—প্রকৃত দুর্বল হয়ে পড়েছি এখন
কী জানি কী হবে?
—কখনো কারোর মন্দ চাওনি অতসী
দেখো ভালো হবে ॥

দেখাও আমায়

অভিশাপের টুকরো ছিলো চারদিকে চার বাঁধায়,
চোখে আমার বৃদ্ধ বয়েস, অন্য চোখে ধাঁধা।
আরেকটি চোখ অচতুর্থ, সেই তো দেখায় সব,
ঘরের মধ্যে সবই বাহির, সামনে অনুভব।
বাদবাকি সব জটিল, আজই তার সুমুখে এসে—
দেখাও আমায় রাজবাড়িটি সুদূর, ভালোবেসে।

সেগুন মঞ্জরী থেকে শুধু বৃষ্টি পড়ে

চারজন যুবক যায় দক্ষিণী পাহাড়ে
চক্রধরপুর থেকে দক্ষিণ পাহাড়ে যায় চারজন যুবক
খুঁটিয়ে পাহাড় দেখতে-দেখতে যায় চারজন যুবক
জঙ্গলের এলোমেলো দেখতে-দেখতে চলে যায় চারজন যুবক
কখনো উঁচুয় ওঠে, কখনো নিচেতে নামে চারজন যুবক
লণ্ডভণ্ড ভিড় ছেড়ে বহুদূর উঠে যায় চারজন যুবক।
উপত্যকা ঠিক যেন বাটির মতন
চারদিকে পাহাড় আর নদীনালা ঘিরে থাকা অদ্ভুত জঙ্গল
এইখানে, থালার মতন চাঁদ বাংলোর উপরে
খাপড়া-চড়ানো চাল বাংলোর উপরে
ধুঁধুল-জড়ানো চাল বাংলোর উপরে।

বৃষ্টি পড়ে
অসংখ্য সোনালি দাঁতে হায়নার সংশ্লিষ্ট জিব থেকে আজ
মেঘ বৃষ্টি পড়ে
সেগুনমঞ্জরী থেকে শুধু বৃষ্টি পড়ে
গাছের গোড়ায় যেন জমে-থাকা মজলিসের ধুলো
হাঁড়িয়ার জনারণ্য সে গাছের নিচে,
রঙিন আলোর বল ভেঙে ভেঙে হল উইঢিবি
বাল্মীকির পিছুটান সর্বত্র রয়েছে
গণ্ডোয়ানা পাথরের মধ্যে কী দারুণ-জলস্ফীতি
ঝর্না, যাকে বলে সে তো সকালবেলার ছিলো আলো
গোটা দুপুরের মেঘ তাকে শুধু সন্ত্রস্ত করেছে
ওলোট পালোট হয়ে গেছে তার পুরনো আঙ্গিকও,
সে এখন জমি চায়, জমি ও জঙ্গল
জনপদ চায়, যাকে হেসাড়ি নদীর জল সন্তানের মতো
ধরে রাখে।
কোথা গেলো চারজন যুবক ?
কেউ ঘরে, বারান্দায়, কেউ আছে নিক্রান্ত উঠোনে,
বিভিন্ন বর্ষার জল মেখে আজ উপত্যকা ঘিরে
কালো মুণ্ডারির নাচ নাচে
হেসাড়ি নদীর ধারে মাদলে পড়েছে কুট কাঠি
নদীর জলের ধারে দুই পক্ষ—নদী তো হিংসায়
গণ্ডোয়ানা পাথরের উপরে ছিটোয় জিহ্বা, জল
কেন যে মিলন চায় এ-বিরহী, কিছুই জানে না
অপেক্ষার দুই পক্ষ নদীর জলের কাছে নমস্কার করে
পিছনে হটাও মেঘ-বৃষ্টি, আমি নমস্কার করি
পিছনে হটাও ওই বৃষ্টি-মেঘ, নমস্কার করি
আমরা প্রান্তরে গিয়ে প্রান্তরের নাচটি দেখাবো
থালার মতন চাঁদ মাথার উপরে
সেগুনমঞ্জরী ঘেঁষে শুধু বৃষ্টি পড়ে
পাহাড়চূড়ার থেকে বাংলোর উপরে
শুধু বৃষ্টি পড়ে আজ, শুধু বৃষ্টি পড়ে।
মেলায় যাবে না তুমি ? লুপুংগুটু মেলা ?
যেতে চাই। আর ভিজে থেকো না।
চলো চলো লুপুংগুটু মেলা এই বৃষ্টি শুষে নেবে
মেলায় অনেক লোক, লোকের সামিল বৃষ্টি এখানে পড়ে না,
মেলায় অনেক লোক, মানুষ সেখানে

কিছুবা হুংকার দেবে, কিছু দেবে ধ্বনি
মেলায় অনেক লোক, মানুষ সেখানে
মানুষের কাছকাছি আসতে চায়, মানুষীও চায়
মুণ্ডারি-বিবাহ হয় এইখানে, দেখাশুনো হয়
তারপর গ্রামে গিয়ে শুধুমাত্র এঘর-ওঘর ।

কোথা গেল চারজন যুবক ?
মেলায় হারিয়ে গেলো চারজন যুবক ?
শুধু কথা বলে, কথা শুনতে-শুনতে দূরে গেলো চারজন যুবক ?
ভিতরে-বাহিরে কথা বলতে-বলতে দূরে গেলো চারজন যুবক
মোরগ-লড়াই দেখতে কীভাবে হারিয়ে গেলো চারজন যুবক ?
মনের ভিতরে থাকে পেরেকের মতো কিছু টুকরো ইস্পাতের
জড়িয়ে গেলো কী তারা তার মধ্যে ! চারজন একাকী ?
শান্তিনিকেতনে গিয়ে বৃষ্টি পাই রোজ
আকাশমণির বনে শুধু বৃষ্টি পড়ে
ক্যানেলের জলে মেশে রক্তবর্ণ জল
আকাশমণির বনে শুধু বৃষ্টি পড়ে
খোয়াই, মেঘের রেখা নিষ্পন্ন আকাশে
কানের ভিতরে ঢোকে জল ও পাথর
দীর্ঘদিন পরে যেন স্নান সারা হলো
শুকনো ভূমি বক্ষে নিলো সকাতর জল
দীর্ঘদিন পরে যেন স্নান সারা হলো
গৈরিক লবণে জলে এ কী ধারাস্নান !
ফিরে সেই কলকাতা-শহরে !
আবোল-তাবোল বৃষ্টি পড়ে শুধু ময়দানের ঘাসে
ছাত্রছাত্রীনিবাসের থেকে যারা এখানেই আসে
তাদের ভিতরে ভয় শুধু ভিজে যাওয়া
ঘাস হতে পারেনি কখনো ঐ পিপাসার্ত পায়রার দঙ্গল
কী কঠিন ছিলো ?
শুধু শুয়ে পড়া ঘাসে, কানে-কানে কিছু মিথ্যে কথা
ভালোবাসা নামে ঐ সোনারূপো কাঠির সম্মোহে
কিছুটা ঘুমিয়ে পড়া, কিছু করা ভান
ঘাসের ভিতরে গিয়ে, তার মূলে প্রেতিনী-সম্মান
নিয়ে আসা, এ কী কিছু বেশি ?
ট্রামলাইন ছেড়ে ট্রাম যায় যেন ত্রস্ত, এলোকেশী
ট্রাম-বাস—বৃষ্টি চতুর্দিকে

ভিতরে-বাহিরে বৃষ্টি, বৃষ্টি চতুর্দিকে
অন্তরে-বাহিরে বৃষ্টি, বৃষ্টি চতুর্দিকে

কোথা গেল চারজন যুবক ?
একজন ঘরে গেছে, অন্যজন পরে
আর দুই বন্ধু গেছে গানের আসরে
ফিরে আসবে ব'লে
গানের আসরে গিয়ে মিশ্রিত খাম্বাজে
তারা ডুবে আছে
কিছু-না-কিছুর মধ্যে তারা ডুবে আছে ।

ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে চারজন যুবক
একটিকে ঘরে পাবে, অন্যটিকে পরে
শুধু কলকাতায় একা, একা বৃষ্টি ঝরে
প্রকৃত দেখার নেই কোনো একজন
আবহাওয়ার ঘরে আজ নির্দেশ, লক্ষণ
বৃষ্টি হবে
বৃষ্টি হবে টিন-ছাদে, গলিতে, মর্মের
যতোগুলি কাঁথা ছিলো, তার উপরে জোর
বৃষ্টি হবে, ছিঁড়ে যাবে কাঁথা
ভেঙে যাবে বালুকায় যতো ছিলো মাথা
দেহগুলি থাকবে শুধু পচনের হাতে...
বিদায় বিদায়
বিদায় সমুদ্রগামী জাহাজের ঢেউ
বিদায় দিগন্তব্যাপ্ত বৃষ্টিপাতটিও
বিদায় বিদায়
শরতের উশিখুশি দরোজা খোলার শব্দ হলো ॥

স্ববিরোধী

তোমার বিষণ্ণ গান আমায় করেছে স্ববিরোধী....
বৃষ্টি শুরু, হলুদ অমলতাসে বৃষ্টি ঝরে পড়ে,
উদাসীন মাঠে বৃষ্টি, রঙিন কাঁকরগুলি হাঁ করে
ধুলোয় পড়ে আছে ।

আশেপাশে নিষ্প্রদীপ বাড়ি,
শুধু অন্ধকার থেকে গান ভেসে আসে,
গান, তমোহীন গান আমায় করেছে স্ববিরোধী,...

জঙ্গল বিষাদে আছে

জঙ্গল বিষাদে আছে। কিন্তু, আছে এ-মূর্ত জানালা—
জানালার মধ্যে দিয়ে দেখা যায়, সে আছে বিষাদে।
রামকিংকরের মূর্তি পড়ে আছে, সে কিছু দ্যাখেনা,
তার দুটি চোখ শুধু দ্যাখে ও-খোয়াই দীর্ঘদিন।
দীর্ঘদিন বাদে আমি তোমায় পেয়েছি, ও কিংকর,
চলো, দীর্ঘদিন বাদে চলো শর্বরীর দেখা পেতে—
চলো, পারম্পর্য মেনে, জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছে,
শর্বরী জঙ্গল চায়, গান চায়, ভিখারির মতো,
সর্বাত্মক গান চায়, শঙ্খ চৌধুরির কণ্ঠে গান!

কথা ছিলো, জঙ্গলের কথা
তেমন কঠিন শীতে, শীতের বারতা,
ছিলো কিন্তু জঙ্গলের কথা।
জটিল জঙ্গল ছিলো কিংকরের সবই
তুলসী জঙ্গল ছিলো, শান্ত কলরবই।
কতো ছবি, কতো গান, উদাস হাওয়ায়
আকাশমণির চারা কানালের পাশে,
কিংকরের দীর্ঘগান যদি ভেসে আসে।
শান্তি পাই, তছনছ—শান্তিনিকেতনে!

এবার তোমাকে ছেড়ে যাবো অন্য জঙ্গলের কাছে
বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টিতে কি নেহাত-ই কবির
কষ্ট হয়?
বড়ো অকস্মাৎ শীত নামে
শীতের পাথরগুলো হেমন্তের ছায়ার ভিতরে
পড়ে আছে, যেভাবে মানুষে শোয় ফুটপাথে, শীতের ভিতরে
সে-ভাবে পাথরগুলো শুয়ে আছে, পুলিশ আসে না!

বার্ধক্য দখল নিতে আসে না তো মন্দির-মসজিদ
এমনি তারুণ্যে ওরা শুয়ে আছে ভিখিরির মতো শালের জঙ্গলে

এবার জঙ্গলে গিয়ে আমি শালশিমুলের তলে
খোলা তরোয়াল হাতে কিছু কিছু বল্মীক-প্রাসাদ
ভাঙবো, ভেঙে দেখবো, তার মধ্যে সত্যি তুমি আছো কিনা
যে ছিলে শ্লোকের দেবী, যে ছিলো শোকের শবাসনা
তাকে ভেঙে আনবো আর আমাদের শিখরে বসাবো
পাথরের মূর্তি তুমি, শিখরে মূর্তি তুমি, বসো।

জঙ্গলে কখন যাবো, বলে দেয়, না-বলে রাখে না
জঙ্গলের দরজা নেই, শুধু আছে অন্তর-বাহির।
ছোটোখাটো গাছপালা কিছু আছে শ্বাপদের মতো,
তাদের ভিতরে শোয়, তাদের ভিতরে কথা বলে,
বড়ো গাছ পড়ে থাকে শুধু পরিপ্রেক্ষিত বানাতে,
ছোটোগাছপালা ঐ শ্বাপদের মতন বান্ধব।
ছোটো গাছপালা শুধু কথা বলে, বড়রা বলে না,
কিংবা সব তার কথা উড়ে যায় আবহাওয়া বানাতে—
আমার ভিতরে ছিলো তার কথা, তার সঙ্গে কথা
প্রবল বাঘিনী সে তো হরিণীকে মাবে, জব্দ করে
তাকে শুধু দূরে থেকে দেখেই আমার আস্বাদন।
শুধু হরিণীকে কাছে পেতে চাই, পেতে চাই মেঘ
মেঘ তো অরণ্যে নেই, এই একটি সফল জীবন
আমাদের মধ্যে থেকে আমাদেরই মধ্যে বেড়ে ওঠে।

জঙ্গলের পথঘাট ভালো নয়, রিক্সাও চলে না—
কীভাবে জঙ্গলে যাবে? পায়ে হেঁটে? বিরক্ত করবে না?
এ-কাঁটাকুটিতে তুমি ছিন্নভিন্ন হবে।
যাবে।
কিন্তু বিবক্ত করবে না?
চলো, তবে নিয়ে যাই জঙ্গলেব মধ্যে, সুঁড়ি পথ
আলুথালু, আগোছালো এতোলবেতোল সেই পথ,
সেই পথ ধবে তুমি জঙ্গলে পৌঁছাবে।
কিন্তু কেন যাবে?
এতো কষ্টকর পথে তুমি কেন যাবে?
সহজিয়া অনুরাগ? নিভন্ত লণ্ঠন?

এতোখানি পথ ধরে গয়নার গঠন নিয়ে কোনো
আলোচনা হবে না কখনো—
তবু যাবে ?
জঙ্গলে আলোর মালা দেখেছো কখনো ?
দূর থেকে ? সমতল থেকে ?
সমতলে সহজিয়া চলে বারোমাস
সমতলে থাকো।
কখনো নির্বোধ হয়ে যেও না জঙ্গলে
জঙ্গল অনেক চায়, জঙ্গলের চাওয়া তুমি দিতেই পারবে না।

বাঘের মুড়োর মতো চাঁদ ছিলো মাথার উপরে,
নিচের গর্জ-এ ছিলো বুড়িবালামের ঝর্না-নদী
দুদিকের দু পাহাড়, নিচে গর্জ, নিচেই মোহনা,
এ-পাড়ের বারান্দার পাশে ছিলো তীব্র নীল ঝাউ,
বারান্দা বা করিডোরে বসে আমি বিধ্বস্ত দেখেছি
সিমলিপাল বনস্থল, নিচে হাতি তন্ময় জ্যোৎস্নায়—
কাঠের গুঁড়ির পাশে, সকলে এ-রূপ দেখে বোঝে
মানুষ-পশুর কিছু অবিশ্বাস্য রয়েছে আকাশে ;
তাই কষ্ট হয়, তাই শোক হয়, পশু ও মানুষে
স্বভাব-প্রকৃতি ছাড়া এ-দু'জন পরজন নয় !

সোংরা ভ্যালিতে ছিলো বীরসা ভগবান,
বীরসা পাহাড়ে ছিলো বীরসা ভগবান,
ওখান থেকেই সব তীর দ্রুত গিয়েছিলো পুবে—
পুবের দখলে ছিলো ইংরেজ-বন্দুক,
সব তীর গিয়েছিলো ছাই হয়ে ইংরেজ শিবিরে
এতো দূর !

বাটির কানাত ধরে পাহাড়ের মালা,
দুর্ধর্ষ জঙ্গল আছে তারই মধ্যিখানে
বাংলো-ঘেঁষা প্রান্তরের একপ্রান্তে দু দশটি মহুয়া,
তার নিচে ফল খায় মাতাল ভাল্লুক।
ভয়ে কাচ-দরজা বন্ধ, উঠোনে আগুন জ্বেলে রাখা,
টিলার উপরে চাঁদ তরমুজের ফালি,
হাট-ফিরে দলে দলে ওঁরাও-যুবতী
বেতালা হাসি ও গানে জঙ্গল জাগায় !

আমরাও জেগে থাকি, অন্তর উপচ্ছায় কোন্ মহুয়ার মদে
কণ্ঠের দাপটে শান্ত হেসাড়িও কাঁপে,
হেসাড়ি নদীর জল পাথরে পিছলায়।
ওদিকে গাঁয়ের পর গাঁয়ে পড়ে মাদলের কাঠি,
এখানে কয়েকটি দিন নিশ্চুপ সমাধি নিতে আসা—
গাছের ভিতরে শুধু গাছ হয়ে থাকার জন্যেই
আসা, ভালোবাসা এক বিষণ্ণ জঙ্গলে
শীতের আতঙ্ক এই হিম বিবর্ণতা।

একবার বসন্তে এসে ঘুরে যেও জঙ্গলমহল।
পলাশ শিমুল দেখবে হৈ হৈ কাণ্ড বাধিয়েছে,
সে আগুনে পুড়ে যেতে ইচ্ছে হবে রোজ, প্রতিদিন।
বহুবর্ণ পলাশের সাজে হয়ে উঠবে লক্ষ্মীসরা,
চোবাবে কাপড় তার রংমশালে, জলে—
মানুষ ফুলের মতো ফুটে উঠবে নিশ্চয় সেদিন।
শাল ও সেগুন হাল্‌কা মঞ্জরী খসিয়ে,
পলাশের নেশা শুরু, শিমুল মাদার,
কুল গাছে ফুলগন্ধ ফাল্গুনের শেষে।
গণ্ডোয়ানা পাথরের ভাঁজে ভাঁজে উঠেছে অর্জুন
আব আছে মহানিম পিয়াশাল, বাঘের আড়াল
বাঁশ, বেঘোঘাস আর পাথরের খাঁজে ফার্ন লতাপাতা অর্বুদ জোনাকি
মনে হবে দেয়ালির রাত বুঝি জঙ্গলে প্রত্যহ
নিঃশব্দ দেয়ালি আজ জঙ্গলে আকাশে।

গণ্ডোয়ানা ছেড়ে চলো উত্তরের দিকে—
চা-বাগান বনতলে শেড-ট্রির সারি,
চলো গরুমারা, যাতে বাঘেও লাফায়
বনেটে, সেখানে আছে খয়েরের গাছ
চন্দনবনের চিতা চন্দনেই ফেরে।
সেখানে বাংলোর থেকে জঙ্গল পৃথক
জঙ্গল অনেক নিচে, উপরের থেকে
যদি সে জঙ্গল দ্যাখো, জঙ্গল পৃথক,
হাতি আছে, ময়নাও রয়েছে
তবুও বাংলোর থেকে জঙ্গল পৃথক।
শুধু দৃশ্য, কম্পমান, নিচে ঝর্না, মাছ
ওয়াচপয়েন্ট থেকে জঙ্গল দেখায়,

সেখানে জঙ্গলে আছে ওড়াউড়ি ডাঁশ, পিঁপড়েদের
তখন দেয়ালি নয়, তবুও তো পিঁপড়েরা ওড়ে।
এমন বিষণ্ণ এক জঙ্গলের ছবি সারাৎসার
গরুমারা বাংলো থেকে দেখা যায় হাতির পাহাড়।

এবার পশ্চিমে চলো, চাল্‌সা-মেটেলির হাটে দেখি
ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে পথ, পেঁচিয়ে-ঘুরিয়ে পথরেখা
চলে যাবে সামসিং।
দুদিকে নেহাতই ছেলেবেলা
কথামালা থেকে সেই চা-বাগান দুপ্রান্তে বিস্তৃত—
আর আছে নোনা-আতা, আর আছে ঘোর শাল বাগান
সেগুনমঞ্জরী ঝরে রয়ে গেছে বয়েসে অটুট
বালবিধবার মতো, আছে তার সবুজ থানের
সংস্থান মাঝে খাদ, মূর্তি নদী, নীলাঞ্জনা, ভুটান পাহাড়
তার অন্য পাশে এসে শুয়ে আছে বার্ধক্যে যোজনা
করার জন্যেই।
সব কিছু বাংলো থেকে দেখা যায়, বাংলো থেকে নিচে
শালসেগুনের খুঁটো হাতিরা নদীতে ফেলে দেয়।
একজন ফ্যালে না কিছু দূর থেকে সমস্তই দ্যাখে,
ঘোরা চোখ, লেজ টান, কী রকম লম্বা লম্বা হাঁক ছাড়ে
ও ভিতরে নেয়, তাকে বাংলো থেকে দেখে, বুঝি
হয়েছে বিদ্রোহী একা আজ এই বিষণ্ণ জঙ্গলে :
জঙ্গলের কিছু কাজ তার কাছে অবিমৃশ্যকারী,
সে মূর্তি নদীকে আজ বারংবার প্রণিপাত করে
বিষণ্ণ জঙ্গলে, আজ মানুষের মতো সে-ও প্রণিপাত করে
জঙ্গলে বিষাদ আছে, তাকে খুশি করো না কখনো ॥

কুয়াশায়

ছিলো টিলা, হয়ে ওঠে মেঘ।
যদি নামি, যদি আমি ভূপৃষ্ঠে দাঁড়াই
তার মানে টিলা থেকে নিচে আছে আকাড়া খোয়াই—
মাঠ, আলপথ, জল, আলপথ, জল

মাঝেমধ্যে গন্ধ-নাড়া, মাঝেমধ্যে ওঁরাও বসতি,
তার মধ্যে দিয়ে শুধু যেতে হবে কুয়াশা তাড়িয়ে
কুয়াশার মধ্যে আছে শাদা ছুঁচ, পিতলের মতো
কখন সে পুবদিকে উঠে এসে দাঁড়াবে উঠোনে।

সে-কথা এখন নয়, এখন শীতের বুড়ো মুখ
দেখে-দেখে ক্লান্ত হয়ে, ক্লান্ত হয়ে মাঠের
দরজার সামনে এসে দাঁড়ানো...কখন রক্ত পড়ে !
ভিতরে সবুজ কণ্ঠ বলে যায় অন্য ইতিহাস
কণ্ঠের ভিতরে আজ বলে যায় অন্য ইতিহাস
ভিতরে কে কড়া নাড়ে, দরজার ওপাশে—
'কেন আসো, এতো ভোরবেলা ?'
'নিশ্চিত জানি না: কেন, চলে আসি, অতি গূঢ় মাঠ
পার হয়ে, টিলা থেকে সমতলে, যখন-যেভাবে
আসতে ইচ্ছে হয়, আসি। উত্তর দেবার
সময় নয়তো ভোরবেলা, তুমি কাজ করো
তোমার কী যেন কাজ ছিলো সন্ধে-রাতে
তোমার কী কাজ ছিলো বিখ্যাত প্রভাতে
তুমি কাজ করো
পাথরে ছিলো না জল, আমি এসে গেছি
পাথর মাড়িয়ে, জল ছিলো না পাথরে।'

'দুহাত ভরেই জল, তাই ঠাণ্ডা লাগে...
দস্তানা তোমার নেই, আমি বুনে দেবো।
কিছুতে বলবে না কাউকে, গালে হাত রাখো
যতোই জলের হাত, গ্রীষ্মের খরতা
তুমি সঙ্গে নিয়ে এলে, চা, কফি বানাবো ?'
'কিন্তু, তা এখন নয়, উল্টোদিকে বসো
পা দুখানি স্পষ্ট করো, হাতে রাখো হাত
তুমি কাজ করো।'
'কাজ করা সম্ভব এখন ?
'কেনই বা নয়, কাজ, কাজ ছিলো পাথরের নদী
কেমন বহতা শীতে, এতো নয় বৃষ্টি সর্বজয়া
গ্রীষ্মের সন্ন্যাস নয়, এতো শীতে দুখানি চরণ
আমার হাতের মধ্যে নিয়ে নেওয়া
পৌষী প্রভাতে !'

অর্জুনের ছাল কারা ছড়িয়ে রেখেছে,
রেশমের গুটি ছেড়ে পালিয়েছে কীট,
বৃষ্টি পড়ে এ-সময়ে শালের জঙ্গলে।
বাঘের মাঘের শীত গায়ে আমাদের
বৃষ্টি পড়ে, এ-সময়ে আমাদের গানে
বৃষ্টি পড়ে, দূরে থাক শালের মঞ্জরী
লুপংগুটু ঝর্না নয়, আর্টিজীয় কূপ...
সেই ভোরবেলা উঠে দুজনে চলেছি
দুজন একজন হতে পারিনি এখনো।
অর্জুনের নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি,
পথে পড়েছিলো রোরো, পার হয়ে এসেছি,
হেঁটেছি মাইল দুই, কুয়াশা-কানিতে
সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে এসে পৌঁচেছি কূপের
উনুনের মতো টিলা, সে-টিলা মাড়িয়ে
অর্জুনের শিরা ছিলো তার উপর বসে
একটি হাত দিয়ে ওর কাঁধটি জড়িয়ে
একা একা বসে আছি, দুপ্রান্তে দুজন—
দুজন একজন হতে পারিনি এখনো!

ভোরবেলা চুম্বনের শীত ওষ্ঠে লাগে
দুটি করতলে করে সে-মুখ স্থাপন
আবার চুম্বন করি সেই ওষ্ঠাধরে,
তখন উষ্ণতা পাই, শরীরে উন্মুখ
হয়ে পড়ে ইন্দ্রিয়েরা
তখনি শালের
ভিতরের বুকের মধ্যে দুটি হাত রাখি।
ও কিছু বলে না, শুধু অন্ধের মতন
চোখ বুজে স্থির থাকে পাথরের মতো।
'আমি তো পাথর হতে চাইনি কখনো
কেন যে এমন হয়, কিছুতে বুঝি না!
'তুমি বড়ো ভয় পাও, সেজন্যে ঘরের
বাহিরে এনেছি আজ কিছু পাবো বলে—'
'এই কি যথেষ্ট পাওয়া, এর বেশি নয়?'
'সে-পাওয়া পরের, আমি তুলে রেখে দেবো
যেদিন বিবাহ হবে একসঙ্গে পাবো
তোমার সমগ্র'

'যদি বিদায় না হয়।'
'তাহলেও যা পেয়েছি, তাও তো অনেক
কুয়াশায় যা পেয়েছি তাও তো অনেক।
যথেষ্ট, যথেষ্ট।'



বিষের মধ্যে সমস্ত শোক

সূচিপত্র

বিষের মধ্যে সমস্ত শোক

ভেবেছি এই আলোর মধ্যে ঢোকাবো সেই অন্ধকারের
কীট পতঙ্গ। সারাজীবন, ভেবেছিলাম আলোর মধ্যে
ঢোকাবো সেই প্রতিচ্ছবি, ভেবেছিলাম আলোর মধ্যে
ঢোকাবো সেই প্রতিচ্ছবি।

কে যে তোমায় মনে রাখলো ? ভিতর-বাহির সমস্ত দিন
কে যে তোমায় মনে রাখলো ? অন্তরে সেই প্রতিচ্ছবি !

দ্যাখো, একটু ঘুরে দাঁড়াও, আয়নাতে তার দরজা আছে
রাজাই সে তো ময়ূরবাহন, অন্তত এক পাগলা গাছের
রাজা সে তো ময়ূরবাহন !
মদ খেয়েছি, এমন তাতে ছিলো তেমন ময়ূরবাহন
মদ খেয়েছি ছেলেবেলায়
দুর্গানামও দেখেছি ঠিক
মদ খেয়েছি ময়ূরবাহন
কিন্তু সে তো একলা আমার
আমার ভিতর সেই ছেলেটির মধ্যে ছিল ময়ূরবাহন
এক বাটি মদ, সঙ্গে সঙ্গে, এক বাটি মদ সঙ্গে সঙ্গে
খেয়ে, একটু ভিরমি খেয়ে দেখেছিলাম ময়ূরবাহন
তারপর তার সঙ্গে এবং আসঙ্গে এই সমস্ত স্থির
খেতাম, আমি অল্প খেতাম, তারই সঙ্গে সমস্ত দিক
ভূয়োদর্শী বেজায় আগুন, তারপরে সেই আগুনে ঠিক
আর কিছু সব ঘুরে আনার।
এখন আমার বৃদ্ধ বয়েস, খাইনা আমি সঠিক আগুন
এই মুহূর্তে ঝগড়া করো, ঝগড়া মানে সমস্ত বিষ
আমার মধ্যে ঝগড়া করো বিষের মধ্যে সমস্ত শোক
কী শোক আছে তোমার কাছে ? তোমার আছে সমস্ত বিষ
এখন আমার বৃদ্ধ বয়েস, খাইনা আমি সঠিক আগুন
আগুনে আজ রোদ পোহাচ্ছি, আগুন মানে শীতের আগুন
দেরে দেরে দ্রিম দেরে দেরে দ্রিম
ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্
দেরে দেরে দ্রিম
তাহ'লে এই রাত পোহালে আমি পাবোই চাঁদের আলো
দেরে দেরে দ্রিম

আর কিছু নয় আত্মরক্ষা
দেরে দেরে ড্রিম
আর কিছু তো আমার, কিন্তু আমার মানেই স্বাস্থ্যরক্ষা।

কিছু তো জানিনা, শুধু হাত ধরো হেমন্তের বুকে
যতোদূর চলা যায়, সে আমাকে দেবে না প্রত্যক্ষ
অভিমান, সে আমাকে সম্পূর্ণ নেভাবে
যতোই আগুন আমি তুলে দিই তার বক্ষোচূড়ে,
সে আমাকে একান্তে নেভাবে।

শোনো আমার সামান্য চুল, তুমি আমার মধ্যে থাকো
বলেছিলাম, অসুখ হয়নি, অসুখ তোমার কেবল একার
তোমাকে তাই বলেছিলাম, তুমি আমার মধ্যে থাকো,
থাকলে না তা, পুড়িয়ে ফেললে, ও সুন্দরী সমস্ত দিক
পুড়িয়ে ফেললে, রাখলে কিছু আমার বড়ো শোভন হ'তো
পুড়িয়ে ফেললে, সমস্ত দিক।

এইই মৃত্যু! আমি তো প্রত্যক্ষ দেখেছি—
ভরে না ইন্দ্রিয়ে, এই বাজুবন্ধ কোথায় মেলায়?
মৃত্যু, তা কি মৃত্যুতেই শেষ হয়? জানি না কোথায়?
কার রূঢ় অগ্নি থাকে, অগ্নিতে কি সমস্ত মেলায়?

মেলায় বাঘের সঙ্গে ঘা মেরে বিস্তর,
শুধু কি বাঘের ডাক শুনেছিলে তুমি?
বাঘের সঙ্গেও আছে সন্ধ্যার প্লাবন,
প্লাবনের বাঘ সে তো খুব সুস্থ নয়!
সারাদিন ধরে এক বিসর্জন আমায় ধরেছে?
তার থেকে মুক্ত নই, কিন্তু আমি যেখানে তা পাই
মুক্তি পাই, বিসর্জন আমাকে ধরেছে।
অথচ উন্মুক্ত শান্তি চাই আমি বিষণ্ণ দরোজার
চাবি পড়লো, বলা হলো, এ তোমার দরোজা নয়, শোনো
অন্য কোন দরোজার সামনে এসে দুহাত পেতেছো
এ তোমার দরোজা নয়!
জানি আমি দু হাত পেতেছি। নিজের বাড়ির সামনে দুহাত পেতেছি।
খোলা হয়নি। এতো মদ্য। এতো পদ্য চার হাত ঘুরিয়ে
এতো পদ্য! চার হাত পাতিনি!

মদ্য ছিলো এতো, সে তো ভুবন মোহন
মদ্য ছিলো এতো সে তো ঋতুরঙ্গস্বামী ।

আনন্দবাজারে আছি, এসেছিনু যেভাবেই আসে
অবশ্য সুখাদ্য ছিলো, তাতে আমি কলুষ হাতের
স্পর্শ না দিয়েই শুধু বলেছিনু, এখানে হাতের
স্পর্শ নয়, বলেছিনু, এখানের সমস্ত সময়
আমার এ-ওড়াউড়ি সে-ই দিকে যাবার সময়
হয়নি । ওদিকে যাওয়া, বিশেষত আমি অঘ্রানের
সন্তান, সেহেতু হয়নি এখনো সে যাবার সময়
অঘ্রানের মাঠে একটু ঝিনুক সাজাই প্রাণমন ।
সেও তো অঘ্রানে নেবে, সেও তো অঘ্রানে ফেলে দেবে ।
কী পাংশু এ-মাতৃমুখ, শুধু আমি দুহাতে ছোঁয়াবো,
এক বাটি আগ্নেয়কে, তাতে ক্ষতি হয়েছে কখনো ?
খেয়ে তুই সুস্থ থাক—মা বলেছিলেন আমাকে
এমনও কি, তোর যদি মন্দে হয় ভালো !

ভালো তো কিছুতে নেই, এতো মদ, বিছানার কালো,
ঘোচাতে পারবে না যদি, তুমি কেন সুমুখে দাঁড়ালে
মদ এতো, বিষণ্ণতা, এ মুহূর্তে আমি তার পিছে
সে-মুহূর্তে আমি নিচে, সে মুহূর্তে সর্বক্ষণ নিচে ।

দিন দুরন্ত, রাত তো মোহর,
আমার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখো
অবিকলের উদাস সিঁড়ি, ভিতরে তার একলা থাকো
সব তো আমার চেনাশোনা, অন্তরে তার যথেষ্ট দিন
থাকলে থাকো, এবার বাঁকো, ভিতরে থাক একটা সিঁড়ি ।
সেই সিঁড়িতে বসবে বলে এসেছো ওই দয়ার অধিক
এক চুমুকে পান করো এই বিষের বাঁধন, নিরম্বু বিষ,
এই তো তোমার বয়ঃসন্ধি, পাঞ্জাবিতে ঠিকরে আলো
পড়ছে বুড়োর গায়ের মধ্যে, সেই তোমারি নতুন জহর ॥

এখানে জন্মের

এখানে জন্মের কিছু দাগ রয়ে গেছে
অত্যন্ত সহজ জলে, রেললাইনে আর
পেয়ারা বনের ফাঁকে, সবেদার গাছে
এখানে জন্মের কিছু দাগ রয়ে গেছে।
কীভাবে উঠেছে সিঁড়ি ? এপাশে আঁতুড়
অন্যদিকে সিঁড়িঘর সটান উঠেছে
ভগ্নিষ্ঠ ছাদের গায়ে নতুন আলিশ
যে গ্যাছে সে কিছুই দেখেনি
দেখেনি বলেই গ্যাছে, গ্যাছে বলে সুসন্তান সব
একযোগে বাড়িঘর ধুয়ে-মুছে, সাফ করে রেখেছে
সে এমন ছিলো, সে তো নগদে বিক্রয় করতো ঢিল...
গ্যাছে বলে বাঁচা গেছে, এ প্রজন্ম ক্ষমা ভিক্ষা করে।

তোমার কেমন লাগে ?

তোমার কেমন লাগে চাঁদ ?
জঙ্গলের অন্তর্গত ফাঁদ—
কী লাগে, কেমন করে লাগে
এলোমেলো হাওয়া আর ধুলো
এবং বিধ্বস্ত চুলগুলো
তোমার কেমন লাগে চাঁদ

চাঁদের কলংক, নোনা হাওয়া
যদি পাও, সেই ফিরে পাওয়া
এলোমেলো হাওয়া আর ধুলো
এবং বিধ্বস্ত চুলগুলো
তোমার কেমন লাগে চাঁদ—
চাঁদের কলংক, নোনা হাওয়া ?

এমনভাবে কেউ ডাকে না

হারিয়ে যাবার অনেকগুলি পথের ছিলো নেমন্তন্ন ।
জংলো সুঁড়ি পথগুলো সব লতার মধ্যে লুকিয়ে রাখছে
মুখচ্ছিরি দারুণ । কেমন আলো-ছায়ায় বাঘের মতো !
হারিয়ে যাবার অনেকগুলি পথের ছিলো নেমন্তন্ন ।

এমনভাবে কেউ ডাকেনা, কেউ ডাকেনা এমন করে—
শিখর থেকে সেগুন রেণু বাতাস লেগে পড়ছে ঝড়ে ;
বুকের উপর, মুখের উপর মউলগন্ধ পড়ছে ঝরে ;
এমনভাবে কেউ ডাকেনা, কেউ ডাকেনা এমন করে !

ছুঁয়ে যাচ্ছে

ছুঁয়ে যাচ্ছে মাথা, গাছের পাতা—শিরিষ পাতায় ।
ঢেকে যাচ্ছে মাথা আমার কী আলস্যে—
সবুজ বৃষ্টিভেজা পাতায় ঢেকে যাচ্ছে আমার মাথা
কী আলস্যে !

আকাশ ভরে আছে মেঘে
পাতার ভিতর বাতাস স্নেহে
বয়ে যাচ্ছে নিরুদ্বেগে, পরিহাস্যে
তার আমার তো কথাই ছিলো
পরিবেশেই প্রকাশিলো, অনৌদাস্যে—
ছোঁয়ার পরম অর্থ আছে
হোক না ছোঁয়া শিরিষ গাছের
সরল ভাষ্যে
বোঝার যা সব বুঝেই নিলো
তার আসার তো কথাই ছিলো
এসেছে সে ।
ছুঁয়ে যাচ্ছে মাথা গাছের পাতা—শিরিষ পাতায় ।
ঢেকে যাচ্ছে মাথা আমার কী আলস্যে,
সবুজ বৃষ্টিভেজা পাতায়, ঢেকে যাচ্ছে আমার মাথা
কী আলস্যে !

বিবাদ

ভালোবাসা নিয়ে কত বিবাদ করেছো !

এখন, টেবিল জোড়া নিবন্ত লণ্ঠনও
সহনীয় ।
অনুভূতি । সবজির মতন
বিকোয় না হাটে ।
হাত কাটে,
না রক্ত পড়ে না ।
বিভীষিকা !
দুচোখের পক্ষও নড়ে না ।
প্রজড় শিশুর মতো আছো—
আজই
বিবাদ করেছো,
ভালোবাসা নিয়ে কিছু বিবাদ করেছো,
কাতর পাথর মিছু বিবাদ করেছো !

অন্ধকারে

অন্ধকারে, বনের আড়ালে খেলা
খেলা চলছিলো, মেলা চলছিলো বনে
বনের আড়ালে,
কুক্কুট-কুক্কুটী নিয়ে লড়াই চলছিলো
হাটে, মাঠে অন্ধকারে লড়াই চলছিলো,
মানুষ মানুষী নিয়ে লড়াই চলছিলো,
মানুষ কখনও জেতে, কখনও মানুষী ।

অন্ধকারে, বনের আড়ালে, মাঠে, খেলা
চলছিলো,
সেই খেলা থেকে ওঠে আগুন সহসা
সহসা সে-খেলা শেষ হয় ॥

তোমায় আমি ভোগ করেছি

শুনেছি, খুব অসুখ তোমার,
শুনেছি খুব যাবার সময় তোমার কাছের
একটু-আধটু প্রেম-নিবেদন করবে পাছে
তাই বলেছি, বয়ঃসন্ধি।
তাই বলেছি শক্ত গাছের, কাছেই ছিলে,
এতই নতুন, বলেছি তাই বয়ঃসন্ধি।
জানতে না তো ভালবাসায় শেষ করেছি
সারা সকাল দুপুর এবং অবশ্যও
সন্ধ্যার ও-মন্দিরে তোমায় সহস্রবার
আমি বিপুল ভোগ করেছি । তোমায় বিনা..
কিন্তু, এ তো কেউ জানে না
তোমায় আমি ভোগ করেছি, তোমায় বিনা।

শুয়ে পড়ো

শুয়ে পড়ো, কষ্ট আর পেও না উৎসবে
উৎসব তোমাকে চায়, তীব্র ও সুতীক্ষ্ম এক মোহ
তোমায় নিয়েই শুধু জটলা করে, ছাড়াতে পারে না
এই বেড়া, বেড়াজাল, কাঁটাতার এবং অক্ষর
অক্ষর নিয়েই ওরা জটলা করে ভোর থেকে রাতে।

ক্লাসরুম ঘুরে আসি

ক্লাসরুম ঘুরে আসি, ভেঙে গেছে সে পাহাড়চুড়ো
দূর থেকে শুনে আসি জলপ্রপাতের স্নিগ্ধ ধ্বনি
বুদ্ধিরাম ঘন্টিঅলা, জানি না সে বেঁচে আছে কিনা
তছনছ ইস্কুল, আজ এক নতুন বসেছে।
বসেছে ইস্কুল তার পরিপাটি দরজা খিলান

আমার পুরনো মঞ্চ ভেঙে গেছে, সংযত রয়েছি
শুধু আমি ।
নতুন বক্তৃতা মঞ্চে, আমি আজো তোমার আপন
পুরনো জাঙাল থেকে আজ এক শ্মশানে পৌঁছাবে
বয়েস পঞ্চমে কেন জাঙালে গিয়েছে সারারাত
পরিত্রাণহীন পিতা অন্তর্জলি গিয়েছে সেখানে !

বয়ঃসন্ধি

বয়ঃসন্ধি, কাপড় ছিঁড়তো ভোরবেলাতেই
এতো এমন বয়ঃসন্ধি কাপড় ছিঁড়তো ভোরবেলাতেই
না যদি সে পোহাতো রাত, দুহাতে তার আগলে বসে
আল্‌সে বা ছাদ যেখানে থাক্ দুহাতে এক নখের জব্দ
করে মারতাম আধকপালে, কুমারী সেই ভোরবেলাতেই
তখন, সে তো বয়ঃসন্ধি, দুহাতে দুই কঠোর মিনার
ভাঙতে-ভাঙতে শায়া-সেমিজ টুকরো হতো দশ নখরে
আসলে এক বয়ঃসন্ধি, থাকতো বলে তাকে মানায়
এই উড়ন্তচণ্ডীপনা, আসলে সেই বয়ঃসন্ধি !

সন্ধে হয়ে এলো

সন্ধে হয়ে এলো, আজ, এ বাড়ির থেকে যেতে হবে
কেউ তো কোথাও নেই, যদি আসতো এ-বৃদ্ধবয়সে
দেখতাম তাদের মুখপানে চেয়ে কেউ আছে কি না
সেদিনের স্মৃতি নিয়ে ঘরে বা ছাদের পরবাসে

সামনে ইস্টিশন, আর মাস্টারেরও বাড়ি আছে দূরে
রেলস্টেশনের মতো উপক্রত আর কিছু নেই
যার কোলে-পিঠে উঠে মানুষ হয়েছি সর্বক্ষণ
সে চোখে দ্যাখে না আজ, গায়ে হাত বোলায় নির্বোধে !
আমি যে কতটা বুড়ো হয়ে গেছি যে আজই আপন

মধ্যযমুনার টান বাঁধে ও সংস্কার মুক্ত করে
প্রেম-ভালোবাসা ছিলো মুঠোর ভিতরে তৎক্ষণাৎ
কী ক্ষতি তাদের যদি দেখতে চাই এ বুড়ো বয়েসে
আত্মযন্ত্রণার মতো কষ্ট আর কিছুতেই নেই
আমি পরিষ্কারভাবে বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই আজো

পাতার অসুখে

পাতার অসুখে পোকা কেঁদে-কেঁদে ফেরে
বাগানের অন্ধকারে, আমি টের পাই
পোকাদের কান্না বুঝি, আমি টের পাই
কখন কেন বা কাঁদে সুখের পোকারা ?
খিদে পেলে কাঁদে আর কষ্ট পেলে কাঁদে,
কাঁদে না পোকারা কোনো চরম আহ্লাদে ।
অন্ধকারে কাঁদে ওরা, আলোকে কাঁদে না,
অদৃশ্য শৃংখলে যেন ওদের বাঁধে না—
কষ্ট হয় ।

নির্জনতা ভালো

নির্জনতা ভালো, কিন্তু কতটুকু ভালো ?
বনের ভিতর যাও, থাকো কিছুদিন
ঘাস পাতা খাও, কিছু ফুল খাও
শুয়ে থাকো হিম
অন্ধকারে, ঘুমঘোরে শিকড়ের পরে—
দিন যাবে ।
কিন্তু, তা কী করে যাবে ? দিনরাত্রি নেই—
এই বন স্থির হয়ে বহুক্ষণ আছে ।

কিছুদূর থেকে ঐ কোলাহল
ভেসে আসে কানে
ঝর্না ভেঙে পড়ে থাকে বাতাসের গানে—
নির্জনতা ভালো, কিন্তু কতটুকু ভালো ?

নিজস্ব অন্তরে

জলের ভিতর একটি দুটি ঝিনুক এসে নাচে
একটি দুটি ফুল ফুটেছে বনের সকল গাছে।
মন ভালো নেই, বন ভালো নেই, ঝর্না ছিলো ফাঁকা
কোথাও কিছু ভুল হয়েছে আমার মনে রাখায়।
তাই পৃথিবী যথেষ্ট নয়। যৎসামান্য দিয়ে
আমার চোখের সম্মুখে যায় তক্ষুণি হারিয়ে—
অনেকগুলি পথ রয়েছে, একটি সবার জানা
সেই সকলের পথটি ধরে আমার যেতে মানা।
বারণ, কেন করে ?
মন ভালো নেই, বন ভালো নেই, নিজস্ব অন্তরে।

কার্নিশে বেড়াল

পুড়েছে সহাস্য ধূপ
ধোঁয়ায় আবিল ল্যাম্প-পোষ্ট
কলকাতার গলি
সেই মরচে-পড়া ছড়ের মতন
ধারাবাহিকতাময়
সেখানে কি সুর বাজে ?
ছুঁচ দিলে নিঃসাড় বুনুনি—
ফিসফাস, সৌদরের কাঁটাঝোপে
নখ টানে
যেমন মাটির
দাগের উপরে মড়া

তেমনই পা চেপে
        নামে সন্ধ্যা
একা
        হলুদ সাঁতার
            কার্নিশে বেড়াল
                খসে পড়ে ফুলটুসি
                    বৃষ্টি ও প্লাস্টার
সাতসমুদ্র কলকাতার জলে
শব্দ হয় প্রাণপণ, রেডিও-বিকৃত অকূস্থলে ॥

কলকাতা কার্জন পার্ক

কলকাতা কার্জন পার্ক
        দুপুরের মেট্রো জ্বলে ধু ধু
ময়দান শিকড় থেকে
        রস টানে ভিখারিনী বধূ
জীবনের জটলার ঘানি
এদেশে যথেষ্ট পরিমাণই
        সব স্তরে—
মুখ ঢাকে কলকাতা খবরে ॥

আবার তুফান ঝড়

আবার তুফান ঝড়—চতুর্দিক জ্বলে,
আগুন সাঁতরায় তার কালের কম্বলে,
আবার তুফান ঝড়-চতুর্দিক জ্বলে ।

নিশ্চিন্ত নিষ্প্রাণ হয়ে ছিলো এতকাল,
এখন হয়েছে এক বিভ্রান্ত অকাল ।

উড়িয়ে-পুড়িয়ে ক্ষার হয়েছে জঞ্জাল,
নিশ্চিন্ত নিষ্প্রাণ হয়ে ছিলো এতকাল।

আবার তুফান ঝড়—চতুর্দিক জ্বলে ॥

মানুষের মধ্যে

মানুষের মধ্যে আছে যে-মানুষ
তার খোঁজে বেড়িয়ে পড়েছি।
কতশত জনপদে ঘুরে এসে দেখেছি তাদের
সহনশীলতা ক্ষমা, রোষমুক্তি এবং অনেক বর্ণচ্ছটা।
আমি মানুষের মধ্যে ত্যাগ ও তিতিক্ষা ছাড়া
অন্য কিছু দেখিনিতো আজো।
মুক্ত হয়ে বসে আছি সেই মানুষের মধ্যে, যার
আজো ভালবাসা আছে, বয়ে যায় ক্ষীরের মতন।



আমাকে জাগাও

সূচিপত্র

হারায় না

তুমি গোটা জীবন যা জ্বলতে পারতে আমিও জ্বলেছি।
জ্বলেছি বলেই আছি, জ্বলন্ত সংসারে এক স্তব,
স্তবের মতন আছি, মৃত্যুময় বহু অনুভব
স্পর্শ করে, চিতা নম্র, তবুও তো চিতায় জ্বলেছি।

এখন, দুপুররাতে, দাঁড়িয়েছি তোমার সম্মুখে
তুমি অপুড়ন্ত নও, তবু এসে দাঁড়িয়েছি রাতে।
বলো, যন্ত্র শেষ হলো, আর কোনো সংসারে যাবে না,
কৃষ্ণ দুই হাত দুটি তুলে দাও আমারই দুহাতে।

বলো, তৃষ্ণা শেষ হলো, কোথা পাবে কলংকের পার ?
হরিধ্বনি কিছু পাবে, এক মুষ্টি, নিতান্ত যাবার !
আমিও পেয়েছি, তাই বহে নিয়ে নালার ওপারে—
তোমার জন্যেই বসে রয়েছি, কখন যেন ছাড়ে ?
নৌকো বা রেলের গাড়ি, কোথায় তোমাকে পাবো আমি,
হারিয়ে হারায় না তো, কী তোমার পূর্বতন স্বামী !

পুরানো সংসারে ফেরো

তোমার লাঞ্ছনা হলো অপরূপ, অথচ কবির আস্থা পেলে
এতোই কি নির্যাতন এতোকাল ভোগ করেছিলে ?
তাহলে বলোনি কেন, মীমাংসায় ত্রুটি মেলাতুম
তোমার লাঞ্ছনা হলো অপরূপ, অথচ কবির আস্থা পেলে।
না যদি কিছুই পেতে, দেখা হলো নিতান্ত দৈবাৎ
তাহলে কী করতে তুমি ? মেনে নিতে ? যেমন মেনেছো
এ গোটা বিংশতি বর্ষ, হঠাৎ বর্ষার ঢল নামে,
আত্মপরিচিত হতে ভালো লাগে, কিন্তু তারপর ?
পুড়িয়ে সংসার একটি, অন্য কি সংসারে যাওয়া চলে ?
তোমার সর্বস্ব নিয়ে গেঁথে রাখি পুরাতন মালা,

ছেঁড়ার অতীত, শুকনো, রসকষ কিছু নেই তাতে,
তাই তো পুরানো মালা গলায় রেখেছি সর্বক্ষণ।
তুমি কিন্তু তার দেখা কিছুতে পাবে না, বলি আমি ;
পুরানো সংসারে ফেরো, রেখো এক ভিক্ষুকে বাহিরে !

গৌরী পাজামার থেকে

গৌরী পাজামার থেকে খেদ এই সর্বত্র রয়েছে।
রয়েছে বলেই ভীত—এ-সন্ত্রাস কখনো দেখিনি,
পরিত্রাণময় সিঁড়ি, সিঁড়িতে রয়েছে সর্বজন,
গৌরী পাজামার থেকে এই আমি সর্বত্র দেখেছি।
দেখেছি বলেই আছি, কতক্ষণে সে যায় অদূরে—
ভবিষ্যৎ-মূর্তি হয়ে, জানে না সে উত্তর-দক্ষিণ,
কোন্‌দিকে যাবে সে আত্মা, অথবা সুস্নিগ্ধ করে নেবে,
ঐ অগ্নিগর্ভ প্রাণ, অধিকন্তু বিষাদে তন্ময়।
আমি যদি ইচ্ছা করি, ঐ সেকালের খিন্ন প্রাণ
নিজের কাছেই রাখি, ভয় পাই, তবুও দক্ষিণে
আমার কাছেই রাখি, মধুমক্ষী সে বড়ো কষ্টের।
প্রিয় তো আমার খুবই, নিতান্ত বিখ্যাত পরিজন,
সে একা গিয়েছে পুড়ে, অনামনে কেবল একাকী—
আমাকে পুড়িয়ে গেছে, আমাদেরও, তম্নিষ্ঠ কল্যাণী।

কীসের ক্ষতি ?

মাটির একটি কলস ছিলো তার পিছনে।
সম্মুখে জল, শূন্য কলস তার পিছনে—
হাতের লাঠি উঁচে ধরা, তুচ্ছ তো কাজ !
কিন্তু কলস যাচ্ছে-আসছে, স্থির থাকেনি।
অথচ তার বারণ ছিলো পেছন ফেরা,
পেছন ফিরলে প্রেতাত্মা তার সঙ্গে যাবে,
কীসের ক্ষতি ? এতোকালের পিতৃমূর্তি !

দাও, কিছু দিয়ে যাও

ছিলে সারাদিন বসে, সন্ধে হলো আর চলে গেলে !
ফিরেছি গভীর রাত্রে, পদাতিক, গুনে-গেঁথে কড়ি,
এতোক্ষণ বসে থেকে কীভাবে সন্ধ্যায় চলে গেলে ?
থাকলে না কেন রাতে, উদ্ভটচেতনে, ভেবে মরি।
চিঠিতে লিখেছো, কিছু এসেছিলে দিতে
নেওয়া তো হলো না !
এতো দীর্ঘ পথ বেয়ে এসেছিলে দিতে
দেওয়া তো হলো না !
মনে করি, একদিন মুখোমুখি দেখা হয়ে যাবে।
দেবার-নেবার কথা সসম্ভ্রম রেখেছো স্বভাবে,
মনে ভাবি, একদিন মুখোমুখি দেখা হয়ে যাবে।
তখন সন্ন্যাস, তবু তোমার অদেয় কিছু নেই—
আমি ভিখারির হাতে দাঁড়িয়েছি তোমার সম্মুখে,
দাও, কিছু দিয়ে যাও সন্ন্যাসিনী, সামনে গূঢ় পথ !

ছেঁড়ার অতীত, শুকনো, রসকষ কিছু নেই তাতে,
তাই তো পুরানো মালা গলায় রেখেছি সর্বক্ষণ।
তুমি কিন্তু তার দেখা কিছুতে পাবে না, বলি আমি ;
পুরানো সংসারে ফেরো, রেখো এক ভিক্ষুকে বাহিরে !

গৌরী পাজামার থেকে

গৌরী পাজামার থেকে খেদ এই সর্বত্র রয়েছে।
রয়েছে বলেই ভীত—এ-সন্ত্রাস কখনো দেখিনি,
পরিত্রাণময় সিঁড়ি, সিঁড়িতে রয়েছে সর্বজন,
গৌরী পাজামার থেকে এই আমি সর্বত্র দেখেছি।
দেখেছি বলেই আছি, কতক্ষণে সে যায় অদূরে—
ভবিষ্যৎ-মূর্তি হয়ে, জানে না সে উত্তর-দক্ষিণ,
কোন্‌দিকে যাবে সে আত্মা, অথবা সুস্নিগ্ধ করে নেবে,
ঐ অগ্নিগর্ভ প্রাণ, অধিকন্তু বিষাদে তন্ময়।
আমি যদি ইচ্ছা করি, ঐ সেকালের খিন্ন প্রাণ
নিজের কাছেই রাখি, ভয় পাই, তবুও দক্ষিণে
আমার কাছেই রাখি, মধুমক্ষী সে বড়ো কষ্টের।
প্রিয় তো আমার খুবই, নিতান্ত বিখ্যাত পরিজন,
সে একা গিয়েছে পুড়ে, অন্যমনে কেবল একাকী—
আমাকে পুড়িয়ে গেছে, আমাদেরও, তন্নিষ্ঠ কল্যাণী।

কীসের ক্ষতি ?

মাটির একটি কলস ছিলো তার পিছনে।
সম্মুখে জল, শূন্য কলস তার পিছনে—
হাতের লাঠি উচ্চে ধরা, তুচ্ছ তো কাজ !
কিন্তু কলস যাচ্ছে-আসছে, স্থির থাকেনি।
অথচ তার বারণ ছিলো পেছন ফেরা,
পেছন ফিরলে প্রেতাত্মা তার সঙ্গে যাবে,
কীসের ক্ষতি ? এতোকালের পিতৃমূর্তি !

দাও, কিছু দিয়ে যাও

ছিলে সারাদিন বসে, সন্ধে হলো আর চলে গেলে !
ফিরেছি গভীর রাত্রে, পদাতিক, গুনে-গেঁথে কড়ি,
এতোক্ষণ বসে থেকে কীভাবে সন্ধ্যায় চলে গেলে ?
থাকলে না কেন রাতে, উদ্ভটচেতনে, ভেবে মরি।
চিঠিতে লিখেছো, কিছু এসেছিলে দিতে
নেওয়া তো হলো না !
এতো দীর্ঘ পথ বেয়ে এসেছিলে দিতে
দেওয়া তো হলো না !
মনে করি, একদিন মুখোমুখি দেখা হয়ে যাবে।
দেবার-নেবার কথা সসম্ভ্রম রেখেছো স্বভাবে,
মনে ভাবি, একদিন মুখোমুখি দেখা হয়ে যাবে।
তখন সন্ন্যাস, তবু তোমার অদেয় কিছু নেই—
আমি ভিখারির হাতে দাঁড়িয়েছি তোমার সম্মুখে,
দাও, কিছু দিয়ে যাও সন্ন্যাসিনী, সামনে গূঢ় পথ !

বাঁচাতে পারবো না

প্রতিটি আঘাত থেকে আঘাতের বাহিরে দাঁড়ালে
লাগে না আমার ভালো। অনেকে তো বলেছে দুষমন!
পদ্য লেখে? কিংবা পদ্য ফিরি করে দরজায় দরজায়—
অথচ আমার দুঃখ এই যে, তোমরা হেরে গেলে!
কিছুতে একটি পংক্তি সাজাতে পারলে না, সেজে রাখি—
তোমাদের জন্যে, ও বালক-বালিকা, দ্যাখো কিছু।
সুতরাং প্রণম্য যে কিছু হয় তার থেকে নিচু—
লজ্জা কী সে? আজ তুমি ছড়ি হাতে দরজায় দাঁড়ালে!
সিঁথিপথ বেয়ে আমি যেতে পারি, তোমরা পারবে না।
মানে জানো? কীসে জানবে? সব পথ লক্ষ্যভ্রষ্ট ক'রে
নতুন যে-পথে যাবে, প'ড়ে দেখবে নতুন কবিতা
কবিতার লগ্নে থাকে শ্যামস্বাদ, বিষাদ, বর্জন
কীভাবে কী লিখে তুমি উঠে এলে জানলার ওপাশে
নখরে ঠোক্কর দেবো, খসে যাবে, বাঁচাতে পারবো না।

রজনীগন্ধার নিবেদন এই

রজনীগন্ধার নিবেদন এই তুচ্ছ করে নেবে?
কে ছিলো পিছনে এই রজনীগন্ধার?
কে ছিলো সম্মুখে এই রজনীগন্ধার?
রজনীর এতো ফুল তুচ্ছ করে নেবে?
জানালার পাশে ছিলো নিবেদিত গন্ধের প্রয়োগ
তা কি কোনোভাবে ছোঁবে? আমি গন্ধে প্রাসাদ বানাবো?
কখনো-সখনো আমি ঘুরতে যাই গোলাপ বাগানে,
শুধু দেখি মুখচ্ছিরি, গন্ধ তার শুঁকি না কখখনো
শুধু দেখি মুখচ্ছিরি, গন্ধ তার শুঁকি না কখখনো!

দিনরাত

দিনরাত মৃত্যু চলে সন্তান অবধি।

দেখা তো হয়েছে ক্রূর যমের সহিত,
তাকে বলা গেছে, আমি একাকীই যাবো।
গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গে নিভে যাবে আলো,
আমি যাবো, সঙ্গে নিয়ে যাবো না কারুকে
একা যাবো
দিনরাত মৃত্যু চলে সন্তান অবধি!

কিশোরবেলার ঘুম

কিশোর বেলার ঘুম ভেঙে গেছে হঠাৎ সন্ধ্যায়,
তোমাকে সহস্র নামে ডেকেছি সন্ধ্যায়,
ধরেছি ও-মুখসাজ করতলে, চুম্বন করেছি,
সেই স্মৃতি মনে করে হয়েছি পাগল।
হয়েছি অশ্বের মতো তেজী আর স্বেদেও ডাগর,
ধরেছি তোমার দুটি স্তন এক কঠিন আবেগে;
কিশোরবেলার এক থরোথরো যন্ত্রণার জ্বরে—
কয়েক দশক পরে এই ঘোর, এই আলিঙ্গন!
তোমার মুখের 'পরে মুখস্থাপন করে বলি;
তুমি মোর যুঁইগন্ধ, তুমি চামেলির মাংসভুক,
তোমার চুলের ছটা অন্ধ করে দিয়েছে আমাকে,
জিভের বর্ষায় আমি ভিজে গেছি সেগুনমঞ্জরী
চলো এ-শহর ছেড়ে দূরে যাই, ঘাটের রানায়
পা ছড়িয়ে বসবে তুমি, আমি পা চুম্বন করে যাবো

দশমী ও বিসর্জনে

ভালোবাসা দিয়ে আমি তোমার সর্বাঙ্গ মুড়ে দেবো
ফুলে ও কাঁটায় আমি তোমার সর্বাঙ্গ মুড়ে দেবো,
যাতে ফুল পেতে গেলে আমিও কাঁটায় বিদ্ধ হই,
অন্য কোনো অন্ধ চোখ কেবলি কাঁটার খোঁটা খাবে।

তুমি ছাড়া চরাচর কাছে ছিলো অত্যন্ত আপন
আগুপাছু ছিলো শুধু মেঘ বৃষ্টি আলো অন্ধকার।
শ্মশান মশান ছিলো, আর ছিলো মাৎসর্য-ভুবন,
কাছে থেকে তুমি ছিলে বহুদূর সম্মুখে যাবার।

যৌবন এখন নষ্ট, কীটদষ্ট হয়েছে শরীর
ভালোবাসা দিয়ে আজই তোমার সর্বাঙ্গ মুড়ে দেবো।

একাত্ম

কী তুমুল বৃষ্টি হলো শান্তিনিকেতনে..
ডুবে গেলো কাশফুল, ভেসে গেলো ঝরা শিউলি তলা।
আমরা খোয়াই-এ, জলে কান পেতে শুনছিলাম তার
আকাশের গুরু গুরু মেঘডাক, বিদ্যুৎ-চিকুর,
দিনের আলোর মতো ফুটে উঠেছিলো।
কাঁকর লেগেছে স্তনে, মাথা ভর্তি কাঁকরের ফুল,
দুহাতে সরাই সব, তোমার স্বপ্নের মতো দেহ—
বাহুগন্ধে নুনজল, যতক্ষণ মেঘ থাকে ভালো।
আকাশমণির ঝাড় অদূরে দেয়াল তুলে ধরে
আমরা আড়ালে শুয়ে দুই মূর্তি এক হয়ে থাকি।

খেলাচ্ছলে

খেলাচ্ছলে বেড়িয়ে বেড়ায় নাম জানো তার ?
সে তো এমন মানুষ ছিলো শুধু যাবার,
বিষয়টি আচ্ছন্ন করে আছেও বা সে
হয়তো কিছু পণ করেছে মিষ্টি হেসে—
শুধিয়ে, সব হিসেব, রইলো কানাকড়ি
মানুষটার তো কাছেই ছিলো দড়াদড়ি !

২

প্রতিদিনের খবরকাগজ সঙ্গে রাখে
মানুষ ছিলো চিরস্বাধীন, গোলাপবাগে--
দেখেছিলো একটি কাঁটা মনোহরণ,
তার কথা কেউ বলেনি, তাই দেখেছিলো।
অবাক-করা বারো মাসের তেরো পাবন
একটু উঁচু, আধেক নিচু হতেই হবে।
এড়িয়ে যাও, এড়িয়ে যাও, প্রাণ ফুরোবে—
হয়তো উঁচু, হয়তো নিচু হতেই হবে।

ঘরের মধ্যে আছে

ফুলের জঞ্জাল আমি মাড়াই দুপায়ে
উঠোনের এ-অবস্থা। কাঠচাঁপা ঝরে পড়ে আছে
ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে আমি যতো যেতে চাই
ততো যাই কাঠচাঁপায় জড়িয়ে !

এছাড়া আমার আছে যুঁইফুল, বেলি ও মাধবী
তাদের একজন শুধু গাছে সেঁটে থাকে।
বাকি সব ঝরে পড়ে পদতলে স্পর্শ করবে ব'লে
ভূতের ভয়ের মধ্যে ওরা সব তন্দ্রার প্রহরী।

হ্যাঁ, একটি শিউলির কথা বলা তো হলো না।
সে সম্বৎসর আমায় অভ্যর্থনা করে,
শরতে বিপুল দেয়, হেমন্তে ও শীতে,
তার নিবারণ নেই, কিছু কিছু দেয়—
ফুলের জঞ্জাল আমি মাড়াই দুপায়ে
যেহেতু ঘরের মধ্যে আছে অবিনাশী দু'বকুল।

উৎসবে

[মামার প্রতি স্মৃতি]

আবার উৎসব হলো আমার বাগানে

অতর্কিত ছিলো ফুল, নিয়ে আসা হয়েছিলো কাকে
মূঢ় মূল ছেঁড়ে-ছিনে, তাকে তোমরা ফুল বলে থাকো ?

আমার পিতার মতো ছিলেন তিনিও,
সুতরাং গান গেয়ে তাঁকে তো ভরাট করা গেছে—
পুষ্ট গান, কখনো কীর্তন,
সেদিন কীর্তন দিয়ে তাঁকে তো বাঁধিনি,
ভোরাই গেয়েছি আমি অবিরত শ্মশানভূমিতে !
তারপর ফিরে এসে যে যার বাড়িতে চলে গেছি।
কিন্তু এ সন্তপ্ত প্রাণ কোথা যাবে ? ছিলো সর্বক্ষণ,
জানি না, কী ক্ষমা চেয়ে আমরা প্রত্যাতি বলে আছি,
এতো ব্যক্তিগত এই পদ্য, তাতে পরিত্রাণ পাবো।
যুবক বয়সে আমি সেরকম উন্মাদ বহেছি
শত্রুতাও কবে না যাতে মনের সংশ্লেষে বহে চলি।

আবার উৎসব হবে আমার বাগানে।

এ বয়েসে

ডান হাতে বাঁ হাতে ক্ষত, বাহুর পেনসিল লিখে চলে
যতদূর লিখতে চাই, বাংলাভাষা যেন কথা বলে
অক্ষম জেনেও যেন ফিরিয়ে নেয় না মুখচ্ছিরি
এদিকে সাবান ক্ষুরে, ওদিকে নেয় না যেন বিড়ি
দেখো, বিচ্ছিরি মুখে পাহাড়ের ছায়াই পড়েছে
এরপর মালা দেবে, সভানেত্রী বসেছে সঠিকই !
টিলার ওপর থেকে সানুতল দেখায় প্রকৃত
ঘরদোর, চলে এসো, এ-বয়েসে হেনস্থা কোরো না
তোরঙ্গের মায়া মানো, শীতের তোষক—
এ-বয়েসে হেনস্থা কোরো না,
চিতার উপরে উঠে হেনস্থা কোরো না
চিতার গরম, তুমি ভালোবাসো, জানি
এ-বয়েসে হেনস্থা কোরো না
চলে এসো, এ বয়েসে হেনস্থা কোরো না ।

আর কিছু নেই

আমার রমণী শুয়ে, দুই পাশে দুটি মাছরাঙা
আমার সর্বস্ব আজ ভাঙ্গা
আমার সর্বস্ব আজ ভাঙ্গা ।
হাত পা ও বুকের পাঁজর
চারিদিকে অক্ষর অক্ষর
চারিদিকে অক্ষর অক্ষর

আর কিছু নেই !

হঠাৎ

হঠাৎ পৌঁচেছি ট্রেনে ।
লাইন ছুঁচের মতো স্টেশন বুনেছে ।
কাঁথা কিংবা বালাপোষ এখনো জানি না,
শুধু চিনি ফোঁড়, যাতে ছিন্নভিন্ন, রঙের অঙ্গুলি
ওকে অপরূপা করে ।
মাছের ভিতরে শুয়ে, অতি জ্বালাতনময় প্রেম
বলেছিলো, ছাতে এলে সম্পর্ক জাগাবো ।
কেউ কি কখনো জাগে ? নিভন্ত ঘুমন্ত রোরো নদী,
স্বপ্নের ভিতরে চলে জলোচ্ছল, জলোচ্ছল ; বেগে
ঘুমের নিজস্ব এক প্রাপণীয় অন্ধকার আছে ।
দাও তাকে অন্ধকার, সিঁড়িতে ছাগল পাথরের
মতো স্থির, তাকে দাও, সহ্য করতে এই পুরাতন
প্রেম, তাকে দাও ঐ রঙিন পুতুল, মাঝরাতে
মনে হয় শান্তি পাবে, কিংবা তৃষ্ণা সকল জড়াবে
আমৃত্যু আমৃত্যু !

সেই ছেলেটি

ওই ছেলেটির একটি মৃত্যু থাকলে ভালো হতোই
কিন্তু মরলো অনেক ।
ভাত খেয়ে, দৈবাৎ খেয়ে সে
        মরলো অনেক অনেক...
ঐ ছেলেটির একটি মৃত্যু থাকলে ভালো হতোই ।
একটি মৃত্যুদিবস শুধু করতে পারি পালন
না জন্মদিন, না মধ্যদিন—একটুখানি কালো
ঐ ছেলেটির একটি মৃত্যু করতে পারি পালন ।
সেই ছেলেটি কোথায় ?

সর্বস্ব

দেখা হয়েছিলো সে-ই বিংশতি বয়সে !
তারপর নষ্ট ফল—শশা-কলা কুড়িয়ে, ফিরেছি ।
কোঁচড় হয়েছে ভরতি । মনে হয়, কিছুই হলো না !
প্রকৃত ভিখারি হতে পারা আর যাবে না কখনো ।
ধনী হতে চাই, তাই, ধনী আমি হয়েছি, সর্বদা ।
পথে পাই, রথে পাই—তবু, যেন দীর্ঘ দুটি হাত
অভিমানে টুকরো ক'রে, ছোটো ক'রে, সাজিয়ে রেখেছি ।
কী তোমার প্রয়োজন ? ছোটো-বড়ো—যা চাও, তা পাবে,
কী চাও ? সর্বস্বে আছে প্রয়োজন ?
--সর্বস্বই পাবে ।

লোকটা

লোকটা তো কঠিন অসুখে
শুয়েছিলো, আজ সুস্থ কী সে ?
লোকটা তো লোকটাতো নির্ভুল প্রবাসে ছিলো ভালো..
ম্লান হলো বিয়ে ।
লোকটা তো নিজেই জানে না
কোথা সুখ, দুঃখের দ্রাঘিমা ?
লোকটা তো নিজেরই গরজে
পার হতে প্রচেষ্ট নিজ সীমা ।
লোকটা তো—লোকেই বলেছে
ভালো-মন্দ বুঝেছে কিছুটা
লোকটা সামান্য নয়, ভাবি
লোকটা পোস্কার নয়, ঝুটা ।

সমাধিতে শোবে ?

পুরীর সমুদ্র ছেঁচে ঝিনুক এনেছি
শাঁখ, তারামাছ আর সাগরের ঘোড়া
ফেনার বাতাসা এনে ছড়িয়ে দিয়েছি
বিছানায়,

পেতেছি শিমুলতুলো, তুষার, লবণ
যাতে পিঠে-হাড়ে কোনো কালসিটের দাগ
লেগে না থাকতে পারে—ব্যবস্থা এমনই ।
তাও কষ্ট হবে, তবে ফোমের চাদর পেতে দিই
সুখে থাকো,

জীবনে অনেক কষ্ট পেয়ে ভেঙে গেছো
সে-ভাঙা জোড়ার নয়, তাতো আমি জানি
তাই যতটুকু পারি, যত্ন করে যাই
কিছুদিন পরে ঐ ধুলো ঘাস দেখে
যত্নের বহর টের পেয়ে খুশি হতে ।
সমাধিতে শোবে ? শোও । বিছানাটি ভালো ।
এমন বিছানা ছেড়ে উঠবে না কখনো,
ভালোও লাগবে না উঠতে ছুটতে, শ্রান্ত হতে
সমাধিতে শোবে ? শোও । বিছানাটি ভালো ।

এইটুকু তো জীবন

চলো যাই, রোদ্দুর পা উঠিয়েছে, এখানে
লাঙলের ফালে উঠছে মাটি, এখানে
তেমন পরিপাটি মানুষ নেই কেউ, আদুল
গায়ে লোক চলছে-ফিরছে, আলো
বাতাসের মতো সহজ, স্বাভাবিক ; বিষণ্ণ
কবির পাশে জোলা, শহরের মতো
জল ঘোলা করতেও নেই কেউ, মানুষ
সহজে ভালোবাসে, হাসে-কাঁদে কষ্ট পায়

কষ্ট পেতে-পেতে পাথর হয় না, পাথরের
সঙ্গে কথা বলে এখানে অনেকে, গাছপালার
সঙ্গে, শিকড়-বাকড়ের সঙ্গে, ফুলের চেয়ে
শিকড়ের সঙ্গেই এখানে সমঝোতা বেশি
মাটির কাছাকাছি থাকে বলেই গায়ে এদের
কেমন সোঁদা সোঁদা গন্ধ—যা কেবলি মনে পড়ায়
ভাঁটফুল, যজ্ঞডুমুর, দোলমঞ্চ আর দেবদারুর ফল
গরুর গাড়ির আলস্য আর মন্থর এখানে মানুষকে
খুব দৌড়ুতে দেয় না, বারণ করে, কেননা, এইটুকু তো
জীবন, অতো দৌড়ঝাঁপে আলাদা কী পাবে ?
জীবন ছাড়া, মৃত্যুকে পাবার জন্যে তাড়াহুড়োর কোনো
অর্থ হয় না ॥

বৃষ্টি হবে হয়তো বৃষ্টি

দাঁতাল দস্যুর মতো হাওয়া ঢুকলো গলির ভিতরে
ওড়ালো জঞ্জাল ধুলো পাতাগুলো শুকনো ফুলগুলো
এবং দর্জির কাঁচিকাটা কিছু রঙিন কাপড়—
আকাশের ছিটমহলে মেঘের মতন জমে আছে ।

বৃষ্টি হবে হয়তো বৃষ্টি একটু পরে শহর ভেজাবে
শহরে হাঁ করে আছে মানুষ, পতঙ্গ, ডালপালা
হাঁ করে রয়েছে অন্ধ কবেকার বন্ধ-করা ঘরে
বৃষ্টি দাও, কান ভরে দাও ঐ তীব্র জলরাশি—
আমি ভালোবাসি বৃষ্টি, দৃষ্টিহীন এই বঙ্গভূমে ।

ভুল

যেন একটি প্রশ্ন নিয়ে ভুল পথে যাচ্ছিলে
অথচ দিন শীতল, তুমি পাগল হতে চাওনি
মাছের সার পাতের পাশে কাঁটাটি খাচ্ছিলে
আজ যেমন হঠাৎ পেলে তেমন করে পাওনি

কীসের এক প্রশ্ন নিয়ে ভুল পথে যাচ্ছিলে
হঠাৎ দেখা, চেনাও গেলো, ছিলো না তাচ্ছিল্য

ওর দিকে তাকাও

তোমরা, আমাকে ছেড়ে ওর দিকে তাকাও।
পাকা নিমফল ওই মুখশ্রী ঢেকেছে শাদা ফুলে--
ওর দিকে তাকাও, ওই দেহখানি হিসাবের ভুলে
এখানে পৌঁছেছে।
আমিতো জীবন্মৃত হয়েই ছিলাম এতোদিন।

পারুল ফুটছিলো একা, ধীরে ধীরে, একান্তে ঘরের—
ঝরে গেলো। তেমন বাতাস নেই কোনোখানে, দুর্বহ বাতাস।
তবু, ঝরে গেলো ফুল। আমি ডালপালা—
শীতে ও হেমন্তে ছোঁয়া ডালপালা, নির্যাস পাথর।

আশা ভরসার শেষে, ভালোবেসে, পথের উপরে
ভাঙচুরহীন ঘুম দিতে গিয়ে কখনো জাগিনি।
পারুল ষোড়শী ফুল, এতো ঘুম কোথা থেকে পেলো?
এ-বয়সে এতো ঘুম ঠিক নয়, জাগারই বয়স—
কষ্ট ও আঘাত নেবে বলে বুক বাঁধারই বয়স!

তোমরা, আমাকে ছেড়ে ওর দিকে তাকাও
ওকে দেখো।
কিছুক্ষণ পরে এক অগ্নির পৌরুষ ওকে পাবে—
আলিঙ্গনে আলিঙ্গনে পুড়ে ক্ষার হবে ঐ দেহ।

গঙ্গামন্দিরের ঘন্টা বেজে উঠবে আর্তনাদ ক'রে
ওঁ শান্তি, শান্তি কোথা ? শান্তি পাবো ভেবে ঘুমিয়েছি !

চিঠি

আধিপত্য দেখিনি কখনো ।
সে শুধু মেনেই নিয়ে সর্বস্বান্ত হলো—
জীবনে যাঞ্ছনা ছিলো আর ছিলো সাজানো সংসার,
সে-সংসারে নিয়ে গেছে আমাকে প্রত্যহ ।
আধিপত্য দেখিনি কখনো ।
আমার ছিলো সে আধিপত্নী, কিংবা তার থেকেও বেশি,
শাসন প্রত্যহ করতো ; উন্মার্গগামীর শেষে শূল—
আমি তা দেখবো না এসে, রক্তে ভেসে যাবে,
গঙ্গার স্নানার্থী শুধু তোমাকে স্মরণ
করবে দিনরাত আর গড়বে আবেষ্টনী—
—আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে !
কীভাবে বাঁচবে তুমি যদি এই টান
আমায় দেখাও আরো, আরো বেশি তীব্র নীল বিষে—
কীভাবে বাঁচাবো বলো, আমি সেই বেহুলাও নই,
তুমি নও লখীন্দর । সুতরাং, সাবধানে থেকো ।

অর্ধসমাপ্ত ও সমাপ্ত শার্দুল !

কেবিন দশ-এর মধ্যে আছে অর্ধসমাপ্ত শার্দুল,
ঘুমন্ত ও রোগাক্রান্ত হয়ে আছে সমাপ্ত শার্দুল !
বিষহরা দেওয়া হচ্ছে মুহুর্মুহু, তবুও জাগে না,
অনেক দিনের পরে রোগ-ঘুম পেয়েছে দৈবাৎই ।

তাগড়াই সে-জঙ্গলের স্বপ্ন দেখে সমুদ্রের ধারে
স্নানশেষে শুয়ে আছে, ধুলোয়-বালুতে মাখামাখি ।

আঁশটে গন্ধ মেখে নিয়ে শুয়ে আছে সন্তানের পাশে,
সমুদ্রের রক্তে বুঁদ, সমুদ্রের রোদ্দুরে প্রহৃত।

কেবিন দশ-এর মধ্যে শুয়ে অর্ধসমাপ্ত শার্দুল
স্বপ্ন দ্যাখে মজুরের, মাংস ঠাসা অগ্নির ভাণ্ডারে—
সবার সম্মুখে পাত্র, পাত্রভরা তীব্র নীল বিষ,
উদাসীন গণ্ডূষেই সে-পাত্র এখনি শূন্য হবে।

বিষহরা দেওয়া হচ্ছে, তবুও সে-শার্দুল জাগে না,
বিষের স্বপ্নের রক্তে বুঁদ হয়ে শুয়ে আছে পাশে।

ফিরে যাওয়া উৎসে

ভোলা মানে, ভুলে যাওয়া, ঠিক উদাসীনতাও নয়
সন্তপ্ত হয়েই আছি, তুমি খুব নিকটে এসো না
দূরে যাও, দূরে থাকো, দেখো খুব নিকটে এসো না
ভোলা মানে, ভুলে যাওয়া, ঠিক উদাসীনতাও নয়।

একদা নিকটে ছিলে, ভালোবাসা ভ্রূকুটির নিচে
কাছাকাছি ছিলে, তাই মনে হতো, দূরে গেলে ভালো
তাই অভিমানে গেলে, ফিরে আসা হলো কষ্টকর
সমুদ্র সামীপ্য থেকে ফিরে যাওয়া উৎসে কি সম্ভব ?

চেয়ে থাকো

কিছুদিন আমার অসুখী মুখপানে তুমি চেয়ে থাকো
কিছুদিন আমার সুখের মুখপানে তুমি চেয়ে থাকো
চেয়ে থাকো, চোখ ফিরিও না, অন্ধ হবে, যদি বন্ধ করো
চেয়ে-থাকা, দুঃখী মুখপানে, চেয়ে-থাকা পলক না ফেলে

কিছুদিন আমার ভোগের মুখপানে তুমি চেয়ে থাকো
কিছুদিন আমার রোগের মুখপানে তুমি চেয়ে থাকো
কিছুদিন আমার সন্ন্যাসী মুখপানে তুমি চেয়ে থাকো
চেয়ে থাকো, চোখ ফিরিও না, অন্ধ হবে, যদি বন্ধ করো
চেয়ে থাকো, খুব কাছে থেকে, চেয়ে-থাকা দূর থেকে নয়
তাতে কি তোমার পরাজয় ?
তাতে কি তোমারই পরাজয় !

ভয় নেই

অদ্ভুত কিশোরগন্ধ তোমার শরীরে।
কিছু কষ্ট আছে, তা কি তুমিও জানো না ?
গলিঘুঁজি ভালো নেই, সাবলীল নেই,
নেই ফুটোফাটা, দরজা, স্থানীয় তছনছ।

তবে, কিছু কষ্ট পাবে। যথেষ্ট-ই পাবে।

ভয় নেই। বাঁশবনে শেয়াল রয়েছে!
আছে অপোগণ্ড চাষী, হাতের নিড়ুনি,
দুদিনের হালে জমি ঠিকই জো-সো হবে।
ভয় নেই। বাঁশবনে শেয়াল রয়েছে!

কিছু কষ্ট আছে, তাও, একসময় যাবে—
ভয় নেই।

তবে থাক

মুখে তার কালি পড়ে গেছে ।

চিমনি থেকে যে-ভুষো উঠেছে
সেই আলো থেকে উঠে কালি
তার মুখে সযত্নে লেগেছে ।

এখন কোথাও জল নেই
অশ্রু আছে, তাও ছিটেফোঁটা ।
তাতে কি ও-কালি মোছা যাবে ?
হাতে নেই তেমন সময় ও ।

তবে থাক, কালি পড়ে থাক—
মুখ থেকে যেন বুকে ঝরে ।

আসছো কবে ?

রোরো নদীর ধার থেকে ঐ একটি বালক
কুড়িয়ে পেয়েছিলো রঙিন বুকের পালক
এবং একটি পাথর পেয়ে, সেই পালকে
জড়িয়ে, ছুঁড়ে দিয়েছিলো এপার থেকে
পালক কি আর একাকিনী ওপার যাবে ?

যম-কালো এক মরদ ছিলো নদীর ওপার ।
দেখাচ্ছিল তার ভাগে লাল মোরগঝুঁটি,
বালক দ্যাখে, অনেকগুলি দাগ ও-ঝুঁটির—
তফাত কি আর অমনি হবে ?

কুড়িয়ে পেয়ে ছড়িয়ে দিলুম বুকের পালক

—আসছো কবে ? আসছো কবে ? আসছো কবে ?

শেষ হবে, এভাবেই হয়

বহুক্ষণ আগে জ্বালিয়েছি
এবার প্রকৃত নিভে যাবে
উড়ে-পুড়ে দূরে যাবে ছাই
হয়তো সমস্ত বাসনাই
শেষ হবে।
এভাবেই হয়
কাঠে ঘুণ লাগে, লাগে ক্ষয়
তবে, বুঝি এভাবেই হয়!
কখনো কখনো অন্যভাবে
পা টেনে গা টেনে দিন যাবে
যেভাবেই যাক
পুড়ে খাক
হবে একদিনই।
তারপর বলতে আছে কিছু?
লোকটির নিকটে সব মিছু
লোকটির নিকটে সবই মিছু।

কবিতা টাঙাতে হয়

পুরনো পশ্চিমে ধোঁয়া, পুবের চারদিকে লাগে টান।
চারদিক ঠিক নেই, গন্ধভরা কলংক রয়েছে,
আছে সুখে-দুঃখে আছে, শহরের গাছের মতন।
পুরনো পশ্চিমে ধোঁয়া, লাগে টান পুবের চারদিকে

গাছে গাছে যাই ভুল কবিতা টাঙাতে।
কবিতা টাঙাতে হয়, কবিতার এলোমেলো রূপ,
সাধ্যমতো মাজতে হয় পিতলের বাসনের মতো।
সোনার পিতলে তবে পাতা এসে পড়ে
ফুল-ফল সবই পড়ে, শুকনো কাঠি পড়ে...

গাছে গাছে যাই ভুল কবিতা টাঙাতে
কবিতা টাঙাতে হয়।
পুরনো পশ্চিমে ধোঁয়া, লাগে টান পুবের চারদিকে—
এ-সময়
কবিতা টাঙাতে হয়, একে একে, শহরের গাছে।

নেমে আসে অন্ধকারে

বিষণ্ণ জলের ধারা নেমে আসে অন্ধকারে, মাঠে।
ঘর থেকে শব্দ পাই, গন্ধ পাই, স্পর্শ পেতে পারি
দূর থেকে কাছে টানে জলধারা হৃদয়ে ডোবায়
আপাদমস্তক ডুবে সে রয়েছে চাঁদের মতন
একা, ঐ মধ্যমাঠে, স্বজনবর্জিত রলরোলে—
ভালো থাকবে বলে ছিলো চিৎ হয়ে ঘাসের উপরে,
না-ঘুম, না জাগরণ, না বস্তু, না স্বপ্নের জগতে
ছিলো, সুখে থাকবে বলে, এখন নিশ্চিহ্ন ডুবে গেছে

বিষণ্ণ জলের ধারা নেমে আসে অন্ধকারে, মাঠে
অকস্মাৎ নেমে আসে, মাঠ ঘাট প্রান্তর ভাসিয়ে।

আমাদেরও নিয়ে চলো

মনে হয় শান্তি পাবে, যদি তুমি আমার দেশের
মাটিতে পা দাও, থাকো কিছুদিন দুঃস্থ কুঁড়েঘরে,
নয়ানজুলির পাশে সজিনার ফুলের বাতাসে
তোমায় আচ্ছন্ন করবে বাংলাদেশ, বাংলার মানুষ...

তোমাকে দরকার খুবই, শৃংখলার মতো কর্মে-কাজে
চিন্তনে-মননে-ধ্যানে ছায়া ফেলো, ছন্দের ভ্রূকুটি
এবং, তোমার কাছে, হে শ্রদ্ধেয়, ভালোবাসা আছে।

পথিক অসংখ্য পথে যেতে পারে উদ্দেশ্যবিহীন
তুমি, নিরুদ্দেশ নও, স্থির ধ্রুবতারকার মনে
তোমারই সযত্ন ছাপ, হে তুমি, নিকৃতি জনে জনে...

আমাদেরও নিয়ে চলো পথে, বৃদ্ধ বসন্ত নবীন।

ধান কোটা শেষ, কবিমশাই

ওরা তোমায় অন্ধ ভেবে, চতুর্দিকের পাথর
গুছিয়ে গেঁথে রাখছিলো আর কর্ণিকে কাতর
তুলছিলো মাস রক্তমাখা বালির মতন করে—
শুইয়ে দিতে চাচ্ছিলো ওই শিশুর নড়া ধরে।
ঘাসের কাঁথা পৃষ্ঠে পাতা, বুকে ভরাট মান
ধান কোটা শেষ, কবিমশাই, অন্ধকারে যান
হাসিরাশির দিন ফুরোলো, চিবোও জিবের ছালা,
প্রেম পীরিতি নারলাম দিতে, উলোটপালোট জ্বালা।
তুষ্ট থাকুন, রুষ্ট থাকুন ভাবনাকাজির কাজে,
বাতিল কিছু পদ্য দিলুম পাথর-ইটের ভাঁজে।
যথেষ্ট যথেষ্ট কবি—ঘুমের মধ্যে যাও...
মণ্ডামেঠাই ঢের খেয়েছো, এবার খাবি খাও।

আমাকে জাগাও

সেগুনমঞ্জরী হাতে ধাক্কা দাও, জাগাও আমাকে
আমি আছি বিষঘুমে, জাগাও আমাকে
আমি আছি সর্পদষ্ট, জাগাও আমাকে
বৈরাগে সন্ন্যাসে আছি, জাগাও আমাকে
আমি জাগবো না, আমি বিষঘুমে, জাগাও আমাকে
যথাব্রত করো, তুমি জাগাও আমাকে
আগুনের ছোঁয়া দিয়ে জাগাও আমাকে
পাপস্পর্শ করে তুমি জাগাও আমাকে

আমাকে জাগাও তুমি বেহুলার মতো
আমাকে জাগাও তুমি লখীন্দরে যবে
সেদিন জাগিয়েছিলে মানুষের মতো
আমাকে জাগাও তুমি ফুলের মতন
পাপড়ির যতনে রেখো পরিপাটি করে
আমাকে জাগাও তুমি ফলের মতন
পরিপক্ক ফল, যার গন্ধ মিষ্ট হবে
জাগাও আমাকে তুমি গাছের মতন
দীর্ঘদেহী গাছ, ঐ গাছের মতন
পাতায় পাতায় জাগবে অরণ্যকুহেলি
জাগাও আমাকে কোনো বনের ভিতর
জাগাও আমাকে সেই বনের ভিতর
যেখানে মঞ্জরী ফুটবে সেগুনের ডালে
ডালে ডালে ছেয়ে যাবে দক্ষিণা আকাশ
আমাকে জাগাও তুমি সেগুনের মতো
কৃষ্ণসার গা লুকোবে দীর্ঘ কচুবনে
বুনো হলুদের ঝাড়ে ছেয়ে যাবে মাঠ
আমাকে জাগাও তুমি হলুদের মাঠে
চঞ্চল হরিণ এসে সম্মুখে তাকাবে
আমাকে জাগাও তুমি সেই পদ্মবনে
যেখানে ছোবল দেবে সাপে সর্বক্ষণ
যদি বিষে বিষক্ষয়, আমি জেগে উঠি
আমাকে জাগাও তুমি গোলাপের মতো
আমূল কাঁটায় ছন্ন গোলাপের মতো
আমাকে জাগাও তুমি নীরক্ত রঙ্গন
ধীরে ধীরে মুখশ্রীতে লাল রং পাবো
আমাকে জাগাও, করো লেলিহান শিখা
সে-আগুনে পুড়ে মরলে ঘুম চলে যাবে
বিষঘুমে ঢলে আছি, আমাকে জাগাও
যেভাবেই হোক তুমি আমাকে জাগাও
পুণ্য ও-চুম্বন দিয়ে আমাকে জাগাও
আলিঙ্গন করে তুমি আমাকে জাগাও
আশ্লেষে-আশ্লেষে তুমি আমাকে জাগাও
জীয়ন মরণ কাঠি দুই হাতে আছে
জীয়ন ছুঁইয়ে তুমি আমাকে জাগাও
তুমি তো স্বপ্নের দেশ থেকে এসেছিলে

জাগিয়ে, সেখানে যেও, বাধাই দেবো না
তুমি তো স্বপ্নের দেশ থেকে এসেছিলে
তোমার সমস্ত স্বপ্ন আমাকে দেখাও
তাহলে এ-বিষঘুমে আমি স্বস্তি পাবো
স্বস্তি দিতে না পারো তো জাগাও আমাকে
জাগার দুঃখের পথে আমাকেই ছাড়ো
সঙ্গে নেবো তোমাকেও ঐশ্বর্য-পতনে
তোমার যা ইচ্ছা হবে, দুই হাতে নেবে
আমি সব দিয়ে যাবো জাগাও আমাকে
শুধু জাগরণ চাই বারেক জীবন !

একাকী (অংশ)

দুপাশে সমাধি চিরে পথ গেছে দেয়াল অবধি ।
কান্নার আওয়াজ তোলে উইলো ঝাউ দেবদারুবীথি
ক্রোটন নয়নতারা স্তব্ধ রঙেরঙে মৃতের ময়দান কিছুটা উজ্জ্বল করে
বাদামের খোসা ওড়া গল্পের আসর
বসে না এখানে
এখানে নৈঃশব্দ্য ছুঁতে মাঝে মধ্যে দুজন একেলা
যুবক যুবতী আসে, প্রচ্ছদের ছবি হয়ে বসে
কথা খুব বেশি নয়, এলোমেলো নয়,
শুধু চোখে চোখে চেয়ে বিস্রস্ত হৃদয়,
বসে থাকে । দেবদারু গুঁড়ি ঠেস দিয়ে জনেক তপতী
সঙ্গে নিরুপম, গায়ে গেরুয়া পানজাবি আর হাতে চারমিনার
ভবিচরণের চটি গলিয়ে 'দ'-এর মতো স্থির চিত্র
বরং তপতী, দেখতে অনেক সহজ নীল তাঁতের শাড়িতে
পাশে রাখা বইব্যাগ, গঙ্গাযমুনা দুই বেণী
শ্যামলা রঙ, বিকেলের আলো মেখে অতসীকুসুম
মুখচ্ছিরি, দুজনের বয়েসের ব্যবধানও কম,
মোটকথা, কবরের পরিবেশে গুছিয়ে বাঁচার
এই দৃশ্যে প্রহরীও খুশি ।
প্রায়ই মরশুমি ফুল-পাতার তোড়ায়
গেঁথে তপতীকে দেয়, বিশেষত শীতে

এমনি শীতের দিনে দুপুর ছাড়িয়ে
বিকেলে, অলসভাবে, বসেছে তপতী
পাশে নিরুপম, আকাশে মেঘের পাল
বনকাপাসের মতো ঘুরে ঘুরে ওড়ে
ঝিঁঝি ও পরজাপতি ফুলে বসে, অস্থির শাখায়
এদিক ওদিক করে, শশব্যস্ত কাজ
মুহূর্তে না হলে আর কখনো হবে না
বলে মনে হয় এই ওড়ার স্বভাবে
ওদেরও অস্থির করে তুলতে চায় ।
একভাবে বসা, শিকড়ের জন্ম দেয়
জানে ওরা, তাই ব্যস্ত করে ।

চাকা ঘসটে চলে ট্রাম, গা দাপিয়ে সতর্কতা

একাকী (অংশ)

দুপাশে সমাধি চিরে পথ গেছে দেয়াল অবধি।
কান্নার আওয়াজ তোলে উইলো ঝাউ দেবদারুবীথি
ক্রোটন নয়নতারা স্তব্ধ রঙেরঙে মৃতের ময়দান কিছুটা উজ্জ্বল করে
বাদামের খোসা গুড়া গল্পের আসর
বসে না এখানে
এখানে নৈঃশব্দ্য ছুঁতে মাঝে মধ্যে দুজন একেলা
যুবক যুবতী আসে, প্রচ্ছদের ছবি হয়ে বসে
কথা খুব বেশি নয়, এলোমেলো নয়,
শুধু চোখে চোখে চেয়ে বিস্রস্ত হৃদয়,
বসে থাকে। দেবদারু গুঁড়ি ঠেস দিয়ে জনেক তপতী
সঙ্গে নিরুপম, গায়ে গেরুয়া পানজাবি আর হাতে চারমিনার
ভবিচরণের চটি গলিয়ে 'দ'-এর মতো স্থির চিত্র
বরং তপতী, দেখতে অনেক সহজ নীল তাঁতের শাড়িতে
পাশে রাখা বইব্যাগ, গঙ্গাযমুনা দুই বেণী
শামলা রঙ, বিকেলের আলো মেখে অতসীকুসুম
মুখচ্ছিরি, দুজনের বয়েসের ব্যবধানও কম,
মোটকথা, কবরের পরিবেশে গুছিয়ে বাঁচার
এই দৃশ্যে প্রহরীও খুশি।
প্রায়ই মরশুমি ফুল-পাতার তোড়ায়
গেঁথে তপতীকে দেয়, বিশেষত শীতে

এমনি শীতের দিনে দুপুর ছাড়িয়ে
বিকেলে, অলসভাবে, বসেছে তপতী
পাশে নিরুপম, আকাশে মেঘের পাল
বনকাপাসের মতো ঘুরে ঘুরে ওড়ে
ঝিঁঝি ও পরজাপতি ফুলে বসে, অস্থির শাখায়
এদিক ওদিক করে, শশব্যস্ত কাজ
মুহূর্তে না হলে আর কখনো হবে না
বলে মনে হয় এই ওড়ার স্বভাবে
ওদেরও অস্থির করে তুলতে চায়।
একভাবে বসা, শিকড়ের জন্ম দেয়
জানে ওরা, তাই ব্যস্ত করে।

চাকা ঘসটে চলে ট্রাম, গা দাপিয়ে সতর্কতা

জানায় পথিকে।
রাস্তা জুড়ে দিগবিদিকে ছুটে চলে বাস
ট্যাক্সি কোঁড় তুলে চলে কাঁথার মতন
কলকাতার পাকা পথে
অলিগলি ভরাট রিকশায়
—তপতী, তোমার একটা পায়রা ছিলো। বলেছিলে তাও।
রক্তের চক্রের মধ্যে ছিলো তার কালিন্দী কুহক
আমাকে তা বলেছিলে।
—আচ্ছা তপতী, তুমি রঙের বিরুদ্ধে অনাচার
কতোদিন চলছে দ্যাখো। এমনও কি শাদার বিরোধে
কালো কত প্রেমময়—মানুষেও জানে।
—ছত্রিশ নম্বরে তবু ওঠা যায়, সম্ভ্রম বাঁচিয়ে।
মাগোঃ, থ্রি এ বয়ে আনে মফঃস্বল গন্ধ আর
চ্যাটচেটে ঘাম।
ভালো বলতে বয়ে আনে গঙ্গার বাতাস এক বেলুন
ডালহাউসি আসতে না আসতে সে বেলুন ফুটো।
আচ্ছা বাস ট্রাম নিয়ে সমস্যা যাবে না
কলকাতার?

স্টেশন ছাড়িয়ে বাসগুমটি শিয়ালদার।
সময় পিছিয়ে যাওয়া কয়েকটি বছর
বাঁদিকে পাহাড় ডিম, রেশারেশি স্থানীয় কৌতুক
উপদ্রব অন্ধকার। শুধু অন্ধকার হলে ঠিকই
আঁধার খঞ্জন বাজতো।
উলটোদিকে উপদ্রবময়
সমাধি সমাধিক্ষেত্র
হয়তো বা নিজের পরের—
ভিড়ের কিশোরভাবে নির্জন গলিতে।

—একটি নদীর মধ্যে নৌকা ও নৌকার ছায়া ভাসে।
অপরূপ বনগন্ধে আবাল্যকৈশোর
মাথা থাকে জনৈক কবির
কিছুতে

কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি